সচিত্র

তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী

বা

ভারতবর্ষীয় তীর্থসমূহের মাহাত্ম্য প্রকাশ

তীর্থে তীর্থে পারে যেই করিতে ভ্রমণ।
সার্থক জীবন তার, সার্থক নয়ন ॥
কোথায় কি ভাবে আছে বিধির সৃজিত।
হেরিয়াছে যেই জন, মুগ্ধ তার চিত ॥

শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত

তৃতীয় ভাগ
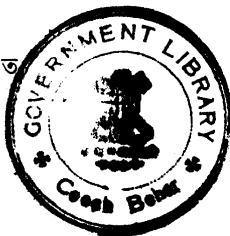
CALCUTTA
THE BENGAL MEDICAL LIBRARY
201, CORNWALLIS STREET.
1913

 মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

Calcutta

PUBLISHED BY HURRY DASS DHUR

356, Upper Chitpore Road,

FROM 1 TO 16 PAGES PRINTED BY PONCHUKALI HALDER.

AT THE **SULOV PRESS.**

84, UPPER CHITPORE ROAD, JORASANKO,

AND

FROM 17 TO 242 PAGES

PRINTED BY FAKIR CHANDRA DAS

"INDIAN PATRIOT PRESS"

70, BARANOSI GHOSE'S STREET

ILLUSTRATED BY SRIJUT PREO GOPAL DASS

1913

সংবাদ

সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী নামক সুবৃহৎ গ্রন্থখানি তিনভাগে বিভক্ত,
প্রত্যেক খণ্ডের ছাপা, কাগজ ও চিত্রাবলী অত্যুৎকৃষ্ট।

গ্রন্থ পাইবার ঠিকানা ;—

প্রকাশক শ্রীবিপিনবিহারী ধর,

৩৫৬, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

অথবা

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী,

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী

ইহা হিন্দুর নিত্য পাঠ্য সমাদৃত পরম পবিত্র গ্রন্থ। এ গ্রন্থ গৃহে থাকিলে গৃহ পবিত্র হয়, পাঠ করিলে এক অনাহত আনন্দ ধ্বনির মধুর-ঝঙ্কারে মনকে অনির্দ্দিষ্ট পথের পথিক করে। এ গ্রন্থ—গ্রন্থকারের বহুকাল প্রাণপাত পরিশ্রমের সুফলস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গুরুজনবর্গকে উপহার দিবার সামগ্রী হইয়াছে। ইহা নানা পুরাণ ও বেদাদি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়া বিবিধ তীর্থ চিত্রসহ উত্তম কাগজে তীর্থসেবকদিগের এবং সাধারণের হিতার্থে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, যে পবিত্র গ্রন্থের বিষয় নিত্য নিত্য সংবাদ পত্রে সমালোচিত হইয়া সুখ্যাতি বাহির হইতেছে, সেই গ্রন্থখানি একবার পাঠ করিয়া দীন গ্রন্থকারকে উৎসাহিতপূর্ব্বক তাহার বহু আয়স এবং পরিশ্রম সার্থক করুন। পুত্র, বৃদ্ধ পিতামাতাকে, ভাই, স্নেহের ভগ্নীকে ও আত্মীয়স্বজনকে তীর্থ গমনে উৎসাহিত করিয়া পুণ্য সঞ্চয় এবং অর্থ ব্যয়ের সার্থক করুন।

এই সুবৃহৎ পবিত্র গ্রন্থখানি তিনভাগে বিভক্ত হইয়া রাশি রাশি তীর্থ চিত্রসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রথম ভাগে—কলিকাতার সন্নিকটস্থ পীঠস্থান ৺কালীঘাট ও শ্রীশ্রী৺তারকেশ্বর তত্ত্ব এবং হাওড়া ষ্টেশন হইতে রেলযোগে বৈদ্যনাথ, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, হরিদ্বার, কনখল, ইন্দ্রপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্র, মথুরা, বৃন্দাবন ও ব্রজমণ্ডলী, আগ্রা সহর, রাজপুত শ্রেষ্ঠ মহারাজ জয়সিংহ প্রতিষ্ঠিত জয়পুর সহর ও তাঁহাদের জগদ্বিখ্যাত দেবালয়, আরও আজমীরের অন্তর্গত পুষ্কর ও সাবিত্রী তীর্থ। দক্ষিণে—বৈতরণী, ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল, পুরীতীর্থ, পদ্মক্ষেত্র, গুজরাটের কচ্ছসাগরোপকণ্ঠে দ্বাপরযুগের শ্রীকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত দ্বারকাপুরী, এতদ্ভিন্ন গৃহস্থের নানাবিধ প্রয়োজনীয় বিষয় সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। ভি, পিতে ১৶০ আনা।

দ্বিতীয় ভাগে—কলিকাতা হইতে রেলযোগে ওয়াল্টেয়ার, প্রহ্লাদ-পুরী, গোদাবরী, মান্দ্রাজ সহর, কাঞ্চীপুর, বালাজী, জলকান্তীশ্বর, অরুণাচলম্, বৈদ্যেশ্বর, মায়াভরম্, কুম্ভকোণম্, তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপলী সহর, জগদ্বিখ্যাত শ্রীরঙ্গমজীউর দেবালয়, কাবেরী নদীর আদি বৃত্তান্ত, কিষ্কিন্ধ্যাপুরী, বিরূপাক্ষদেব, মহীশূর রাজার স্বাধীন রাজ্য ও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত চামুণ্ডাদেবী, মাদুরা সহর, সেতুবন্ধে শ্রীশ্রীরামেশ্বর তীর্থ, আরও হরিদ্বার হইতে কন্‌খল, লক্ষ্মণঝোলা, হৃষিকেশ তীর্থ, প্রসিদ্ধ ধাম শ্রীশ্রীকেদারেশ্বর ও শ্রীশ্রীবদরীকাশ্রম, এতদ্ভিন্ন কোন্ তীর্থে কিরূপ দ্রব্যের আবশ্যক, উপরোক্ত বিষয়গুলি এবং তীর্থের উৎপত্তি সমূহ ও মাহাত্ম্য সকল সরল ভাষায় সুচারুরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ১।০, ভি, পিতে ১।৶০ মাত্র।

তৃতীয় ভাগে—কলিকাতা হইতে জব্বলপুর বোম্বে, এলিফ্যাণ্টা কেপ, পুণা সহর, দ্বিতীয়বার দ্বারকাপুরী যাত্রা, গৌহাটীর অন্তর্গত শ্রীশ্রীকামাখ্যাদেবী ও বশিষ্ঠাশ্রম, আরও চট্টগ্রামের অন্তর্গত চন্দ্রনাথের যাবতীয় তীর্থ এমন কি ৺আদিনাথ পর্য্যন্ত, এতদ্ভিন্ন দার্জ্জিলিংএ দুর্জ্জয়-লিঙ্গ ও নেপালের অন্তর্গত শ্রীশ্রী৺পশুপতিনাথ দর্শন যাত্রা সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ১।০, ভি, পিতে ১।৶০ মাত্র।

বহুকাল মুদ্রাযন্ত্রের কারাক্লেশ উপভোগের পর নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আজ ভগবান্ আদিত্যদেবের কৃপায় আমার বহু আয়াস এবং প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে এই সুবৃহৎ পবিত্র গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলাম, এ কারণ তাঁহার শ্রীচরণে ভক্তিসহকারে কোটি কোটি প্রণিপাত করিতেছি। ইহা প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে বাহির হইবার কথা ছিল, মানুষ যাহা মনে ভাবে, অচিরে তাহা কার্য্যে পরিণত করা বহু আয়াস সাপেক্ষ।

আশা উচ্চ, শক্তি ও সামর্থ্য ক্ষীণ, সুতরাং ত্রুটি অনিবার্য্য, ভরসা সুধীজনগণের উপদেশ—আশা রহিল, দ্বিতীয় সংস্করণে ঐ সকল ভ্রম সংশোধন করিতে সমর্থ হইব।

গ্রন্থকার

ভূমিকা

দেশ পর্য্যটন না করিলে আত্মোন্নতি বা বহুদর্শিতা লাভ হয় না, ইহা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সকলেই অবগত আছেন। প্রমাণস্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর বহুদর্শিতা লাভ করিবার অভিপ্রায়ে কর্তৃপক্ষের আদেশে দেশভ্রমণে বহির্গত হইবার রীতি আছে, বিশেষতঃ প্রাশ্চাত্যপ্রদেশে এ প্রথা বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়—এদেশেও যে ইহার প্রচলিত না ছিল, এরূপ বলা যায় না; কিন্তু নানা কারণে এক্ষণে উহা প্রায় লোপ পাইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে, চিরদিন কখন সমান যায় না। পরিবর্ত্তনশীল কালের কুটিলগতিতে সকল বিষয়েরই ভিন্ন ভিন্ন গতি হইয়া থাকে, প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের সে কাল অতীত হওয়ায় তৎসঙ্গে তাঁহাদের সেই নিঃস্বার্থ ভাব, সর্ব্বজীবে আত্মজ্ঞান, দয়াপরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকলও তিরোহিত হইয়াছে, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে স্বার্থপরতা, গৃহবিচ্ছেদ প্রভৃতি নিকৃষ্ট গুণ সকল হৃদয়ে আবির্ভাব হইয়া ভারতভূমিকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। কালের গতি কে রোধ করিতে পারে, ক্রমে মুসলমান প্রভৃতি কতকগুলি হিন্দুদ্বেষী বিধর্ম্মীগণের আধিপত্য স্থাপন হইলে তাহাদের প্রভুত্বকালে হিন্দুদিগের সেই একমাত্র মুক্তিপ্রদ তীর্থ

সমূহে অত্যাচার হইতে লাগিল। বলাবাহুল্য, হিন্দু চিরকালই তীর্থগমন প্রয়াসী, তাঁহাদের বিশ্বাস—তীর্থে গমন করিলে এবং তীর্থ সেবা করিলে মুক্তির পথ পরিষ্কার হয়, এই নিমিত্ত বিদেশ যাত্রার কথা উত্থাপিত হইলে তাঁহারা তীর্থ স্থানকেই স্মরণ করেন। কিন্তু ঐ সকল বিধর্ম্মীদিগের অত্যাচারে হিন্দু যাত্রীদিগের তীর্থ গমনে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইল, কেন না তাহাদের কর্তৃক তীর্থের দুর্গম পথ নানাবিধ অশান্তিপূর্ণ হইল; ফলতঃ প্রাণভয়ে তীর্থ-ভ্রমণ-প্রথা অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ হইল, পরন্তু যাঁহারা বৃদ্ধ ও সংসারবিরাগী, তাঁহারাই কেবল জীবনের আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক মুক্তি কামনা করিয়া ভগবানের শ্রীচরণে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক একমাত্র তাঁহারই শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইতেন।

কালরূপী ভগবানের চক্রান্তে ভারতে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাঁহাদের সুশাসনগুণে আজ কাল সর্ব্বত্রই শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে, বস্তুতঃ তাঁহাদের অমিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ এবং প্রচণ্ড প্রতাপে ঐ সকল দস্যুদল প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছে। ইংরাজদিগের বুদ্ধিবলে এবং শিক্ষা কৌশলে এক্ষণে বাষ্পীয় শকট ও জলযানের সৃষ্টি হওয়াতে সেই সকল একমাত্র মুক্তিস্থল "তীর্থ স্থান" যতদূর সম্ভব সুখসাধ্য ও সুগম হইয়াছে, সুতরাং ইচ্ছা করিলেই এক্ষণে আবাল, বৃদ্ধবনিতা হিন্দুমাত্র সকলেই আবার অল্প ব্যয়ে নির্ভয়ে সেই সকল তীর্থ সেবা করিয়া পরকালের মুক্তি পথ পরিষ্কার করিতে সক্ষম হই[illegible] ভগবানের নিকট ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের স্থায়ীত্ব প্রার্থনা করিতেছে। কথিত আছে, বিদেশ ভ্রমণ করিয়া বিদেশী আচার-ব্যবহার শিক্ষালাভে আত্মোন্নতি ও জ্ঞানের বিকাশ হয়, আবার সাধারণ লোকদিগকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া তৎসঙ্গে পরহিত সাধনও হয়, অর্থাৎ দেশবিদেশ

পর্য্যটন দ্বারা বহুদর্শিতা প্রভৃতি যে কতকগুলি সদগুণ লাভ হইয়া থাকে, তাহা মুক্তকণ্ঠে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু সেই পর্য্যটন যদ্যপি তীর্থ দর্শন প্রসঙ্গে সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গুণ লাভ হইতে পারে, উহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কথিত আছে, যাবৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত অনন্ত শৌচাদি, কর্ম্ম, তপস্যা, যজ্ঞ তীর্থাদি দর্শন করিবার বিধি আছে। এই বচন দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে সাধু সঙ্গ লাভ হয়, তদ্দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, তখন আর তীর্থগমনের বিশেষ আবশ্যক থাকে না। সাধু সন্ন্যাসীরা ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে কামনাপূর্ব্বক তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আত্মোন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া সাধারণকে আবার সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। "বেদ, স্মৃতি, সাধুগণের আচার ও আত্মতুষ্টি এই চতুর্ব্বিধই ধর্ম্মের লক্ষণ," অর্থাৎ সাধুগণের আচরণকেই প্রমাণস্বরূপ গণ্য করিয়া তদনুসারে চলিতে হয়।

পুরাকালে আর্য্য ঋষিগণ সদাই তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আপনাপন মুক্তিপথ প্রশস্ত করিতেন। আবার দেখুন—বিষ্ণুর অবতারগণ যাঁহারা নিত্যশুদ্ধ, সচ্চিদানন্দ—তাঁহারাও লোকহিতার্থে তীর্থ পর্য্যটন ও তীর্থ সেবা করিয়া গিয়াছেন। মহাভারত পাঠে জ্ঞানোদয় হয় যে,অনন্তাবতার "শ্রীশ্রীবলরামদেব" স্বয়ং তীর্থ পর্য্যটন করিয়া অবোধ মানবদিগকে তীর্থ ভ্রমণ করিতে শিক্ষাদান করিয়াছেন। এইরূপ ভার্গব পরশুরামও বহু তীর্থ ভ্রমণান্তর মাতৃবধজনিত মহাপাতকের নিষ্কৃতির বিবরণ পুরাণে সংশ্লিষ্ট আছে। এতদ্ভিন্ন দেখুন, পাণ্ডবদিগের বনবাস সময় তৃতীয় পাণ্ডব "অর্জ্জুন" অস্ত্র লাভার্থ তপস্যায় গমন করিলে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, চিত্ত শান্তির জন্য দ্রৌপদী ও অপরাপর ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে

ধৌম্যাদি ব্রাহ্মণগণের সহিত তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। এইরূপ আবার শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, মাধবাচার্য্য, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি মহাত্মাগণও তীর্থ পর্য্যটন করিয়া মোহান্ধ মানবদিগকে তীর্থ সেবা করিতে উপদেশ দান করিয়াছেন।

মনুষ্যমাত্রেরই জানা আবশ্যক, প্রকৃত তীর্থ সেবা বা দর্শন সহজ ব্যাপার নহে, কারণ সংযতচিত্তে তীর্থ সেবা করিতে না পারিলে কাহারও মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, ফলতঃ সংযতাত্মা না হইয়া শত সহস্রবার তীর্থ পর্য্যটন করিলেও কেহই তীর্থ ফল লাভ করিতে পারেন না। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, বৃক্ষস্থ কোনও একটী পত্র অপরগুলিকে বঞ্চিত করিয়া যেমন মূলগুড়ির রস আকর্ষণ করে না, তদ্রূপ তীর্থ যাত্রাদির দ্বারা বহুদর্শিতাদি লাভ হইলে অপরকে উপদেশচ্ছলে তাহার অংশ প্রদান করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে হয়। এই প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আমি যে সকল তীর্থ সমূহ দর্শন বা সেবা করিয়াছি, তৎসমুদয়ই সাধারণের অবগতির নিমিত্ত সাধ্যমত "সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" নামে পাঠকসমাজে প্রচারিত করিলাম। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সর্ব্বভূতাত্মা ভগবানই জানেন, এক্ষণে সুধীবৃন্দ সন্তুষ্ট হইলেই আমার সকল পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব। যাহাতে তীর্থ যাত্রীদিগের বিশেষ সাহায্য হয়, অর্থাৎ কোনরূপ কষ্টভোগ করিতে না হয়, সেই বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া গ্রন্থখানি প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

পরিশেষে সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণের নিকটে সবিনয় প্রার্থনা এই যে, এই গ্রন্থে যদি কোন স্থানে বিশৃঙ্খল বা যে ভাবের ব্যতয় হইয়াছে, সেই স্থল নিজগুণে সংশোধন করিবার উপদেশ দান করিলে, অধীন পরমানন্দ অনুভব করিবে।

গ্রন্থকার।

তীর্থসেবকদিগের কর্ত্তব্য

তীর্থ যাত্রা করিবার পূর্ব্ব দিবস গৃহে উপবাসপূর্ব্বক যথাশক্তি গণেশ, পিতৃগণ ও বিগ্রহগণের পূজা করতঃ পরমানন্দে হৃষ্টচিত্তে যথানিয়মে শুভদিনে, শুভলগ্নে যাত্রা করিতে হয়। তীর্থ স্থানে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিতে নাই, অন্নপ্রার্থীকে অন্নদান, ভিক্ষার্থীকে ভিক্ষাদান করিতে হয়। তীর্থশ্রাদ্ধে অর্ঘ্য বা আবাহন নাই, কি প্রশস্ত কি অপ্রশস্ত সকল সময়েই শ্রাদ্ধ করিতে পারা যায়। প্রসঙ্গত তীর্থে উপস্থিত হইয়া স্নান করিলে স্নান ফল পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তীর্থ যাত্রাজনিত ফললাভের আশা দুরূহ।

পুরাকালে ভীষ্মদেবের একদা তীর্থ পর্য্যটন করিবার বাসনা বলবতী হইলে, তিনি পুলস্ত্য ঋষির নিকট তীর্থ কর্ত্তব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে, ঋষিবরের নিকট উপদেশ পাইয়াছিলেন যে, যাহার হস্ত, পদ ও মন সুসংযত, যাহার বিদ্যা ও বুদ্ধি আছে, সেই ব্যক্তিই তীর্থ ফললাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, অল্পাহারী ও কামনা পরিশূন্য হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, যিনি নিষ্পাপ মনে ভক্তিসহকারে তীর্থ স্থানের দেবমূর্ত্তিগুলিকে যথার্থ ভগবানস্বরূপ জ্ঞান করিয়া অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তিনিই তীর্থ ফললাভ করিয়া থাকেন। যিনি ক্রোধশূন্য, সত্যশীল, দৃঢ়ব্রত এবং সর্ব্বভূতে আত্মোপম হইয়া অগ্রসর হন, তিনিই তীর্থ ফল অর্জ্জন করিতে সক্ষম হন। ফলতঃ সংযতাত্মা না হইয়া শত সহস্র বার তীর্থ পর্য্যটন করিলেও কেহই তীর্থ ফললাভ করিতে পারে না।

যে চিত্তে খলতা নিহিত আছে, তীর্থ স্থানে তাহার কিরূপে পরিশুদ্ধি হইবে? চিত্ত নির্ম্মল না হইলে দান, যজ্ঞ, শৌচ, তীর্থসেবা সকলই

স্তরে মুনিমনোহর তড়াগ, সরোবর, বনরাজিনীল গগণচুম্বী উত্তুঙ্গ, পর্ব্বতশৃঙ্গ, আবার ইহার এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গে পতিত ক্রীড়াশীল চঞ্চল নয়নরঞ্জন গিরিনির্ঝর, শ্যামলসুন্দর তৃণক্ষেত্র অথবা অনন্তনীল অম্বুস্বামীর ভীমকান্ত তরঙ্গভঙ্গ—প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্যপটের এই নয়নানন্দদায়ক চিত্রগুলি যখন একে একে চক্ষের সমক্ষে ফুটিয়া উঠে, তখন মনে যে অভূতপূর্ব্ব অনাবিল আনন্দের সঞ্চার হয়, উহা লেখনীর দ্বারা বর্ণনা অসাধ্য। আবার দেখুন, নিরর্থক দেশ ভ্রমণাপেক্ষা পুণ্যপূত হিন্দু তীর্থক্ষেত্র পরিদর্শনে কি পবিত্র স্বর্গ শান্তির উপলব্ধি হয়—সে আনন্দ সঞ্চয়ার্থে ভ্রমণ সঞ্জাত দৈহিক শ্রম বা কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই অনুভূতি হয় না, বরং সে আনন্দের কণামাত্র আস্বাদনে ও নীরস হৃদয়কন্দরে শান্তির সুধা প্রস্রবণ ঝরঝরধারে ঝরিতে থাকে।

প্রমাণস্বরূপ দেখুন—সৌরভে গৌরবময়ী পুষ্প ঈশ্বরের অপূর্ব্ব সৃষ্টি, কিন্তু উদ্যানে কিশলয়শিরে সৌন্দর্য্যশালিনী প্রস্ফুটিত পুষ্প, পাত্র বিশেষের নিকটে পৌছিলে কেহ তাহাকে সন্তুষ্টচিত্তে দেবতার পাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন, আবার কেহ বা সেই পুষ্প সংগ্রহ করিয়া দশজনের উচ্ছিষ্টা, ঘৃণিতা বারনারীর কবরীর শোভা সংবর্দ্ধন করিয়া সুখানুভব করেন। ইহাতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অর্থ থাকিলেই সকলে সদ্ব্যবহার করিতে পারেন না।

কামনাপূর্ব্বক যিনি যে কার্য্য করিয়া থাকেন, যথাকালে তিনি তাহারই ফললাভ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। পৌরাণিক মতে বালক ধ্রুব বিমাতা কর্ত্তৃক অপমানিত হইলে মাতার উপদেশ মত পিতৃরাজ্য লাভ করিবার জন্য "কোথা হে অনাথনাথ পদ্মপলাশলোচন শ্রীমধুসূদন", বলিয়া কামনাপূর্ব্বক এক মনে এক প্রাণে তাঁহার উপাসনা করিয়াছিলেন, যথাকালে তিনি সিদ্ধিলাভ করিলে সেই অগতির গতি,

কৃপার আধার, করুণাময়ের কৃপায় ধ্রুবের অকিঞ্চিৎকর রাজ্য বাসনা বিদূরীত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই ; কিন্তু প্রথমে তিনি সকামভাবে সেই পতিতপাবন শ্রীহরির উপাসনা করিয়াছিলেন বলিয়া দীর্ঘকাল তাঁহাকে রাজ্যভোগ করিতে হইয়াছিল। এইরূপ আবার দেখুন, যে বালক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিবার জন্য উপযুক্ত অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়ন করে, নিশ্চয়ই সে প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারে। কিন্তু যদি কোন স্থানে ইহার বিপরীত ভাবপরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, যথানিয়মে অবশ্যই তাহার অধ্যয়ন কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। ইহা হইতেই প্রমাণ পাওয়া যায়, কামনাপূর্ব্বক যিনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, অবশ্যই সে কামনা তাহার পূর্ণ হইয়া থাকে।

মায়াময়ের "মায়া" এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি! এই মায়াতে আবদ্ধ হইয়া জীবগণ মনের গতিকে জানিয়া-শুনিয়া সকল কর্ম্ম পণ্ড করিয়া থাকেন। প্রমাণস্বরূপ দেখুন—মহাত্মাগণ যে তীর্থ পর্য্যটনকে মানবগণের মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন—সেই পবিত্র তীর্থ দর্শনে যাত্রা করিয়া ও মায়া সংসারের কথা না ভাবিয়া থাকিতে পারেন না। হায় রে মন! তোমার গতি এমনই অসার ও নগণ্য—একবার ইংরেজ ও মাড়োয়ারি বণিক্‌দিগের প্রতি লক্ষ্য করিলে তাঁহাদের আচার-ব্যবহার অর্থাৎ তাঁহারা কেবল ধনোপার্জ্জনের আশায় দেশ, ঘর, পুত্র, পরিজনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া কত দূরে, কত দেশ-দেশান্তরে অম্লান বদনে অবিরত ধাবিত হইতেছেন, তাঁহারা ত আমাদের ন্যায় সংসারের জন্য এক দণ্ড ভাবিত বা চিন্তিত হন না—তাই বলি আমরা নগণ্য—কেন না ধর্ম্মোপার্জ্জন বা পরজন্মে মুক্তির পথ পরিষ্কার করিবার আশায় গৃহ হইতে দূরদেশ তীর্থ পর্য্যটন করিবার সময়ও কেবল ভাবিতে থাকি ; এবার বুঝি জননী

জন্মভূমির নিকট এই শেষ বিদায়—কি জানি, এই দূর পথে কোনরূ অমঙ্গল ঘটিলে আর কখন আত্মীয়স্বজনের সাক্ষাৎ লাভ হইবে না এই দুশ্চিন্তায় আকুলপ্রাণে কেবল সংসারের কথা, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের কথা, পুত্র পরিবারের কথা, একে একে এই সকল স্মৃতি পটে উদিত হইলে মনটাকে চঞ্চল করিয়া তুলে। তীর্থ যাত্রায় স্থির সঙ্কল্প করিবার পূর্ব্বে এই সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক এক মনে এক প্রাণে সেই পতিত পাবন শ্রীহরির শ্রীচরণ ধ্যান করিতে পারিলে তাঁহার কৃপায় কোনরূপে এই সকল দুশ্চিন্তা আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না, অধিকন্তু তথা হইতে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেও পারা যায়।

যে ব্যক্তি তীর্থে গমনপূর্ব্বক অন্ততঃ ত্রিরাত্রি বাস এবং গো, স্বর্ণ দান না করেন, তাহাকে জন্ম জন্ম দরিদ্র হইয়া থাকিতে হয়। তীর্থ যাত্রাঘটিত যে ফললাভ হয়, ভূরি দক্ষিণ যজ্ঞ দ্বারাও তাদৃশ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় না।

স্বদেশ হইতে অপরিচিত বিদেশ বিশেষতঃ তীর্থ স্থানে কেহ পীড়িত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত এবং এরূপ আহার্য্যের ব্যবস্থা করিবেন, যাহা সহজে পরিপাক হয় অর্থাৎ যে বস্তু খাইলে অসুখ হইবার সম্ভাবনা, উহা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তীর্থ স্থান হইতে নিজালয়ে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক গঙ্গা স্নান প্রভৃতি যে সকল বিধি প্রথম ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে, তদনুযায়ী ব্যবস্থাগুলি পালন করিলে সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারা যায়।

গ্রন্থকার

আবশ্যকীয় দ্রব্যের যায় ;—

উল্লিখিত এই সকল তীর্থ স্থানে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি কর্ত্তব্যবোধে সংগ্রহ করিবেন।

বিশেষতঃ গোহাটীর অন্তর্গত শ্রীশ্রীকামাখ্যাদেবীর দর্শন যাত্রা করিবার সময় কিছু ভাল চাউল, একটী ষ্টোভ, কড়া, খুন্তি ১ দফা, বিছানা ১ দফা, একটী মসারি, স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকিলে নারিকেল তৈল, আয়না, চিরুণী প্রভৃতি লইবেন। কারণ এপ্রদেশে মসার উৎপাত অত্যন্ত অধিক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

দেবার্চ্চনার মধ্যে—সিদ্ধি, সাড়ি, থালা, গেলাস, পঞ্চরত্ন, মসলা, সিন্দুর, সিন্দুরচুব্রী, মোমবাতি, একটী সোণার নথ, এতদ্ভিন্ন সমস্তই তথায় পাওয়া যায়। যাঁহারা কাঁচা সুপারী ব্যবহার করিলে অসুখ বোধ করেন, তাঁহারা এথান হইতে পুরাতন সুপারী সংগ্রহ করিবেন। এতদ্ভিন্ন কিছু শীত বস্ত্র সঙ্গে লইবেন।

৺চন্দ্রনাথ তীর্থে যাইবার সময় সিদ্ধি, রক্তচন্দন কাষ্ঠ, মসলা, কর্পূর, ধূপ, গাঁজা এবং নিজেদের ব্যবহারের নিমিত্ত একটী ষ্টোভ, কড়া, খুন্তি ১ দফা, বিছানা ১ দফা, কিছু শীত বস্ত্রও সংগ্রহ করিবেন।

দার্জ্জিলিং বা পশুপতিনাথ দর্শনের সময় যত কিছু সংগ্রহ করুন আর নাই করুন, বিছানা ও শীত বস্ত্র অধিক পরিমাণে লইবেন। রক্তচন্দন ২ খানা, হারিকেন লণ্ঠন একটী, উপরোক্ত এই কয়টী সামগ্রী কর্ত্তব্যবোধে সংগ্রহ করিবেন।

নর্ম্মদা, প্রভাস ও দ্বারকাপুরী দর্শন যাত্রার কালে অধিক পরিমাণে পঞ্চরত্ন, দ্বারকাপতির পোষাক, নূপুর, মসলা প্রভৃতি এবং কিছু শীত বস্ত্রও সংগ্রহ করিবেন।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

চিত্র-সূচী

চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শন যাত্রা

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত ৺চন্দ্রনাথ তীর্থ অবস্থিত। কলিকাতা হইতে এই তীর্থে যাইতে হইলে প্রথমে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে রেল গাড়ীর সাহায্যে গোয়ালন্দ নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইতে হয়, তথা হইতে ট্রেণ বদল করিয়া এ, বি, রেলযোগে চাঁদপুর জংশন ষ্টেশনে অবতরণপূর্ব্বক এখান হইতে পুনরায় অপর লাইনে রেল গাড়ীতে আরোহণ করিয়া চাঁদপুরের অন্তর্গত সীতাকুণ্ড নামক ষ্টেশনে নামিতে হয়।

সীতাকুণ্ড চট্টগ্রাম জেলার একটী প্রধান মহকুমা। এখানে হাট, বাজার, স্কুল, কাছারী, পুলিস, পোষ্টাফিস সমস্তই বর্ত্তমান। নগরটীতে বহু লোকের বসতি আছে। এই বিস্তৃত জনপদপূর্ণ নগরের সীতাকুণ্ড নাম কেন হইল, তদ্বিষয়ে কথিত আছে, ত্রেতাযুগে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন করিবার সময় বনবাসকালীন একদা অনুজ লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীসহ এই স্থানে যখন মহামুনি ভার্গবের আশ্রমে উপস্থিত হন, তখন ভাগ্যবান ঋষি তাঁহাদিগের শ্রীচরণ বন্দনাপূর্ব্বক আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু লক্ষ্মীস্বরূপিণী জনকনন্দিনী সীতাদেবীকে অত্যন্ত পরিশ্রান্তযুক্তা নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার শ্রান্তি দূর করিবার অভিলাষে যোগবল অবলম্বনে আশ্রমের অনতিদূরে একটী কুণ্ডের সৃষ্টি করেন, তৎপরে ভক্তিসহকারে কৃতা-

অঞ্জলিপুটে দেবীকে ঐ কুণ্ডে স্নানপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইতে অনুরোধ করেন। সাধ্বী সতী সীতাদেবী ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য কুণ্ডে অবগাহনপূর্ব্বক নিমজ্জিত হইবামাত্র কুণ্ডস্থিত "তীর্থ" মহা সাধে দেবীর রাঙ্গা চরণযুগল পূজা করিতে লাগিলেন, এইরূপে বহু সময় অতীত হইতে লাগিল। এদিকে রঘুবীর দেবীর উঠিতে বিলম্ব দেখিয়া অধীর হইলেন, কারণ তিনি অনুমান করিয়াছিলেন—সীতা ঐ কুণ্ডে নিমজ্জিত হইয়াছেন, সুতরাং ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আপন ধনুকে টঙ্কার দিয়া কুণ্ডস্থিত জল শুষ্ক করিবার মানসে ইহাতে অগ্নি-বাণ নিক্ষেপ করিলেন; ইহার ফলে কুণ্ডটী অগ্নিময় হইয়া শুষ্ক হইতে লাগিল, ঠিক সেই সময় প্রসন্নমনে সীতাদেবী স্নান কার্য্য সম্পন্নপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইয়া শ্রীরামসনে মিলিতা হইলেন, এবং যথাযথ বিলম্বের কারণ প্রকাশ করিলেন, তৎশ্রবণে রাঘবশ্রেষ্ঠ মনে মনে লজ্জিত হই-লেন, এবং আপন ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কুণ্ডস্থিত তীর্থবারিকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, আমার সন্ধান অব্যর্থ—কিন্তু ক্রোধ-বশতঃ আমি যে অগ্নিবাণ ইহাতে শুষ্ক হইবার জন্য নিক্ষেপ করিয়াছি, উহা আজ হইতে কলির চারি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অগ্নিময় হইয়াও আমার আশীর্ব্বাদে নির্ব্বিঘ্নে সীতার মহিমা প্রকাশ করিবে, তৎপরে তীর্থ কুণ্ডকে শুষ্ক হইতে হইবে; তৎসঙ্গে ইহার অগ্নিও নির্ব্বাপিত হইবে। করুণাময়ী সীতাদেবী তখন মনে মনে ভাবিলেন আমারই বিলম্বের কারণ প্রভুর আজ্ঞায় তীর্থ কুণ্ডটীর অধঃপতন হইল, অতএব কোনরূপে ইহাকে অক্ষয় করিতে হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি ধর্ম্ম সাক্ষ্যপূর্ব্বক কুণ্ডস্থ তীর্থবারিকে প্রসন্ন মনে এই বলিয়া বরদান করিলেন যে, অতঃপর যে কেহ এই জ্বালাময় সংসারের নানা প্রকার বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই কুণ্ডে স্নান করিবে—আমার বরপ্রভাবে

তিনি নিঃসন্দেহে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে শ্রীহরির শ্রীচরণে স্থান প্রাপ্ত হইবেন। সীতাদেবী প্রমুখাৎ এই অভয়বাণী বিঘোষিত হইলে পর, ভারতের নানা স্থান হইতে তখন দলে দলে কাতারে কাতারে অসংখ্য ভক্ত নরনারীগণ এখানে উপস্থিত হইয়া মুক্তি কামনায় এই অগ্নিময় তীর্থ কুণ্ডে স্নান করিতে লাগিলেন। মহর্ষি ভার্গব এই কুণ্ডটীকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য দেবীর নামানুসারে ইহাকে সীতা-কুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ করিলেন। এইরূপে প্রত্যহ ভক্তগণের আগমনে সেই জনশূন্য নির্জ্জন স্থানটী পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। ব্যবসায়ীগণ লাভের বশবর্ত্তী হইয়া এই সুযোগ পরিত্যাগ না করিয়া এখানে দোকান, হাট, বাজার প্রভৃতি আরও যাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্য ঘর বাড়ী প্রস্তুত করাইয়া ড়' পয়সা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে সেই জন-শূন্য নির্জ্জন স্থানটী এক্ষণে বহু লোকালয়ে পরিপূর্ণ হইয়া সমস্ত গ্রামটীর নাম সীতাকুণ্ড হইয়াছে। সীতাকুণ্ড তীর্থ স্থানটী, সীতাকুণ্ড নামক ষ্টেশনের এক মাইল দূরে অবস্থিত। ষ্টেশনের সন্নিকটেই বাজার, মোহান্তালয় ও গৌরাঙ্গলয় আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। এই বাজার মধ্যে বিস্তর যাত্রীনিবাস নির্ম্মিত আছে।

আমরা সদলবলে সীতাকুণ্ড ষ্টেশনে উপস্থিত হইবামাত্র, ৺চন্দ্র-নাথের পাণ্ডাগণ আমাদিগকে তীর্থযাত্রী দেখিয়া সকলে একযোগে পরিবেষ্টন করিলেন। তখন আমি আমাদের পাণ্ডা রাঘবকৃষ্ণ অধি-কারীর নাম উল্লেখ করাতে তাঁহারই অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারী যত্নের সহিত আমাদিগকে উক্ত পাণ্ডার বাটীতে লইয়া গেলেন। পাণ্ডার বাড়ীটী ষ্টেশনের অনতিদূরে অবস্থিত। যে বাটীতে আমরা উপস্থিত হইলাম অর্থাৎ পাণ্ডা যে বাটীতে বাস করেন, সেই বাটীর চতুর্দ্দিকস্থ ঘরের ছাদ খড় দ্বারা আচ্ছাদিত এবং ত্রিমহল। অন্দর

মহলে স্বয়ং পাণ্ডা ঠাকুর স্ত্রী পুত্র লইয়া বসবাস করেন, তথায় কে অপরিচিত লোক প্রবেশ করিতে পান না। দ্বিতীয় মহলে কোন ত তীর্থযাত্রী সপরিবারে আসিলে তিনি তাহাদিগকে এই দ্বিতীয় মহ বাস করিতে অধিকার দেন। অবশিষ্ট তৃতীয় মহল। এই মহল বৈঠকখানারূপে সজ্জিত। পাণ্ডা ঠাকুর প্রথমে আমাদিগকে এ দ্বিতীয় মহলেই বাসা দিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতে আমাদের ৺চন্দ্রনা তীর্থ দর্শন বাসনা বলবতী ছিল, এই নিমিত্ত কামাখ্যায় পাণ্ডার নিক হইতে এখানকার পাণ্ডা রাঘবকৃষ্ণ অধিকারী মহাশয়ের নামে এক খানি সুপারিস পত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম ; কারণ তিনি একদা বলিয়াছিলেন, যদি কখন আপনারা সীতাকুণ্ডে ৺চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শন করিতে যান, তাহা হইলে আমার এই পত্রখানি তথাকার পাণ্ডা রাঘব-কৃষ্ণ অধিকারীকে প্রদান করিলে তিনি সকল বিষয়ে আপনাদের সহায়তা করিবেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, এই রাঘবকৃষ্ণ অধি-কারী তাঁহারই একজন আত্মীয়। এই নিমিত্ত তাঁহার বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া এখানে রাঘবচন্দ্র অধিকারীকে পাণ্ডা পদে নিযুক্ত করি-বার জন্য, তাঁহারই নাম উল্লেখ করিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, এক্ষণে সেই সুপারিস পত্রখানি তাঁহাকে প্রদান করাতে দেখিলাম, তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদিগকে অত্যন্ত যত্ন করিতে লাগিলেন এবং বহি-র্ভাগের সেই বৈঠকখানা ঘরখানি সত্বর খালি করাইয়া ঐ সুসজ্জিত ঘর-খানিতে আমাদের অবস্থান করিতে অনুমতি করিলেন। বৈঠকখানা ঘরখানি মধ্যম মহলের যাত্রীবাস ঘর অপেক্ষা সহস্র গুণে পরিষ্কার, নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন। ইহার বহির্ভাগের চতুর্দ্দিকে মেটে দেওয়াল দ্বারা সুরক্ষিত। তাহার উত্তরদিকে পৃথক্ একখানি ঘর রন্ধনশালারূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। এই দুইখানি ঘরই স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার পক্ষে

উপযুক্ত এবং সুবিধাজনক বিবেচনা করিলাম। এক্ষণে এই পাণ্ডার যত্নে আমরা অত্যন্ত সুখী হইলাম সত্য, কিন্তু মনে মনে চিন্তিত হইলাম; কারণ যিনি প্রথমে এত যত্ন করিতেছেন, শেষ সুফলের সময় না গোলযোগ বাধান, ইহাই চিন্তার প্রধান কারণ হইয়াছিল। অবশেষে নানা রূপ বাক্যালাপের পর বাসা ভাড়া এবং দেব দর্শনের ও সুফলের জন্য কিরূপ খরচ লাগিবে, এই সকল বিষয় মীমাংসা করিতে মনস্থ করিলাম। তখন অধিকারী মহাশয় আমাদের মনের ভাব অনুমান করিয়া হাস্যসহকারে উত্তর দিলেন, "মহাশয় সে জন্য আপনারা চিন্তা করিবেন না। যে ব্যক্তির সুপারিস পত্র আপনারা আনিয়াছেন, তিনি আমার পূজনীয় শ্বশ্রু মহাশয়, সেই পূজ্যপাদ শ্বশ্রু মহাশয় এই পত্রে আমায় অনুরোধ করিয়াছেন যে, আমার এই সকল পরিচিত শিষ্যদিগকে বাবাজীর নিকট পাঠাইতেছি, যাহাতে ইহাদের সকল প্রকারে সুবিধা হয়, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে; ইহাদের যদি কোনরূপ কষ্ট হয়, বা আমার নিকট কোন রূপ অসন্তোষজনক পত্র আসে, তাহা হইলে তাহার জন্য তুমিই দায়ী।" এতক্ষণে আমাদের সেই সুপারিস পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম, এবং কয়দিন অবিশ্রান্ত কষ্টভোগের পর, পাণ্ডার উপদেশ মত সেদিন আহারান্তে বিশ্রাম করিতে মনস্থ করিলাম। বলাবাহুল্য, বাসাবাটীর নিকটেই বাজার থাকায় তথায় আবশ্যকীয় যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী অক্লেশে সংগ্রহ করিলাম।

পর দিবস পাণ্ডা ঠাকুরকে ভগবান ৺চন্দ্রনাথ দেবজীউর দর্শন করিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি আমাদিগকে একজন পুরোহিতের সহিত ব্যাসকুণ্ডে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিয়া শুদ্ধকলেবরে দেব স্থানে যাইতে অনুমতি করিলেন। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক ভক্তকেই প্রথমে এই ব্যাসকুণ্ডে স্নান করিয়া তৎপরে দেবস্থানে যাইতে হয়।

ব্যাসকুণ্ড

পাণ্ডার নিযুক্ত পুরোহিতের সহিত আমরা সকলে বাসাবাটী হইতে বহির্গত হইয়া প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে ব্যাসকুণ্ড নামক তীর্থ স্থানে উপস্থিত হইলাম। এই কুণ্ডটী দেখিতে ঠিক যেন একটী মধ্যম আকারের পুষ্করিণীর মত। ইহার একদিকে একটী বাঁধা ঘাট আছে, সেই ঘাটটী বেমেরামতি অবস্থায় থাকায় ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কুণ্ডটীর জল অপরিষ্কার এবং পঙ্কে পরিপূর্ণ। আমরা পুরোহিত ঠাকুরের উপদেশ মত প্রথমে এই পবিত্র কুণ্ডে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান ও তর্পণ সমাপন করিয়া ইহার পশ্চিমতীরে ভৈরবনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এই মন্দিরের দক্ষিণে ভৈরবনাথ, বামে চণ্ডিকাদেবী, ইহারই মধ্যভাগে মহামুনি ব্যাসদেবের পাষাণময় মূর্ত্তি বিরাজমান। তথায় দেবতাদিগের যথানিয়মে দর্শন, স্পর্শন ও অর্চ্চনাদি সমাপন করিয়া জীবন ও নয়ন সার্থক বোধ করিলাম। পাঠকবর্গের প্রীতির জন্য ব্যাসকুণ্ডের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

ভৈরবনাথের মন্দিরের সম্মুখে একটী ছোট নাটমন্দির আছে। এই ভৈরবনাথ এখানকার একটী জাগ্রত দেবতা। প্রায় প্রতিদিনই এখানে মানসিক পূজা ও ছাগ বলি হইয়া থাকে। পাণ্ডাদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, স্থানীয় অধিবাসীদিগের মধ্যে যখন কাহারও কোনরূপ আপদ-বিপদ উপস্থিত হয়, তাঁহারা তখনই এই ভৈরবনাথের নিকট মানসিক করিয়া থাকেন, এবং ভৈরবনাথের কৃপায় সেই বিপদ হইতে উদ্ধার হইলেই আপন আপন মানসিক পূজা প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপে ভৈরবনাথের বিস্তর আয় হইয়া থাকে।

ব্যাসকুণ্ডের উপরিভাগে মন্দিরের কিঞ্চিৎ উত্তরে বটুক বৃক্ষ নামে

শ্যাম কুণ্ডের দৃশ্য। [৭০ পৃষ্ঠা

এক অদ্ভুত বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, এই বৃক্ষমূলে ব্যাসদেব, মহেশের আদেশ মত তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, বৃক্ষের নিম্নস্থ কুণ্ডটী ব্যাসকুণ্ড নামে খ্যাত হইয়াছে। এই বটুক-বৃক্ষের ন্যায় আশ্চর্য্য বৃক্ষ বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। বৃক্ষের মূল স্থানটী ইষ্টক দ্বারা বাঁধান আছে। এখানে মন্ত্রপূত করিয়া পাঁচটী লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিবার প্রথা আছে। এইরূপে ব্যাসকুণ্ড নামক তীর্থ স্থানের নিয়ম সকল পালনপূর্ব্বক পুরোহিতের উপদেশ মত ভগবান স্বয়ম্ভুনাথের শ্রীচরণ বন্দনা করিতে যাত্রা করিলাম। স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরটী এখান হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত।

ব্যাসকুণ্ডের উৎপত্তির কিম্বদন্তী এইরূপ ;—

কাশীধামের অবিমুক্তক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বিঘোষিত হইলে পর, মহা-মুনি ব্যাসদেব কাশীর পরপারে এক স্থানে আপন নামানুসারে একটী নূতন কাশীর সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, ঐ নূতন কাশীর নাম ব্যাসকাশী হইল। মুনিবর এই ব্যাসকাশীর মাহাত্ম্য কাশীর অবিমুক্ত ক্ষেত্র অপেক্ষা অধিক করিবার মানস করিলেন, কেন না তিনি স্থির করিয়াছিলেন, কাশীক্ষেত্রে যদি কোন মহাপাপী অন্যত্রে পাপ কার্য্য করিয়া কাশীবাসী হইয়া আর কোনরূপ পাপ কার্য্যে রত না হয়, তাহা হইলে মহেশের কৃপায় অন্তে তিনি মোক্ষলাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু আমার কাশীতে যদি কোন পাপী অন্যত্রে পাপ কার্য্যে রত থাকিয়াও এখানে পাপ কার্য্য করে, এবং এই স্থানের সীমার মধ্যে দেহ ত্যাগ করিতে পারে ; তাহা হইলে আমার কৃপায় সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মুক্তি-লাভ পাইবে। মহামায়া অন্নপূর্ণাদেবী ব্যাসমুনির মনোভাব অন্তরে অবগত হইয়া এক বৃদ্ধাবেশে ব্যাস যথায় নূতন কাশী নির্ম্মাণ করিতে-

ছিলেন—তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বাবা! তুমি এক মনে আগ্রহের সহিত এখানে কি করিতেছ?"

ব্যাস-মায়াময়ীর মায়া অবগত না হইয়া বলিলেন, "বুড়ি! আমি এখানে এমন একটী কাশী নির্ম্মাণ করিতেছি যে, আমার এই ক্ষেত্রে যে কোন মহাপাপী আসিয়া বাস করিবে, অথবা অপর কোন স্থানে পাপ কার্য্য করিয়া যদি আমার প্রতিষ্ঠিত কাশীসীমার মধ্যে থাকিয়াও সর্ব্বদা পাপে রত হয়, এবং এখানে দেহ ত্যাগ করে, তাহা হইলে আমি স্বয়ং তাহাকে মুক্তিদান করিয়া শিবলোকে স্থান দান করিব।"

ব্যাস প্রমুখাৎ দেবী এইরূপ অবগত হইয়া কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ দুই-এক পদ পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া পুনরায় অগ্রসর হইয়া ব্যাসকে বলিলেন, "বাবা, তুমি কি বলিলে—এখানে মরিলে কি হয় বলিলে বাবা?"

এইরূপ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে ব্যাস বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এখানে মর্‌লে গাধা হয়, শুন্‌তে পেয়েছিস্ বুড়ি!"

দেবী "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার আশা ব্যর্থ করিয়া আপন গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ব্যাসদেব আপন বুদ্ধির দোষে এইরূপে দেবীর নিকট পরা[illegible] হইয়া অকৃতকার্য্য হইলেন। কারণ ব্যাসদেব যে কাশীর সৃষ্টি ক[illegible]লেন, এই সীমার মধ্যে কেহ প্রাণ ত্যাগ করিলে তাহাকে দেবীর বরপ্রভাবে গর্দ্দভ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এই কারণে মনের দুঃখে মহেশ্বরকে প্রসন্ন করিবার মানসে ব্যাসদেব বিশ্বেশ্বর নির্ম্মিত কাশীসীমার মধ্যে এক স্থানে বসিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। ভোলা মহেশ্বর মুনির আচরণে পূর্ব্ব হইতে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু এবার তাঁহার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া ব্যাসের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার মানসে তাঁহার সাধের কাশী-

...ার মধ্যে স্থানদান না করিয়া বহু দূরদেশে এই চন্দ্রনাথ তীর্থ স্থানে ...ন অমোঘ অস্ত্র "ত্রিশূল" নিক্ষেপপূর্ব্বক মুনির তপস্যা স্থান নির্ণয় ...িয়া ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁহাকে তপস্যা করিতে আদেশ করিলেন। যে ...নে শূলপাণির শূলটী পতিত হইয়াছিল, মূল অস্ত্র পতিত হইবার ...ভাবে সেই স্থানটী এক কুণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। যে কুণ্ড মহেশ্বরের ...ল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সে কুণ্ডের মাহাত্ম্য বর্ণনাতীত।

৺স্বয়ম্ভুনাথের দর্শন যাত্রা

ব্যাসকুণ্ড হইতে পূর্ব্বদিকে প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ...কটী পাহাড়ের উপরিভাগে ভগবান স্বয়ম্ভুনাথের দর্শন পাওয়া যায়। ...ৎপরে মন্দির পার্শ্বে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সীতা, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি বহুবিধ ...গ্রহ মূর্ত্তির দর্শনলাভে চরিতার্থ হইবেন, সন্দেহ নাই। এই দেবালয়ে ...ঠিবার সিঁড়ি আছে, পাহাড়টীও বেশী উচ্চ নয়। যে পর্ব্বতোপরি স্বয়ম্ভুনাথ বিরাজ করিতেছেন, তাহার নিম্নস্তরে অনেকগুলি তীর্থ ...রাজিত। যথা;—সীতাকুণ্ড, রামকুণ্ড, লক্ষ্মণকুণ্ড, কালী বাড়ী ও ...ন্মথ নদ। বেলা বার ঘটিকার সময় ভগবানের মূলমন্দিরের প্রবেশ ...র চিরপ্রথানুসারে বন্ধ হয়, এইরূপ উপদেশ পাইয়া পাণ্ডার আদেশ ...ত নিম্নস্থ তীর্থগুলির সেবা না করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই আমরা ৺স্বয়ম্ভু-...াথের দর্শন করিতে মনস্থ করিলাম; কারণ এই পর্ব্বত নিম্নস্থ ...া সকল তীর্থ আছে, উহাদিগের একে একে সেবা করিতে হইলে ...বলা অধিক হইবে—তখন ৺স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির বন্ধ হইয়া যাইবে, ...তরাং এই পর্ব্বতোপরি আরোহণপূর্ব্বক প্রথমে ৺স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরা-...ভ্যন্তরে পরম করুণাময় কৃপার আধার জগৎ-পিতা স্বয়ম্ভুনাথের অদ্ভুত

.অনাদি লিঙ্গ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করিলাম। ব্যক্তি মন্দির দ্বার রক্ষা করে. তাহাকে সাধ্যমত কিছু দান করিতে হয় আমরা সচরাচর যেরূপ অনাদি-লিঙ্গ দর্শন পাইয়া থাকি, ভগবা স্বয়ম্ভুনাথের লিঙ্গটী কিন্তু সেরূপ দর্শন পাইলাম না।

কথিত আছে, "কলিযুগে বসামি চন্দ্রশেখরে" সেই বাক্য পালনা তিনি স্বয়ং চন্দ্রনাথ অষ্টশক্তি অষ্ট মূর্ত্তিতে স্বয়ম্ভু লিঙ্গরূপে এখানকা তীর্থসমূহে বিরাজ করিতেছেন। এই লিঙ্গরাজের আকৃতির ভাব ক্রমে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম হইয়া অগ্রভাগটী অতি সূক্ষ্মে পরিণত। কত দেশ কত বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি এরূপ আশ্চর্য্য আকৃতি লিঙ্গমূর্ত্তি আমার নয়নগোচর হয় নাই। ৺স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির স্থানটী পরিসর অল্প, তথাপি এখানকার মনঃপ্রাণ মুগ্ধকর চিত্তবিমোহন প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করিলেই আনন্দিত হইতে হয়। মন্দির মধ্যে যে স্থানে ভগবান বিরাজ করিতেছেন, সেই স্থানটী লৌহ নির্ম্মিত রেলি দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাহার চতুর্দ্দিকে অল্প পরিসর স্থানও আছে। পূজারী গণ ঐ রেলিংএর এক ধার সর্ব্বদা তালা বন্ধ করিয়া রাখেন। যাত্রী নিকট কিছু পৃথক্ দক্ষিণা পাইলে তাঁহারা ঐ তালা বন্ধ ফটকটী খুলিয় তন্মধ্যে ভক্তগণকে প্রবেশ করাইয়া তাহাদের প্রদত্ত পূজা ঐ স্থানে গ্রহণ করেন, এবং তৎসঙ্গে দেব অঙ্গ স্পর্শ করিতেও অধিকার দেন নচেৎ এই রেলিংএর বহির্ভাগ হইতে অতি কষ্টে পূজার ডালা প্রদান করিতে হয়। বলাবাহুল্য, এই রেলিংএর বহির্ভাগ হইতে দেব অঙ্গ স্পর্শ করিবার উপায় নাই। ভগবান স্বয়ম্ভুনাথের লিঙ্গগাত্রে উচু নীচু থাকযুক্ত একটী বেড়ের মত রেখা থাকায় ইহার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিতেছে। লিঙ্গরাজের নিম্ন ভাগের চারিদিক্ গভীর খাদযুক্ত। হস্ত দ্বারা ইহার তলদেশ স্পর্শ

যায় না। ভক্তগণ এই লিঙ্গের মস্তকোপরি যাহা প্রদান করেন
হা মোহন্তের, আর পূজান্তে যে দক্ষিণা দেন—উহা পূজারীদিগের
প্য। এই নিয়ম সর্ব্বত্রই আছে। এক্ষণে মোহন্তের নামে উচ্ছেদের
াকদ্দমা রুজু হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট হইতে একজন রিসিভার নিযুক্ত
িয়াছেন, তিনিই এক্ষণে মোহন্তের যাবতীয় কাজ-কর্ম্ম চালাইতেছেন।
খন আর মন্দির মধ্যে মোহন্ত আসিতে পারেন না, সুতরাং মোহন্তের
াপ্য মূল্য সরকারে জমা হইতেছে। এই সকল মূল্য সংগ্রহের জন্য
ন্দির মধ্যে সদাসর্ব্বদাই একজন রিসিভারের লোক উপস্থিত থাকেন।
ইরূপে আমরা ৺স্বয়ম্ভুনাথের সেবা এবং তীর্থের নিয়ম সকল পালন
রিলাম।

কথিত আছে, ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান স্বয়ম্ভুনাথের দর্শন করিলে
হস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণ ত্যাগ করিলে,
িষ্ণু-সুদর্শন চক্রে সেই মৃতদেহ ছিন্ন করিয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিয়া-
ছলেন। ঐ সময় চন্দ্রনাথ পর্ব্বতে সতীর ছিন্ন দেহের দক্ষিণ হস্ত
াড়িয়াছিল বলিয়া চন্দ্রনাথ তীর্থ ভগবান চন্দ্রশেখরের অত্যন্ত প্রিয়
্যান হইয়াছে, এই স্থানে তিনি চিরাধিষ্ঠিত।

চন্দ্রনাথ মন্দিরের পশ্চাতে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন আছে, সেইজন্য
বৌদ্ধ সম্প্রদায় এই স্থানকে অতি পবিত্র তীর্থ স্থান বলিয়া মনে করেন।

স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরস্থ বাহির-প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি প্রতি-
ষ্ঠিত শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া কত আনন্দ অনুভব করিবেন, সন্দেহ নাই।
মন্দিরের সম্মুখে একটী দরদালান আছে। এখানে দেব উদ্দেশে বেদ
পাঠ ও হোমাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহার এক পার্শ্বে অনেকগুলি শাল-
গ্রাম শিলা দেদীপ্যমান। তাহার বাম পার্শ্বে একটী বাঁধান বেদী দেখিতে
পাওয়া যায়; কথিত আছে, ঐ বেদীটী দ্বাদশটী শালগ্রাম শিলার উপর

অবস্থিত। বিজয়া দশমীর শুভদিন এবং অন্যান্য কোন বিশেষ পর্ব্বদি উপলক্ষে ঐ বেদীর উপর স্বয়ং মোহন্ত মহাশয় উপবেশনপূর্ব্বক ভগ বানের মহিমা প্রচার করেন। ইহার সন্নিকটে আবার একটী গদী দেখিতে পাওয়া যায়, সেই গদীটীতে প্রত্যহ মোহন্ত বসিয়া আপ কাজ-কর্ম্ম পরিচালনা করিতেন; এক্ষণে মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে এই গদীটী শূন্য অবস্থায় আছে।

স্বয়ম্ভূনাথের পূজার বা দক্ষিণার কোন বাঁধা নিয়ম দেখিতে পাই লাম না। ভক্তগণ সাধ্যমত যাহা সন্তুষ্ট হইয়া প্রদান করেন, পূজারী ঠাকুরকে তাহাই লইতে হয়, কিন্তু দক্ষিণা তাঁহাদিগকে যতই প্রদান করুন না কেন, তাঁহারা কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না। শিবরাত্রির সময় এখানে বহু দূরদেশ হইতে বিস্তর ভক্তগণের সমাগম হয়।

এই মন্দির সম্মুখে একটী ভোগ মন্দির আছে। পূর্ব্বে এখানে কোন ভোগ মন্দির না থাকায় পূজারীদিগকে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হইত; সম্প্রতি রঙ্গপুর জেলার জনৈক ভক্ত এই কষ্ট দূরীকরণার্থে বহু অর্থ ব্যয়সহকারে ইহা নির্ম্মাণ করাইয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন, তৎসঙ্গে পূজারীদিগের অভাবটীও পূরণ করিয়াছেন। পাঠকবর্গের প্রীতির জন্য একখানি স্বয়ম্ভূনাথের মন্দিরের চিত্র প্রদত্ত হইল।

মোহন্তের নামে মোকদ্দমা হইবার প্রধান কারণ এই যে, তিনি বাড়বানলের পাণ্ডার সুন্দরী যুবতী কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত এখানকার পাণ্ডাগণ এবং চট্টগ্রামের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এমন কি উকীল মোক্তারগণ পর্য্যন্ত একত্রিত হইয়া মোহন্তের এই গর্হিত কার্য্যে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, মোহন্তের বিবাহ প্রথা কোন স্থানেই নাই। যে মোহন্ত বিবাহ করেন,

...ত সংসারী হইলেন—অতএব সংসারী ব্যক্তি মোহন্তপদে অধি-...রী হইতে পারে না। এইরূপ তাঁহারা কত যুক্তিতর্ক করিলেন, ...ন্তু কিছুতেই কোন ফলোদয় হইল না দেখিয়া তাঁহারা সকলে এক ...যোগে গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের নিকট সুবিচারের জন্য আশ্রয় গ্রহণ ...করিয়াছেন। মোহন্ত উত্তর দিয়াছেন, আমি শাস্ত্রমতে কাহাকেও ...বিবাহ করি নাই বা সংসারী হই নাই, তবে কার্য্যসিদ্ধির জন্য শক্তির ...আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি মাত্র—সুতরাং ইহা দোষনীয় হইতে পারে না।

মোহন্তের আমলে ইতিপূর্ব্বে প্রত্যেক যাত্রীকে ।৴০ পাঁচ সিকা ...াদীতে জমা দিয়া দেবদর্শনের জন্য ছাড় পত্র লইতে হইত, কিন্তু সদা-...শয় গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য উক্ত প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছেন।

তৎপরে কিছু নিম্নে অবতরণ করিবার সময় পাণ্ডা ঠাকুর "কালী-বাড়ী" নামক তীর্থ স্থানে লইয়া গেলেন।

কালীবাড়ী

এখানে প্রস্তরময়ী দশভুজা কালিকাদেবীর প্রতিমাখানি দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিলাম। মন্দিরাভ্যন্তরে জগজ্জননী নানা অল-ঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া যেন পুরী আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতে-ছেন। "চন্দ্রনাথ তীর্থ" একটী পীঠ স্থান। "চট্টলে দক্ষবাহুর্ম্মে ভৈরশ্চন্দ্র শেখরঃ।" ইহার সন্নিকটে অনেকগুলি তীর্থ বিরাজমান—কিন্তু দুরা-রোহ, অগম্য, ভীতিসঙ্কুল পর্ব্বত মধ্যে তীর্থগুলির অবস্থান বলিয়া সকলের ভাগ্যে এই সমস্ত তীর্থ স্থানগুলির দর্শন লাভ হয় না।

চন্দ্রনাথে যে সমস্ত তীর্থ বিরাজিত, যথানুক্রমে সেই সকল তীর্থ স্থানগুলির নাম প্রকাশিত হইল ;—

১। ব্যাসকুণ্ড, ২। সীতাকুণ্ড, ৩। রাম ও লক্ষ্মণকুণ্ড, ৪। মহা-দেবের নেত্রাগ্নি, ইহা "জ্যোতির্ম্ময়" তীর্থ নামে খ্যাত, ৫। মন্মথ-নদ বা স্বয়ম্ভু গয়া, ৬। কালীবাড়ী, ৭। ৺স্বয়ম্ভূনাথের মন্দির, ৮। উন-কোটী শিবের বাটী, ৯। বিরূপাক্ষদেবের মন্দির, ১০। চন্দ্রনাথ, ১১। পাতালপুরী, ১২। বাড়বানল কুণ্ড, ১৩। লবনাক্ষকুণ্ড, ১৪। গুরুধুনী, ১৫। ব্রহ্মকুণ্ড, ১৬। সহস্রধারা, ১৭। সূর্য্যকুণ্ড, ১৮। কুমারীকুণ্ড, ১৯। আদিনাথের দেবালয়।

এই আদিনাথের দেবালয় দর্শন করিতে অতি অল্প লোকেই প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হন। ইহা চট্টগ্রামের ৩০ ক্রোশ দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্ত্তী মহেশখালি দ্বীপের এক পর্ব্বতোপরি বিরাজিত।

মন্মথ-নদ

শ্রীশ্রীকালীকাদেবীর শ্রীচরণ বন্দনাপূর্ব্বক আরও কিছু নিম্নে অব-তরণ করিয়া সিঁড়ির তলদেশে এক ক্ষুদ্র ঝরণা প্রবাহিত হইতেছে দেখিতে পাইলাম। ঐ ঝরণাই "মন্মথ-নদ" তীর্থ নামে খ্যাত। ৺স্বয়ম্ভূ-নাথের পাহাড়টী দক্ষিণে রাখিয়া একটী অপ্রশস্ত রাস্তা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই রাস্তার ধারে ধারে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই "স্বয়ম্ভূনাথ গয়া" নামে এক কুণ্ডে উপস্থিত হওয়া যায়। এই গয়াকুণ্ডেই চন্দ্রনাথ তীর্থ নিমিত্তক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এখানে স্বয়ম্ভু গয়া বা মন্মথ-নদ তীরে প্রয়াগ তীর্থের ন্যায় প্রথমে মস্তক মুণ্ডন, তৎপরে যথানিয়মে পিণ্ডদান করিতে হয়। পূর্ব্বে এই স্থান অনাবৃত ছিল; তখন শ্রাদ্ধ করিবার পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা হইত, সম্প্রতি এক অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বরী হিন্দু রমণী যাত্রীদিগের অসুবিধা দূরীকরণার্থে বহু অর্থ ব্যয়-

সহকারে এথানকার এই পুণ্যভূমির উপরিভাগে করোগেট ছাদযুক্ত একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া সাধারণের যে কত উপকার করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। এই গৃহের মেজেটী পাকা এবং রেলীং দ্বারা বেষ্টিত। গৃহের পশ্চিমদিকে একটী খাদ আছে, ঐ খাদের ধারে বসিয়া যাত্রীগণ পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিয়া আপন আপন মুক্তিপথ প্রশস্ত করিয়া থাকেন। তৎপরে পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া এখান হইতে কিয়দ্দূর পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইলেই "সীতাকুণ্ড" নামক প্রাচীন পুণ্যকুণ্ড দর্শন পাওয়া যায়। এক্ষণে কলির চারি সহস্র বৎসর অতীত হওয়ায় এই কুণ্ডটী শ্রীরাম বাক্যে ভরাট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মহর্ষি ভার্গবের আশ্রম মন্দিরের চূড়াটী অদ্যাপি এই তীর্থ স্থানটী নির্দ্দেশ করিবার জন্য মস্তক উন্নত করিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই স্থানটী অতি নির্জ্জন ও কানন-সৌন্দর্য্যে এত সমালঙ্কৃত যে, এই পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইলেই স্থান মাহাত্ম্যগুণে মন যেন ভগবৎপ্রেমে মুগ্ধ হয়। ভক্তগণ এক্ষণে এই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া সীতাদেবীর রাঙ্গা চরণ দুইখানি স্মরণ করেন, এবং এই পুণ্যভূমির কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা মস্তকে লেপন করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিতে থাকেন, ইহার পরই রাম ও লক্ষ্মণ কুণ্ড। কথিত আছে, শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা ভার্গব মুনির আশ্রমে অবস্থানকালে এই পাশাপাশি কুণ্ডদ্বয়ে স্নান করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহাদের নামানুসারে কুণ্ডদ্বয় প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহারা ছোট চৌবাচ্চার ন্যায় দেখিতে, কিন্তু সংস্কার অভাবে জল দুর্গন্ধময় হইয়াছে। সে যাহা হউক, পাণ্ডা ঠাকুরের উপদেশ মত এই কুণ্ডদ্বয়ের জল স্পর্শ করিয়া চরিতার্থ বোধ করিলাম। এইরূপে উপরোক্ত তীর্থ স্থানগুলির সেবা করিতে বেলা অতিরিক্ত হইয়াছিল, সুতরাং সেদিনকার মত

আর অপর কোন তীর্থে অগ্রসর না হইয়া বিশ্রামের জন্য এখান হই
বাসাবাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

ভগবান স্বয়ম্ভূনাথের নরলোকে প্রকাশ সম্ব

কিম্বদন্তী এইরূপ ;—

পুরাকালে এই স্থান গভীর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। ইহার সন্নিকট স্থানে যে সমস্ত অধিবাসী ছিলেন, তাহারা সকলেই জাতিতে মুসলমান তন্মধ্যে কেবল একজনমাত্র রজকের বাস ছিল। এই রজকের অনে গুলি দুগ্ধবতী গাভী ছিল, সে প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া আপন গাভীগুলি দুগ্ধ দোহন করিয়া তৎপরে গোয়াল ঘর হইতে ছাড়িয়া দিত, তখ গাভীগুলি নিকটস্থ পর্ব্বতে ও জঙ্গলে সমস্ত দিন স্বাধীনভাবে চরি আবার সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে প্রসন্নমনে আপন আপন গোয়ালে প্রত্যা গমন করিত। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে পর একদা রজ দেখিল যে, তাঁহার সমস্ত গাভীগুলির মধ্যে একটী সর্ব্ব সুলক্ষণযুক্ত হৃষ্টপুষ্ট গাভী পূর্ব্বের ন্যায় আর দুগ্ধ দিতেছে না, তখন সে মনে ম ভাবিল যে, নিশ্চয় কোন দুষ্ট লোক আমার ক্ষতি করিবার অভিপ্রা এই গাভীর দুগ্ধ দোহন করিয়া লয় ; ঐ চোরকে ধরিবার মানসে একদ রজক অলক্ষ্যে সেই গাভীর অনুসরণ করিল। এইরূপে কিয়দ্দূর অগ্রস হইলে পর সে স্বচক্ষে যাহা দর্শন করিল, উহাতেই তাহাকে স্তম্ভি হইতে হইল। কারণ এই গাভীটী প্রথমে গোয়াল ঘর হইতে বহির্গ হইয়া অন্য কোন স্থানে না যাইয়া ক্রমশঃ এক পাহাড়ে উপস্থিত হইল তথায় এক জঙ্গলাকীর্ণ উচ্চ ঢিপির উপর পশ্চাতের দুই পা প্রসার করিয়া দাঁড়াইল, এবং তৎক্ষণাৎ ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় তাহার বাঁট হইতে

অবিরল ধারে দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে লাগিল; এইরূপে গাভীটী তাহার সমস্ত দুগ্ধ প্রদান করিয়া আপন গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিল। রজক এই আশ্চর্য্য দৃশ্য অবলোকন করিয়া এক মনে কেবল এই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিল না। তখন হতাশ মনে এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া সেই পর্ব্বতের এক স্থানে বসিয়া কেবল এই বিষয়ই চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইলে ভগবান স্বয়ম্ভু তাহার উপর সদয় হইয়া স্বপ্নে দর্শনদানে আদেশ করিলেন, "ভক্তবীর! তোমার অচলা ভক্তিতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি, তুমি আমার পূজার ব্যবস্থা কর।"

রজক স্বপ্নে সেই তেজপুঞ্জ ভগবানের অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, যে আমি অধম জাতি; কিরূপে ভগবানের পূজা করিব, ঐ পল্লীর নিকটে কোন ব্রাহ্মণ দূরে থাকুক—কোন হিন্দুর বসতি পর্য্যন্ত নাই। অতএব আমি নীচ জাতি হইয়া কিরূপে দেবাদেশ পালন করিব। এই চিন্তাতেই তাহাকে আকুল করিল, তখন স্বয়ম্ভুনাথ পুনর্ব্বার তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া মধুর বচনে উপদেশ দিলেন, "ভক্তচূড়ামণি! তুমি চিন্তিত হইও না, এখান হইতে ২০ ক্রোশ দূরে "মঠবাড়ী" নামক এক গ্রাম আছে, তথায় মাত্র আট ঘর অধিকারী বাস করেন। তুমি আমার উপদেশ মত তথায় গমন কর এবং তাহাদিগকে আমার পাণ্ডা পদে নিযুক্ত কর, আরও তাহা-দিগকে আমার পূজক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া যথানিয়মে সেবা চালাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিবে।" রজক স্বপ্নাদেশ মত ভগবৎ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া মঠবাড়ী গ্রামে নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত হইয়া দেব আজ্ঞা প্রচার করিল। রজক প্রমুখাৎ এই শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া যুক্তিপূর্ব্বক এক পূজক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া দেবসেবার

ভার লইলেন। অধিকারীরা যে পূজক নিযুক্ত করিলেন, তিনি বি করিয়া দেখিলেন যে, এই দেব এক "অনাদিলিঙ্গ"। অতএব দেবের পূজার সুবন্দোবস্তের নিমিত্ত একটী মোহন্তের আবশ্যক, কি কোন গৃহস্থের মোহন্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে, কারণ এই জাগ্রত দেবত পূজার কোনরূপ ত্রুটি হইলে তাহাকে স্ববংশে নির্ব্বংশ হইতে হইবে পূজারী ঠাকুরের নিকট অধিকারীরা এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হই সকলে যুক্তিপূর্ব্বক পশ্চিম দেশীয় একজন সন্ন্যাসীকে এই স্থানে আন ইয়া তাঁহাকেই মোহন্ত পদে নিযুক্ত করিলেন। তদবধি ঐ মোহন্তে ইচ্ছায় যথানিয়মে দেবসেবা চলিতে লাগিল। বলাবাহুল্য যে, সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ,সর্ব্বত্যাগী এবং সর্ব্বগুণের আধার না হইলে কেহ কখন মোহ পদের যোগ্য হইতে পারেন না। এই মোহন্তের আবার অনেকগুলি চেলা থাকে। কোন মোহন্তের মৃত্যু হইলে যিনি তাঁহার প্রধান চেলা সাব্যস্ত হন, অপর অপর বিখ্যাত তীর্থ স্থানের দশজন মোহন্ত উপস্থিত থাকিয়া সেই প্রধান চেলাকেই সর্ব্বসমক্ষে মোহন্ত পদে অভিষিক্ত করেন। এইরূপ ব্যবস্থার গুণে কোনরূপ গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে না, নচেৎ সকল চেলাগুলিই মোহন্ত হইবার জন্য বিভ্রাট ঘটাইতে পারেন; এই নিয়ম এ পর্য্যন্ত সকল স্থানেই চলিয়া আসিতেছে। যে যাহা হউক, মঠবাড়ীর অধিকারীদিগের ঐকান্তিক পরিশ্রমে সেই স্থানে ভগবানের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া মোহন্তের আদেশ মত যথানিয়মে স্বয়ম্ভূনাথের সেবা হইতে লাগিল। বলাবাহুল্য, এই আট ঘর অধি কারীরাই এই দেবতার পাণ্ডা হইলেন, কিন্তু দেবাদেশ মত তাঁহা নিজে কখন পূজা করেন না। এইরূপে ভগবান স্বয়ম্ভূনাথ নরলোকে প্রকাশিত হইয়াছেন।

পর দিবস পাণ্ডা ঠাকুরের উপদেশ মত আমরা সকলে তাঁহার

অধীনস্থ একজন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর সহিত কুমারীকুণ্ড ও বাড়বানল নামক তীর্থদ্বয়ের সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সীতাকুণ্ডের বাসাবাটী হইতে "বাড়বানলকুণ্ড" নামক তীর্থ স্থানটী অন্যূন পাঁচ মাইল দক্ষিণ কোণে অবস্থিত। এখান হইতে কুমারীকুণ্ড নামক তীর্থ স্থান আবার তিন মাইল দূরে অবস্থিত। এই ৮ মাইল পথ সীতাকুণ্ড হইতে একাধিক্রমে গমনাগমন করা অত্যন্ত কষ্টদায়ক; কারণ কোথাও পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ, কোথাও প্রশস্ত রাজপথ, আবার কোথাও বা বন-জঙ্গলাকৃতি স্থান ভেদ করিয়া উপরোক্ত তীর্থ স্থানদ্বয়ের পাদদেশে উপস্থিত হইতে হয়। এইরূপ উপদেশ পাইয়া আমরা পদব্রজে বা গো-শকটের সাহায্য না লইয়া সীতাকুণ্ড ষ্টেশন হইতে বাড়বানল নামক তীর্থ স্থানটী দর্শন করিতে রেলযোগে যাত্রা করিয়াছিলাম। এই তীর্থ স্থানে রেলে যাইলে সীতাকুণ্ডের পরবর্ত্তী কাড়বা নামক ষ্টেশনে /৫ ভাড়া দিয়া যাইতে হয়। ষ্টেশন হইতে তীর্থ স্থানটী অন্যূন মাত্র দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। এখানকার রাস্তা প্রায়ই সমতল, সুতরাং উঠা নামার কষ্ট নাই, এইরূপে অক্লেশে এই পথের উপর দিয়া তীর্থ-তীরে উপস্থিত হইলাম। এই ষ্টেশনের সন্নিকটেই কুমারীকুণ্ড নামক তীর্থটী অবস্থিত।

কুমারীকুণ্ড

কুমারীকুণ্ড নামক তীর্থটী এক অদ্ভুত দৃশ্য! ইহা একটী অগ্নিময় জলন্ত জলকুণ্ড। এখানে মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সঙ্কল্পসহকারে জল স্পর্শ করিতে হয়, কেহ বা স্নান করেন; তৎপরে এখানে পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে তর্পণ এবং দেবতাদিগের উদ্দেশে হোম করিতে হয়। আমা-দিগের পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন, যাহারা কুমারীকুণ্ড ও বাড়বানলে

স্নান করিতে ইচ্ছা করেন,তাহারা উভয় কুণ্ডতেই স্নান করিতে পারেন কিন্তু যাহারা দুই কুণ্ডে স্নান না করিবেন ; তাহারা কুমারীকুণ্ডে সঙ্কল্প পূর্ব্বক জল স্পর্শ, তর্পণ ও হোম করিলে একই তীর্থ ফল প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার উপদেশ মত আমরা কুমারীকুণ্ডের জল স্পর্শ করিয়া অপরাপর নিয়মগুলি পালনপূর্ব্বক এখান হইতে দুইখানি গো-শকট ভাড়া করিয়া বাড়বানলকুণ্ডের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম।

বাড়বানল তীর্থ

এই তীর্থ স্থানটী সমতলভূমি হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চে এক মন্দির মধ্যে বিরাজিত। মন্দিরের প্রবেশ পথের সম্মুখ ভাগের স্থানটী পরিষ্কার মারবেল প্রস্তর দ্বারা গাঁথা। অবগত হইলাম, জনৈক বাঙ্গালী—যাত্রী-দিগের বিশ্রামের জন্য এই স্থানটী নিজ ব্যয়ে বাঁধাইয়া দিয়াছেন। স্থানীয় পাণ্ডার নিকট উপদেশ পাইলাম, শিবরাত্রির সময় এখানে অত্যন্ত ভিড় হয়, ঐ সময় তীর্থ কুণ্ডটীর দুইটী মুখ খোলা রাখিয়া অপর দুইটী মুখ বন্ধ রাখা হয়, কেন না সমস্ত মুখগুলিই খোলা রাখিলে এক যোগে অধিক সংখ্যক যাত্রীর স্নান করিবার অসুবিধা ঘটে। মন্দিরা-ভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যাহা দর্শন করিলাম, উহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। বাড়বানল নামক পবিত্র কুণ্ডটী চতুষ্কোণাকৃতি এবং দেখিতে এক প্রকাণ্ড ডোবার ন্যায় এখানকার পাণ্ডা স্বতন্ত্র। পুরোহিত ঠাকুরের নিকট উপদেশ পাইলাম, এখানকার একজন পাণ্ডার এক যুবতী সুন্দরী কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া ৺স্বয়ম্ভুনাথের মোহন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া রাজ-দ্বারে বিচারার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। বাড়বাকুণ্ডের গভীরতা যে কত তাহা অদ্যাপি কেহ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। স্থানীয় পূজারীর

বলিলেন, ইহা পুষ্কর তীর্থের ন্যায় অতলস্পর্শী, আবার কেহ বলেন, এই কুণ্ডটী পাতালের সহিত সংলগ্ন আছে। ইহাদের কোন্ কথাটী ঠিক তাহা জানিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক, যাত্রীগণ যাহাতে এই অতলস্পর্শী পবিত্র কুণ্ডে নির্ব্বিঘ্নে বসিয়া স্নান করিতে পারেন, তাহার সুবন্দোবস্ত আছে। একখানি মোটা লৌহের চাদর প্রস্থে পাঁচ হস্ত পরিমাণ তাহার চারি ধারে লোহার জাল দ্বারা বেষ্টিত, এইরূপ এক-খানি চাদর কুণ্ড জলের তিন হস্ত নিম্নে মোটা শিকল দ্বারা ঝোলান আছে। স্থানীয় পাণ্ডারা আপন আপন যাত্রীদিগকে সেই চাদরের উপর সাবধানের সহিত বসাইয়া স্নানসহকারে ভক্তদিগের মুক্তি পথ পরিষ্কার করাইয়া দেন, কিন্তু যে সকল যাত্রী এইরূপ ভয়াবহ ও কষ্টকর অবস্থায় মুক্তি স্নান করিয়া স্বর্গের পরিবর্ত্তে পাতালে যাইবার জন্য ভীত হইবেন, পুরোহিতগণ সেই সকল যাত্রীদিগকে কেবলমাত্র এই পবিত্র কুণ্ডবারি স্পর্শ করাইয়া থাকেন। এ তীর্থেও সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নানান্তে তর্পণ দেবতাদিগের উদ্দেশে হোম প্রভৃতি নিয়মগুলি পালন করিতে হয়। বাড়বানল কুণ্ডের পূর্ব্বপ্রান্ত কোণ হইতে একটী অগ্নিশিখা অন-বরত দপ্ দপ্ শব্দে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, এবং সর্ব্বসমক্ষে উত্থিত হইয়া ভগবানের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। এই অগ্নিশিখা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! লীলাময়ের সৃষ্টির মধ্যে যে সমস্ত লীলা আছে, তন্মধ্যে ইহা এক অদ্ভুত লীলা! যে অগ্নিতে জল দিলে তাহার তেজ প্রশমিত হয়, সেই অগ্নি অতল জলরাশির মধ্যে থাকিয়াও সতত ক্রীড়া করিতেছে, অথচ স্নানের সময় সেই জলের শীতলতা অনুভব হয়। কথিত আছে, যিনি ভক্তি-সহকারে শুদ্ধচিত্তে এই পবিত্র বাড়বানলে স্নান করেন, অন্তে স্বয়ং সদাশিব তাঁহাকে মুক্তি প্রদানপূর্ব্বক শিবলোকে স্থানদান করেন। এইরূপে উপরোক্ত কুণ্ডদ্বয়ের সেবা করিয়া ইহার নিকটবর্ত্তী এক স্থানে

কালভৈরব ও অন্নপূর্ণাদেবীর দর্শন করিয়া জীবন ও নয়ন চরিতার্থ করিলাম; তৎপরে পথিমধ্যে জ্বালামুখী কালীমূর্ত্তিও দর্শন করিলাম। কথিত আছে, ভক্তিপূর্ব্বক এই কালিকাদেবীর দর্শনে মানব, সকল প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন; তাহার পর এখান হইতে লবণাক্ষ নামক তীর্থের সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

লবণাক্ষ তীর্থ

কুমারীকুণ্ড হইতে লবণাক্ষ তীর্থ স্থানটী অন্যূন দুই মাইল দূরে অবস্থিত। এই ক্রোশব্যাপী পথ কোথাও পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ, কোথাও বন জঙ্গলাকৃতি স্থানের মধ্য দিয়া, আবার কোথাও বা রাজপথের উপর দিয়া যাইতে হয়। যাঁহারা এই দুর্গম পথ চলিতে অসমর্থ হইবেন, তাঁহাদিগকে গো-যানে যাইতে হইবে। বলাবাহুল্য, আমাদিগের সহিত স্ত্রীলোক এবং অসমর্থ বালক-বালিকা থাকাতে বাধ্য হইয়া গো-যানের সাহায্যে এই তীর্থের পাদমূলে উপস্থিত হইয়াছিলাম। লবণাক্ষ তীর্থটী এক প্রস্রবণ বিশেষ। ইহার জল উষ্ণ ও সমুদ্রের জলের ন্যায় আস্বাদে লবণাক্ত; এই কারণের জন্য এই তীর্থ কুণ্ডটীর নাম "লবণাক্ষ" হইয়াছে। লবণাক্ষের সন্নিকটেই বাসিকুণ্ড নামে অপর একটী কুণ্ড বিরাজিত, অর্থাৎ লবণাক্ষ তীর্থকুণ্ডের জল উথলিয়া যে স্থানে পতিত হইতেছে, সেই স্থানটীই বাসিকুণ্ড নামে খ্যাত হইয়াছে। পুরোহিত ঠাকুরের উপদেশ মত সর্ব্বপ্রথমে আমরা সকলেই এই বাসিকুণ্ডের জল স্পর্শপূর্ব্বক কায়া শুদ্ধ করিয়া তৎপরে লবণাক্ষ কুণ্ডে স্নান করিলাম। লবণাক্ষ কুণ্ডটী একটী গৃহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহার উপরিভাগে এক পার্শ্বে এক স্থান হইতে অগ্নিশিখা বহির্গত হইতেছে এবং নীল-

বর্ণের একটী রেখা কুণ্ডটীর উপর পতিত থাকিয়া ইহার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে। এই কুণ্ডের জল অধিক উষ্ণ নহে, কিম্বা স্নান করিবার সময় অগ্নি-ক্রীড়া হইবার নিমিত্ত কোনরূপ অসুবিধা ভোগও করিতে হয় না। ইহার যে স্থান হইতে অগ্নিশিখা বহির্গত হইতেছে, সেই স্থানের তীরে পাণ্ডার নিযুক্ত একটী লোক বসিয়া যাত্রীদিগের নিকট হইতে পয়সা আদায় করিয়া সংগ্রহ করেন। তীর্থ কুণ্ডটী যে গৃহে অবস্থিত, সেই গৃহের কোনদিক হইতে আলো প্রবেশের পথ না থাকাতে ইহা অন্ধকারময় অবস্থায় বিরাজ করিতেছে, এখানে তিল তর্পণ করিবার নিয়ম আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখানে কেবল বাসিকুণ্ড ও লবণাক্ষ কুণ্ড ব্যতীত অপর অপর যতগুলি জলাশয় দেখিতে পাইলাম, তাহাদের মধ্যে সকলগুলিরই জল আস্বাদে মিষ্ট। কুণ্ড গৃহটীর বহির্ভাগে কয়েকটী দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। এই তীর্থেরও পাণ্ডা বা পুরোহিত স্বতন্ত্র। তাঁহাদিগকে সাধ্যমত কিছু দক্ষিণা প্রদানসহকারে এখানকার তীর্থ নিয়মগুলি পালন করিতে হয়। এইরূপে লবণাক্ষকুণ্ডের দর্শন ও স্পর্শন করিয়া এখান হইতে সূর্য্য-কুণ্ডের মাহাত্ম্য দর্শন করিতে যাত্রা করিলাম।

সূর্য্যকুণ্ড

লবণাক্ষকুণ্ডের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব-পশ্চিমে সূর্য্যকুণ্ড নামক তীর্থটী বিরাজমান। এই কুণ্ডের জল সর্ব্বদাই উষ্ণভাব অনুভব হয়। এখান-কারও পাণ্ডা বা পুরোহিত স্বতন্ত্র। তাঁহাদের সাহায্যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে তীর্থবারি আপন মস্তকে সিঞ্চন করিয়া এখানকার নিয়মগুলি পালন করিলাম, তৎপরে এই স্থান হইতে

সহস্রধারা নামক তীর্থ স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু উপ
রোক্ত তীর্থ কয়েকটীর সেবা ও দর্শন করিতে বেলা অত্যন্ত অধি
হইয়াছিল, সুতরাং সীতাকুণ্ডের পাণ্ডার লোক যিনি আমাদিগের সঙ্গে
ছিলেন, তাঁহার উপদেশ মত সেই গ্রামে তাঁহারই পরিচিত এক ব্যক্তি
বাটীতে সদলবলে সেদিনকার মত বিশ্রাম সুখ অনুভব করিয়া প
দিবস যথাসময়ে সহস্রধারার মাহাত্ম্য দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলাম

সহস্রধারা তীর্থ

সূর্য্যকুণ্ড হইতে "সহস্রধারা" নামক তীর্থ স্থানটী অন্যূন অর্দ্ধ মাই দূরে অবস্থিত। এই অর্দ্ধ মাইল পথ দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থল দিয়া গমন করিতে হয়। সহস্রধারাও এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! প্রায় দুই শত হস্ত উচ্চ এক গিরিশৃঙ্গ হইতে অবিরত ঝরণার জল প্রচণ্ড বেগে নিঃসৃত হইয়া পর্ব্বতের নানা স্থানে উচ্চ শিলাখণ্ডে বাধা প্রাপ্ত হইয়া সহস্রধারে ইহার জল ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইতেছে; এই কারণে ইহার নাম সহস্র-ধারা হইয়াছে। সহস্রধারার দৃশ্য অতিশয় মনোমুগ্ধকর! কবির কল্পনা-তীত! লেখনীর দ্বারা ইহার সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করা অসাধ্য। কত পরি-শ্রান্ত যাত্রী মনের সুখে এখানে এই সহস্রধারার পদপ্রান্তে প্রশস্ত প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া ইহার নির্ম্মল জলে স্নানপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইতে-ছেন এবং প্রাণ ভরিয়া লীলাময়ের অপূর্ব্ব সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার নানা প্রকার সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া তাঁহারই প্রশংসা করিতেছেন, তৎসঙ্গে আপন আপন শারীরিক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় সার্থক বিবেচনা করিতেছেন। বলাবাহুল্য, আমরাও এ বিষয়ে কোনটীই বাদ দিই নাই। স্থানীয় পাণ্ডার নিকট উপদেশ পাইলাম, এই সহস্রধারার জল

।।সলিলা মন্দাকিনী নদীর সহিত সংযুক্ত আছে। এই নিমিত্ত সহস্র-
রার তীরে বসিয়া যথানিয়মে মন্দাকিনীর উদ্দেশে সঙ্কল্প ও তর্পণ কার্য্য
পন্ন করিতে হয়। তীর্থ স্থানের সন্নিকটেই যাত্রীদিগের বিশ্রামের
ন্য একখানি করোগেট টীনের ছাদযুক্ত গৃহ আছে, আবশ্যক মত
রুগণ তথায় বিশ্রাম করিয়া থাকেন। এইরূপে এখানকার নিয়মগুলি
লনপূর্ব্বক ব্রহ্মকুণ্ড নামক তীর্থে যাত্রা করিলাম।

ব্রহ্মকুণ্ড তীর্থ

সহস্রধারার সন্নিকটে এক অত্যুচ্চ পাহাড়ের উপরিভাগে জঙ্গলাবৃত
স্থানে ব্রহ্মকুণ্ডটী অজ্ঞাতভাবে বিরাজিত। এখানে পুরোহিতের সাহায্যে
মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিতে হয় এবং ভক্তিসহকারে ইহার পবিত্র
বারি মস্তকে সিঞ্চন করিতে হয়। ব্রহ্মকুণ্ডে উল্লেখযোগ্য এমন কোন
কিছু মাহাত্ম্য দর্শন পাইলাম না, তবে ইহার জল ঈষৎ উষ্ণ ও লবণাক্ত
মাত্র, আরও এই কুণ্ড মধ্যে সদাসর্ব্বদা এক প্রকার বুদ্‌বুদ্‌ উঠিতেছে,
ইহাই ইহার মাহাত্ম্য দর্শন করিলাম।

গুরুধুনী তীর্থ

ব্রহ্মকুণ্ড হইতে এই গিরিশৃঙ্গের পাদমূলে উপস্থিত হইবামাত্র পাণ্ডা
ঠাকুর ইহার নিম্নভাগের এক স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, ইহাই
"গুরুধুনী তীর্থ"। গুরুধুনীর মাহাত্ম্য অদ্ভুত! এখানে দৃষ্টিপাত করিলে
কেবল পাহাড় গাত্র হইতে অগ্নিশিখা দেখিতে পাওয়া যায়; ঐ অগ্নি-
শিখাই গুরুধুনী নামে প্রসিদ্ধ। এই তীর্থে অগ্নি স্পর্শ ও প্রণাম ভিন্ন

অপর কোন কার্য্য নাই। সীতাকুণ্ড হইতে বহির্গত হইয়া এথানে যে সকল তীর্থ স্থানের অলৌকিক দৃশ্য সকল নয়নগোচর হইল, উহা এক মুখে কত প্রকাশ করিব, এক হস্তে লিখিয়া কত বর্ণনা করিব। ফল কথা, এখানে যে সকল অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য এবং সৌন্দর্য্য দর্শন করিলাম, উহাতেই অর্থ ব্যয় এবং পরিশ্রমের সার্থক বিবেচনা করিতে লাগিলাম। উপরোক্ত তীর্থ স্থানগুলি দর্শন ও স্পর্শনসহকারে সেদিনকার মত বিশ্রাম করিতে মনস্থ করিলাম, কারণ এই অপরিচিত স্থানে ক্রমাগত দুই দিবস অনিদ্রা ও অনিয়মে আহার এবং সমুন্নত পাহাড়ে আরোহণ ও অবতরণ করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম।

৺চন্দ্রনাথদেব দর্শন যাত্রা

পর দিবস প্রত্যুষে ভগবান চন্দ্রনাথদেবজীউর পবিত্র নাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক পাণ্ডার সহিত বাসাবাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যথাসময়ে সদল-বলে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের পাদমূলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। স্থানীয় পূজারী ঠাকুরের নিকট উপদেশ পাইলাম, এই অত্যুচ্চ বিস্তৃত গিরি মধ্যে অনেকগুলি তীর্থ বিরাজিত। যথা—১। উনকোটী শিবের বাটী, ২। ৺বিরূপাক্ষদেবের দেবালয়, ৩। পাতালপুরী, ৪। ভগবান চন্দ্রনাথদেবজীউর দেবালয়। বলাবাহুল্য, স্বয়ং স্বয়ম্ভুনাথও এই প্রশস্ত পাহাড়ের এক স্থানে বিরাজমান থাকিয়া ভক্তদিগকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন।

৺চন্দ্রনাথ হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন পবিত্র তীর্থ স্থান। এথানে বিষ্ণুচক্র বিচ্ছিন্ন সতীর দক্ষিণ হস্তের অর্দ্ধাংশ পতিত হওয়ায় করুণাময়ী জগজ্জননী দেবীভবানী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া জগৎপাতা ভগবান চন্দ্র-

খরের সহিত মিলিতা হওয়াতে এই স্থানটী অধিকতর পুণ্য তীর্থ-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ভগবান চন্দ্রশেখরের দেবালয় এক অত্যুচ্চ পর্ব্বতের শিখরদেশে প্রতিষ্ঠিত। যে পর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গে তিনি অবস্থান করিতেছেন, এই দেবের নামানুসারে ঐ পর্ব্বতটী চন্দ্রনাথ পাহাড় নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহা সমতলভূমি হইতে প্রায় ১১৫ ফিট উচ্চে আপন শৃঙ্গোপরি ভগবানকে স্থাপিত করিয়া গর্ব্বভরে তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিতেছে।

এই অত্যুচ্চ পর্ব্বতের পাদমূলে পৌঁছিয়া একবার ইহার শিখরদেশে দৃষ্টিপাত করিয়াই মহা ভাবনায় পড়িলাম, কারণ আমাদের দলমধ্যে যে সকল অসমর্থ স্ত্রী পুত্রগণ আছে, তাহাদিগকে লইয়া এই অত্যুচ্চ গিরি-শৃঙ্গে কিরূপে আরোহণপূর্ব্বক ভগবান চন্দ্রশেখরজীউর শ্রীচরণ দর্শন লাভে মহাব্রত উদ্যাপন করিব? যে দেবের দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া কত অর্থ ব্যয় ও কত কষ্ট সহ্য করিয়া এখানে সকলে কত উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে উপস্থিত হইলাম, আপনার সেই ভক্তবৃন্দকে কোন অপরাধে দর্শনদানে বঞ্চিত করিবেন প্রভু? এইরূপ চিন্তা করিতেছি এবং এক মনে এক প্রাণে তাঁহারই শ্রীচরণ ধ্যান করিতেছি, এমন সময় দেখি-লাম, সেই স্থানে কতকগুলি অল্প বয়স্ক ভিক্ষাজীবি দূর হইতে যাত্রী-সমাগম দেখিয়া কিছু লাভের প্রত্যাশায় অকুতোভয়ে আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে "জয় করুণয় ভগবান স্বয়ম্ভুনাথ কী জয়"। "জয় ভূতনাথ ভগবান কী জয়", প্রেমভরে এইরূপ কত প্রকার জয়ধ্বনি উচ্চারণসহকারে ঐ সোপানহীন গিরিগাত্র অবলম্বনে উচ্চে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল। বাস্তবিক তাহাদের সেই নির্ভীকতা ও উৎ-সাহপূর্ণ জয়ধ্বনিতে আমাদের সকলকার হৃদয়ে যেন ভরসা জন্মাইয়া দিল। বোধ হয়, করুণাময় চন্দ্রনাথজীউ আমাদিগকে চিন্তিত দেখিয়া

তাঁহার ভক্তগণের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্যই কৃপাপূর্ব্বক এই সময় এইরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে এখানে পাঠাইয়া আমাদের হৃদয়ে বল ও ভরসা প্রদানের নিমিত্ত পাঠাইয়া থাকিবেন। এইরূপে তাহাদের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া ভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ করিতে করিতে আমরাও তখন পাণ্ডা ঠাকুরকে অগ্রগামী করিয়া গিরিগাত্র বহিয়া ধীরে ধীরে উপরে আরোহণ করিতে লাগিলাম। ক্রমাগত আরোহণও নহে, অনেক স্থান আরোহণপূর্ব্বক পুনরায় অবরোহণ করিয়া আবার উচ্চে উঠিতে হয়। এইরূপে আরোহণ ও অবরোহণসহকারে যথায় উনকোটী শিবের বাটী আছে, সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম, এই উনকোটী শিবের বাটী যাইতে রাস্তার দুই-এক স্থান বড়ই দুর্গম। ইহার এক স্থানে একটী বৃক্ষের পার্শ্ব দিয়া অতি সঙ্কীর্ণ রাস্তা, নিম্নে গভীর গহ্বর, সেই বৃক্ষটী অবলম্বন করিয়া অতি সন্তর্পণে যাইতে হয়; আবার ইহার এক স্থানের পথ এত ঢালু যে বিশেষ সাবধানে না নামিতে পারিলে, উপর হইতে নীচে পতিত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই স্থানের দুই ধারেই নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, তাহার মধ্য দিয়া প্রশস্ত রাস্তা ঘুরিয়া-ফিরিয়া উঠিয়া নামিয়া চলিয়াছে, অনেক স্থলে এই সঙ্কীর্ণ পথে ঝরণার জল বহিয়া যাইতেছে, কি ভয়ানক দুর্গম পথ এই স্থানটী একবার মনে হইলে অদ্যাপি প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

উনকোটী শিবের বাটী

যে স্থানে উনকোটী শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন, তথায় সূর্য্য-কিরণ ভালরূপ প্রবেশ করিতে পায় না। এখানে শৈলগাত্রে একটী গুহা আছে, ঐ গুহার মধ্যে দুই-তিন হাত উর্দ্ধে অর্থাৎ হস্ত দ্বারা যাহা স্পর্শ করা যায়, এমন স্থানে কোটকের ছাদ হইতে অনেকানেক ছোট

ছোট স্বভাবতঃ গাভীর বাটের মত ও অপেক্ষাকৃত লম্বা আকারের শিব-লিঙ্গগুলি দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলাম, এগুলির অবস্থা দর্শন করিয়া মনুষ্য হস্ত দ্বারা খোদিত বলিয়া বোধ হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সমস্ত লিঙ্গের উপরে ও পার্শ্বে ঝরণার জল অবিরত ঝরিতেছে; দেখিলেই বোধ হয়, প্রকৃতিদেবী মনের সুখে যেন কেবল ঝরণার জলে লিঙ্গগুলির দুইদিকে পূজা করিতেছেন। এখানে কোন পাণ্ডা থাকেন না, এবং কখন যে ইঁহাদের পূজা হয়, অবস্থা দেখিয়া এরূপ মনেও হয় না; সুতরাং যাত্রীদিগের এখানে কোনরূপ পূজার ব্যবস্থা নাই। ভক্তিসহকারে দেবতাদিগের দর্শন, স্পর্শন ও প্রণামমাত্র করিয়া আসিতে হয়। পাঠকবর্গের চিত্তরঞ্জনের জন্য এখানে উনকোটী শিবের একটী ও ৺বিরূপাক্ষদেবের দেবালয়ের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল। মন্দিরটী চন্দ্রনাথ পাহাড়ের এক শৃঙ্গে এই জেলার অন্তর্গত শাকপুরা গ্রামের জমীদার স্বর্গীয় জাহ্নলাল নামে এক লালা নির্ম্মাণ করিয়া আপন কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

৺বিরূপাক্ষদেব

উনকোটী শিবের দর্শন করিয়া পুনরায় যে স্থানটী সঙ্কীর্ণ ও যথা হইতে ঝরণার জল নিঃসৃত হইতেছে, ঐ রাস্তায় কতক দূর ফিরিয়া আসিয়া এই পর্ব্বতেরই এক পথ দিয়া উপরে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম; এইরূপে কিয়দ্দূর উপরে উঠিয়া গিরিরাজের এক শৃঙ্গে বিরূপাক্ষ মন্দিরে ৺বিরূপাক্ষ মহাদেবের দর্শন পাইলাম। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের দুইটী শৃঙ্গ আছে। এক শৃঙ্গে ৺বিরূপাক্ষ মহাদেব, অপর শৃঙ্গ যাহা সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, তথায় ভগবান চন্দ্রনাথ-জীউর দর্শন লাভ হয়।

৺চন্দ্রনাথ ও বিরূপাক্ষদেব উভয়ই প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ। এখ বিরূপাক্ষদেবের পূজার কোন বিশেষ ধূমধাম নাই। সামান্যভ দেবতার নিত্য পূজা হইয়া থাকে, ভোগরাগেরও কোনরূপ জমব ব্যবস্থা দেখিতে পাইলাম না। প্রত্যহ যথানিয়মে একবার এখানে এ জন পুরোহিত আসিয়া ৺বিরূপাক্ষ মহাদেবের পূজা করিয়া থাকে সে যাহা হউক, যে দেবের দর্শনের জন্য আপন আপন প্রাণ তুচ্ছ ে করিয়া এখানে আসিয়াছিলাম, এক্ষণে মন্দিরাভ্যন্তরে সেই ভগবা বিরূপাক্ষদেবের কৃপায় নির্বিঘ্নে তাঁহার দর্শন করিয়া নয়ন ও জীব সার্থক করিয়া আপন আপন ব্রত উদ্যাপন করিলাম। এই মন্দি স্থানটী মানব কোলাহলশূন্য ও নির্জ্জন। মন্দির সম্মুখেই পার্ব্বতীয় বাঁ ও বেত্র-বন দেখিতে পাওয়া যায়।

৺বিরূপাক্ষদেবের মন্দিরের আরও কিঞ্চিৎ উপরিভাগে আরোহ করিবার সময় দেখিতে পাইলাম যে, এই পাহাড় হইতে এক স্থানে একখানি শিলা খণ্ড স্বাভাবিকভাবে ভগবানের আদেশে পতিত থাকিয় ভক্তগণকে ৺চন্দ্রনাথদেবজীউর দর্শনের সুবিধার জন্য এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গে যাইবার নিমিত্ত সেতুর ন্যায় কার্য্য করিতেছে। এই অপ্রশস্ত শিলাখণ্ডখানি এরূপ ভয়াবহ অবস্থায় পাহাড়ের উচ্চ গাত্রে সংযুক্ত আছে যে, যদি দৈবাৎ কাহারও পদস্খলন হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহাকে হয়, ৺চন্দ্রনাথ না হয়, ৺বিরূপাক্ষদেবের পদপ্রান্তে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে। স্থানীয় পাণ্ডার নিকট অবগত হইলাম এই দেবতার এমনি মাহাত্ম্য যে পুরাকাল হইতে এ পর্য্যন্ত কত যাত্রী ইহার উপর দিয়া গমনাগমন করিতেছেন বা করিয়াছেন, কিন্তু কখনও কাহার বিপদ ঘটিয়াছে এরূপ সংবাদ আমাদের নিকট আসে নাই। সে যাহা হউক, এই সেতুর নিকট আমরা সদলবলে কিয়ৎকাল বিশ্রাম

করিবার সময় কত ভিখারী আমাদের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। বলাবাহুল্য, আমরাও সাধ্যমতে যৎকিঞ্চিৎ দানে সন্তুষ্ট করিয়া তাহাদিগকে অগ্রগামী হইতে অনুরোধ করিলাম এবং তৎপশ্চাদ্ভাগে উহাদের দেখাদেখি আমরাও "জয় ভগবান চন্দ্রনাথ স্বামী কী জয়"। এইরূপ পূর্ব্ব কথিত জয়ধ্বনি করিতে করিতে ৺চন্দ্রনাথদেবজীউর দর্শনের জন্য পুনর্ব্বার গিরিগাত্র উপরে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এ পথেও কোনরূপ বাঁধা সোপান নাই, সুতরাং উচু নীচু প্রস্তরখণ্ড অবলম্বন করিয়া কোন স্থানে বা বৃক্ষমূল আশ্রয়পূর্ব্বক উঠিতে লাগিলাম, পথটী ঢালু ও অপ্রশস্ত—ইহাতে অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, এই সকল স্থান অত্যন্ত দুর্গম। আমি কিন্তু বাস্তবিক সেরূপ কষ্ট অনুভব করি নাই, বরং বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া আরোহণ করা সোপান অপেক্ষা সুবিধাজনক মনে করিলাম। প্রমাণস্বরূপ দেখুন, এই পথে স্ত্রীলোক ও ছোট বালক বালিকাগণ পর্য্যন্ত অনায়াসে নির্ব্বিঘ্নে উঠিয়াছিল।

যে স্থানটী ঢালু, সেই স্থানের নীচের দিকে যাইবার জন্য একটী পথ দেখাইয়া পাণ্ডা ঠাকুর বলিলেন, যদ্যপি আপনারা পাতালপুরী দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই পথ দিয়া প্রথমে পাতালপুরীতে হরগৌরীর যোনি-পীঠ দর্শন করিয়া তৎপরে ভগবান চন্দ্রনাথ মহাদেবজীউর দর্শন করিবেন, কারণ পাতালপুরী হইতে এমন কোন পথ নাই, যদ্দ্বারা আপনারা বাহিরে বহির্গত হইতে পারিবেন, সুতরাং পাণ্ডার উপদেশ মত ঐ পথ দিয়া ভিখারীদিগকে সঙ্গে লইয়া এতক্ষণ সময়ে যত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলাম, পুনরায় তত দূর নামিয়া পাতালপুরীতে পৌঁছিলাম। ভিখারীদিগকে সঙ্গে লইবার কারণ আর কিছুই ছিল না, কেবল দলপুষ্টি করা মাত্র; কেন না যদি কোন হিংস্রক জন্তু এই

পাতালপুরীতে অবস্থান করে, লোক অধিক থাকিলে প্রাণভয়ে তাহাকে পলাইতে হইবে। বলাবাহুল্য, এই চন্দ্রনাথ পাহাড়ের পাতালপুরী হইতে পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গ পর্য্যন্ত গুহার মধ্যে যে কত সাধু সন্ন্যাসীর বাস স্থান আছে—উহা বর্ণনাতীত। অধিকাংশ সন্ন্যাসীরা আপন আপন ধুনী প্রজ্জ্বলিত করিয়া শিষ্য সমভিব্যাহারে গঞ্জিকায় দম দিয়া চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণপূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে "জয় শঙ্কর চন্দ্রনাথ স্বামী কী জয়" শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভগবানের মহিমা প্রকাশ করিতেছেন। এই সকল সাধু সন্ন্যাসীদিগকে দর্শন করিলে ভক্তির উদয় হয়।

পাতালপুরী

পূর্ব্বোক্ত এই ঢালু পথ দিয়া পাণ্ডা ঠাকুর ও ভিখারীদিগকে অগ্রগামী করিয়া অতি কষ্টে যথা স্থানে উপস্থিত হইলাম। এখানে স্ত্রীলোকদিগের তীর্থ দর্শনের সহিষ্ণুতা দেখিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম; কারণ আমরা পুরুষ হইয়া এই অত্যুচ্চ পাহাড়ে উঠিতে বা নামিতে যে কিরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, উহা আমরাই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এই নিমিত্ত আমি একবার ব্যঙ্গছলে আমাদের দলস্থ স্ত্রীলোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এবার এই পাতালপুরীতে হরগৌরীর দর্শন করিয়াই আমরা স্বদেশ যাত্রা করিব, কারণ এইরূপ কষ্টকর তীর্থ স্থান দর্শন আর সহ্য করিতে পারি না।" তাহারা যে ক্লান্ত না হইয়াছিলেন, এরূপ ত আমার মনে হয় না, তথাপি পূজনীয় মাতা ঠাকুরাণীর নিকট হইতে যেরূপ উপদেশ পাইলাম, উহাতেই আমার চৈতন্যলাভ হইল। তিনি উত্তর দিলেন যে, যখন একে একে এখানকার প্রায় সমস্ত তীর্থ স্থানগুলি দর্শন করিয়াছি, তখন অবশিষ্ট যে

অধীন গ্রন্থকার।

তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী।

দ্বারকাপুরী

(দ্বিতীয়বারের ভ্রমণ)

গুজরাট প্রদেশে কচ্ছ সাগরোপকণ্ঠে দ্বারকা অবস্থিত। কলিকাতা হইতে দ্বারকা যাইতে হইলে, প্রথমে হাওড়া ষ্টেশন হইতে বোম্বে, তৎপরে স্টীমারযোগে সমুদ্রের উপর ভাসিতে ভাসিতে অনায়াসে তীর্থ তীরে পৌছিতে পারা যায়, কিন্তু যাঁহারা প্রথমে কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিমে তীর্থ সকল দর্শন করিয়া হরিদ্বারে যাইবেন, অথবা দাক্ষিণাত্যে শ্রীশ্রীরামেশ্বরজীউর দর্শনে যাত্রা করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে এই দুই স্থান হইতেই বোম্বে যাইলে সকল বিষয়ে সুবিধা হইবে।

বোম্বে নগর

বোম্বে—সাগরের উপর অবস্থিত, এই নিমিত্ত এই স্থানটী অতিশয় স্বাস্থ্যকর। ষ্টেশনের অনতিদূরে নগরটী গর্ব্বভরে আপন মস্তক উন্নত করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্য বিরাজ করিতেছে; ইহার চতুর্দ্দিকই সাগরে বেষ্টিত। বোম্বে কলিকাতার ন্যায় সমৃদ্ধশালী ও রাজধানী, ইহার শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। এই নগরটী কলিকাতা অপেক্ষা আয়তনে অনেক ছোট হইলেও ইহার রাস্তাগুলি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন এবং বসতিপূর্ণ। কলের জল, গ্যাস, ট্রাম গাড়ী, ঘোড়ার

চৌতল অট্টালিকাগুলি বর্ত্তমান থাকায়, ইহা এক অপূর্ব্ব শোভ
শোভিত হইয়া আপন সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে। প্রত্যেক
রাস্তার উপর ট্রাম চলিতেছে। এই সকল রাস্তার দুই ধারে না
প্রকার বিবিধ ধরণের দোকানগুলি সজ্জিত থাকাতে ইহার শোভা আর
বৃদ্ধি হইয়াছে। সহরের মধ্যে কোথাও কোনরূপ আহারীয় সামগ্র
অভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন বিদেশী লোক সহসা এখা
উপস্থিত হইলে, মাদ্রাজের ন্যায় বাটী ভাড়া করিতে পারিবেন না; কা
এ প্রথা এখানে নাই। বিদেশী যাত্রীদিগের বসবাসের জন্য স্থানে স্থ
বিস্তর ধর্ম্মশালা আছে, তন্মধ্যে পুণ্যাত্মা ভাটিয়ারার ধর্ম্মশালাই প্র
কারণ এখানে বাস করিবার সময় গৃহস্বামীর সুব্যবস্থার গুণে কাহাকে
কোনরূপ কষ্টভোগ করিতে হয় না। ব্যবসা উপলক্ষে এখানে অ
বাঙ্গালী গৃহস্থ, বিশেষতঃ বিস্তর ঢাকাই কর্ম্মকারদিগকে স্ত্রী-পুত্র ল
বসবাস করিতে দেখিতে পাইলাম।

যাঁহারা স্বাধীনভাবে এখানে আসিবেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে হো
বাস করিতে পারেন। হোটেলের বন্দোবস্ত অতি সুন্দর, f
পরিবারবর্গ লইয়া তথায় থাকা সকল বিষয়েই অসুবিধা। বোম্বেতে
গুলি হোটেল আছে, তন্মধ্যে হিন্দু ও কাশ্মিরী এই দুইটী হোটেলই বিখ্যা
পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত বোম্বে সহরের প্রধান রাস্তার একটি
প্রদত্ত হইল।

কোন বিদেশী বিশেষতঃ কোন ধনী ব্যক্তি বোম্বে সহরে পদার্পণ ক
হোটেলে স্থান দিবার নিমিত্ত বিস্তর দালাল অনুরোধ করিতে থা
আমরা তীর্থ যাত্রী, স্ত্রীপুত্র সঙ্গে ছিল, সুতরাং আমরা ধর্ম্মশালা
অবস্থান করিয়াছিলাম। বোম্বে সহরের স্ত্রীস্বাধীনতা অত্যন্ত প্র
অর্থাৎ অবরোধ প্রথা এখানে নাই। স্থানীয় স্ত্রীলোকদিগের স্বাধী

বোম্বে সহরের প্রধান রাস্তার দৃশ্য।

[২ পৃষ্ঠা।

এখানে ইংরাজ রাজের সুশাসন গুণে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, গুজরাটি, মারহাট্টী ও ভাটিয়া ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোক একত্রে অবাধে বসবাস করিয়া সুখ সচ্ছন্দে দিন যাপন করিতেছেন। প্রত্যহ অপরাহ্নকালে যখন এই সকল সম্প্রদায়ের স্ত্রী-পুরুষগণ আনন্দে বিভোর হইয়া, একত্রে সাগর তীরে শীতল স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিবার জন্য বিচরণ করিতে উপস্থিত হন, তখন সেই ললনাদিগের স্বাধীন ভাবে বিচরণ অবলোকন করিলে আত্মহারা হইবেন। দুই এক দিনের জন্য এই সহরে উপস্থিত হইয়া সাধ্যমত অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার এবং সৃষ্টিকর্ত্তার ও ইংরাজ বাহাদুরদিগের কীর্ত্তিপূর্ণ দৃশ্য সন্দর্শন করিলে আশ্চর্য্য বোধ করিবেন সন্দেহ নাই।

বোম্বেতে উপস্থিত হইলে নিম্নলিখিত দ্রষ্টব্য স্থান গুলির শোভা দর্শন করিতে অবহেলা করিবেন না :—

১। লাটভবন, ২। বোম্বে ফোর্ট, ৩। আপল্লো বন্দর, ৪। হাইকোর্ট ৫। বোম্বাদেবীর দেবালয়, ৬। মহালছমীজীউর মন্দির, ৭। বাথালনাদ ৮। বোম্বাই পোতাশ্রয়। এই সমস্ত শোভা দর্শন করিয়া সহর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে এলিফাণ্টা গহ্বরের দৃশ্য কর্ত্তব্য বোধে দর্শন করিবেন। বোম্বাই নগরটী দেখিতে যেরূপ নয়নানন্দদায়ক, ইহার চারিদিকের দৃশ্যও তেমনি মনোহর। এই নগরটী অতি অনুকূল স্থানে স্থাপিত বলিয়া বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক অর্থাৎ সুগম, ফলে এমন বাণিজ্য বন্দর বা পোতাশ্রয়ের ন্যায় প্রাচ্যদেশ আর দ্বিতীয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বোম্বাই পূর্ব্বে দ্বীপ ছিল, এক্ষণে প্রায়দ্বীপে পরিণত হইয়াছে। ইহার উত্তর দিকে রেলওয়ে কোম্পানী পাকা বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া কূলের সহিত সংযুক্ত করাতে সাধারণের কত উপকার করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্বা নাই। সমুদ্রপথে বোম্বাইএর নিকটবর্ত্তী হইতে যে সকল দৃশ্য নয়নপথে পতিত হয়, উহা অতি মনোমুগ্ধকর, কিন্তু পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা নিকটে

থাকাতে নগরটী অধিক দূর বিস্তৃত বলিয়া অনুমান হয় না। তীরে সম্মুখেই বিশাল পোতাশ্রয়, তথায় ছোট ছোট দ্বীপে পরিপূর্ণ। এখানে দেশী জাহাজের সাদা পাইলগুলি দূর হইতে দেখিলে যেন এক একটী বকপক্ষী উড়িতেছে বলিয়া বোধ হয়, তদ্ব্যতীত বড় বড় জাহাজেরও গতি বিধি এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রের তীরেই ডক, মালগুদাম ও আড়াই ক্রোশ ব্যাপী একপ্রকার আল্‌থাবাঁধ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বোম্বাই দ্বীপটী সমতল, সাড়ে পাঁচ ক্রোশ দীর্ঘ এবং দেড় ক্রোশ প্রস্থ। ইহার দুই পার্শ্বে দুইটী অনুচ্চ গিরি দণ্ডায়মান থাকিয়া সহরের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে। এই দুইটী পাহাড়ের মধ্যে একটী অধিক দীর্ঘ, সেই দীর্ঘ গিরিরাজ সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইয়া কোলাবা-পয়েন্ট নামক স্থানে সংযুক্ত হইয়াছে। পশ্চিম দিকে সমুদ্র তরঙ্গের আক্রমণে এই কোলাবা পয়েন্ট হইতে পোতাশ্রয়ের রক্ষা হইয়া থাকে। অপরটী মলয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া শেষ হইয়াছে। এই দুই রেখার মধ্যেই "বাক্‌বে" পোতাশ্রয়েব উচ্চশিরে বোম্বে ফোর্ট প্রতিষ্ঠিত। এই স্থানের চারিদিকেই বসতি পূর্ণ নগর শোভা পাইতেছে। এই সকল নগরের এক দিকের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া এক্ষণে দুর্গের ভিতর সওদাগর দিগের কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বোম্বাই নগরে পশুদিগের নিমিত্ত একটী চিকিৎসালয়, জৈন সম্প্রদায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহা পিঞ্জরপোল নামে খ্যাত। এই পিঞ্জরপোলে স্থানীয় প্রাচীন গো, অশ্ব, মেষ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি এবং পক্ষীকূল পর্য্যন্ত শুশ্রূষা হইয়া থাকে।

বোম্বাই সহরে যে সমস্ত ধনবান ব্যক্তি বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের বিলাস-ভবন বা বাগানবাড়ী মালাবার পর্ব্বতের উপরি ভাগে নির্ম্মিত আছে, ঐ সকল সুসজ্জিত বিলাসভবনের সৌন্দর্য্য নয়নগোচর হইলে আত্মহারা হইতে হয়। এইস্থান হইতে নগর ও সমুদ্রের দৃশ্য অতি

নাহর। পাহাড়ের একপ্রান্তে লাটসাহেবের প্রাসাদ গর্ব্বভরে আপন শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। এই পাহাড়তলি এবং সমুদ্রতট আড়াই ক্রোশ অতিক্রম করিলে আপল্লো বন্দরে উপস্থিত হওয়া যায়।

বিলাতি ডাক ও গোরা সিপাইগণ বোম্বাই হইতে রওনা হয়, আবার বিলাত হইতে জাহাজের সাহায্যে ডাক ও গোরারা এইস্থানে আসিয়া অবতরণ করিয়া থাকেন। বোম্বাই নগরটী রেল দ্বারা প্রায় ভারতবর্ষের সকল অংশের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে; এই নিমিত্ত এই নগরে নানাজাতীয় বিবিধ প্রকার পরিচ্ছদধারী লোকদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

এলিফাণ্টা গহ্বর

সহর হইতে এই প্রাচীন গিরি গহ্বরের বিখ্যাত গুহার শোভা দর্শন করিবার ইচ্ছা করিলে, সাগরতট হইতে বোটের সাহায্যে প্রায় তিন ক্রোশ পথ যাইতে হয়। এই গহ্বরে হিন্দুরা পাহাড় কাটিয়া যে সকল কীর্ত্তি বা সুন্দর সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন উহা অতি অদ্ভুত, দর্শনে আত্মহারা হইতে হয়। এরূপ সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট মন্দির বোধ হয় ভারতবর্ষ মধ্যে অপর কোন স্থানে নাই। এখানকার প্রাচীন ঘাটের উপর পাথরের এক প্রকাণ্ড হস্তীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকায়, পর্ত্তুগিজেরা সেই হস্তীর নামানুসারে এই দ্বীপটী "এলিফাণ্ট কেপ" নামে প্রচার করেন।

এলিফাণ্ট কেপের পশ্চিমস্থ পাহাড় সমুদ্র হইতে ১২৪ হস্ত উচ্চ, এইস্থানেই সেই বিখ্যাত বৃহৎ গহ্বর শোভা বিস্তার করিয়া আছে। কথিত আছে, এক সুবৃহৎ অখণ্ড পাথর কাটিয়া এই গুহা প্রস্তুত হইয়াছে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে প্রবেশের দ্বার দৃষ্ট হয় কিন্তু প্রধান দ্বার উত্তর দিকে, সম্মুখে অনেক প্রশস্ত চাতাল—দ্বীপটী দুই প্রকাণ্ড সম্পূর্ণ ও দুইটী অর্দ্ধ

নির্ম্মিত স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। এখানে একটী উচ্চ ও স্থূল শৈলের নিম্নভাগে তিনটী পথ প্রসারিত হইয়াছে, ঐ সকল শৈল পথে নানাজাতীয় বনলতা থাকাতে এই পথের দৃশ্য অতি মনোহর দেখায়। মধ্যে তিনটী প্রকোষ্ঠ, তাহার মধ্যস্থলের প্রকোষ্ঠে প্রধান দেবালয় আর দুই পার্শ্বে দুইটী ছোট ছোট কক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রধান মন্দিরটী দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১৮৬ হস্ত, ২৬টী সম্পূর্ণ ও ১৬টী অর্দ্ধ নির্ম্মিত স্তম্ভের উপর স্থাপিত, এক্ষণে সেই ২৬টী সম্পূর্ণ স্তম্ভের মধ্যে ৮টী স্তম্ভ ভগ্ন প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক স্তম্ভগুলির উচ্চতা ১০ হইতে ১৩ হস্ত প্রমাণ হইবে।

মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র সম্মুখে ১৩ হস্ত উচ্চ ত্রিমূর্ত্তি, ইহার উভয় পার্শ্বে ৮ হাত উচ্চ দুই দ্বারবানের প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এই ত্রিমূর্ত্তির নিকটবর্ত্তী হইলে মন্দিরের বিগ্রহ মূর্ত্তিটীকে দক্ষিণ দিকে দর্শন পাওয়া যায়। এই স্থান হইতে ভিতরে যাইবার জন্য আবার চারিদিকে চারিটী দ্বার আছে, প্রতি দ্বারদেশে এক একটী প্রকাণ্ড দ্বারবান মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। মধ্যস্থলের প্রধান কক্ষটী সাদা, দীর্ঘে ও প্রস্থে কম বেশ ১৩ হাত চতুষ্কোণাকৃতি। ইহার মধ্যস্থলটী ৬ হাত প্রস্থ এবং উচ্চতায় দুই হস্ত এক বেদী নির্ম্মিত আছে, সেই বেদীর মধ্যস্থলে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। ত্রিমূর্ত্তির পূর্ব্বদিকস্থ কক্ষে ১২ হাত উচ্চ এক প্রকাণ্ড হর-পার্ব্বতী মূর্ত্তি দর্শন পাওয়া যায়। এ দেশে "হর-পার্ব্বতী মূর্ত্তি" অর্দ্ধনারী নামে [illegible]। ত্রিমূর্ত্তির পশ্চিমদিকস্থ কক্ষে হর ও পার্ব্বতীর দুইটী স্বতন্ত্র মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সকল প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে পুরাকালে এই মন্দির শৈবমতাবলম্বী হিন্দুদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এত দূরদেশে এই নির্জ্জন দ্বীপোপরি নিষ্ঠুর কালাপাহাড় আসিয়া দেবমূর্ত্তিদিগের অঙ্গহীন করিতে ক্রটি করে নাই। সে যাহা হউক, এইরূপে এলিফান্ট কেপের

ৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন কালে ইহার চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অবলোকন রিবার সময় এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় এবং লীলাময়ের অপূর্ব্ব স্থষ্টির ভা দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইলাম।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি

ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী অপ্রশস্ত দীর্ঘ ভূমিখণ্ড ও প্রায় সমগ্র সিন্ধুদেশ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত। ইহার পূর্ব্ব সীমানার মধ্য ভারতবর্ষীয় দেশীয় রাজগণের রাজ্যাবলি ও নিজাম এবং মহীশূর রাজ্য। এই প্রেসিডেন্সির ক্ষেত্র পরিমাণ অন্যূন ৬২০০০ হাজার ক্রোশ বিস্তৃত, সুতরাং ইহা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি অপেক্ষা কম। ইহার লোকসংখ্যা এক কোটি নব্বুই লক্ষ। বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে বিস্তর দেশীয় রাজগণের অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। ঐ সকল রাজ্যের ক্ষেত্র পরিমাণ ৩৭000 বর্গ ক্রোশ এবং লোক সংখ্যা কম বেশ ৭০০০০০০ লক্ষ।

পশ্চিমঘাট পর্ব্বত মধ্যবর্ত্তী হওয়াতে দাক্ষিণাত্যের সমভূমি হইতে একখণ্ড অপ্রশস্ত ভূমি পৃথক হইয়াছে। সরস্বতী, মাহী, নর্ম্মদা, তাপ্তী এই কয়টী নদী উত্তরাঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইয়া কাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে। পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী দেশে অত্যন্ত বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে. এই নিমিত্ত এখানে নানাপ্রকার শস্য ও কার্পাস প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই পশ্চিম ঘাটের উপকূলে অগণ্য নারিকেল বৃক্ষ থাকায়, প্রচুর পরিমাণে নারিকেল উৎপন্ন হয়। দাক্ষিণাঞ্চলে কর্ণাটকা মধ্যপ্রদেশে মহারাষ্ট্র ও কাম্বে উপসাগরের আশ পাশে গুজরাটি ভাষা প্রচলিত।

হিন্দু ধর্ম্ম এ দেশের প্রধান ধর্ম্ম। পাঁচজনের মধ্যে একজন মুসলমানকে দেখিতে পাওয়া যায়। জৈন, খ্রীষ্টীয়ান ও পারসি. অতি অল্প সংখ্যক

বোম্বেতে বাস করিয়া থাকেন। এই প্রেসিডেন্সিতে একজন গবর্ণর তাঁহার সাহায্যার্থ দুইটী ব্যবস্থাপক সভা আছে। ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায়, যে ১৫৩২ খৃঃ পর্ত্তুগীজেরা বোম্বাই নামক দ্বীপটী প্রথমে অধিকার করেন। ইংলণ্ডের দ্বিতীয় রাজা মাননীয় "চার্লিস." পর্ত্তুগালের এক রাজ কন্যাকে বিবাহ করাতে তাঁহারা যৌতুক স্বরূপ বোম্বাই দ্বীপটী ইংলণ্ডের রাজাকে দান করেন। তৎপরে তিনি ১৬১৮ খৃঃ বার্ষিক একশত টাকা রাজস্ব ধার্য্য করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে অর্পণ করেন। ইহার কিছু কাল পরে ১৭০৮ খৃঃ ইংরাজেরা এই দ্বীপে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রাজধানী স্থাপন করেন। ইতিহাসে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৭৭৫ খৃঃ মহারাষ্ট্র যুদ্ধের পর ১৭৮২ খৃঃ মধ্যে সালসেটীর মধ্যবর্ত্তী দ্বীপ হইতে টানা নামক দ্বীপ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হয়। ১৮১৮ খৃঃ পেশোয়ার চির-পতন হইলে সেই বোম্বাই দ্বীপ এক বৃহৎ রাজ্যাংশের রাজধানীতে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ বোম্বাই ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় নগর হইয়াছে। ইহার লোকসংখ্যা ৮২২০০০ হাজার, তন্মধ্যে ছয় লক্ষ হিন্দু, দুই লক্ষ মুসলমান ও পঞ্চাশ হাজার পারসি।

পুণা

পুণা—দাক্ষিণাত্যের সৈনিক রাজধানী। ইহা বোম্বাই সহর হইতে ৬০ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার গবর্ণর দলবলসহ বৎসরের মধ্যে কএক মাস পুণায় বাস করিয়া থাকেন। এই স্থান সমুদ্র হইতে ১২৩২ হাত উচ্চ এবং মুতা নদীর তীরে অবস্থিত। পুণায় তামা, পিত্তল, কাঁসা, লোহা মাটির সুন্দর সুন্দর খেলনা ও কাপড় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানকার লোক সংখ্যা কম বেশ ১৫৫০০০। বোম্বাই
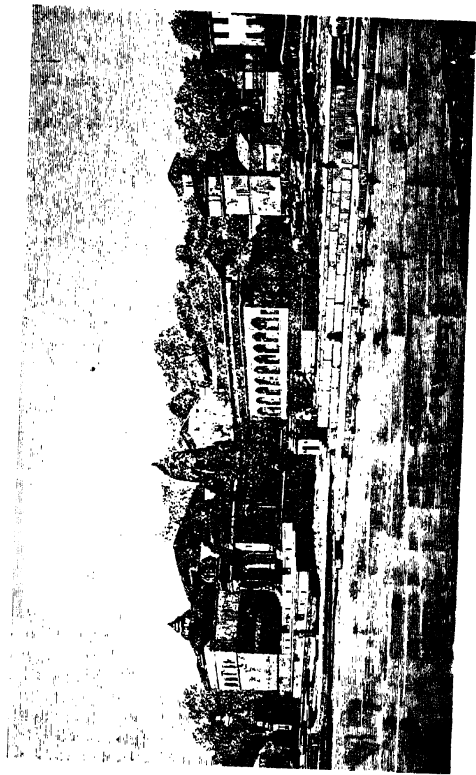
গোদাবরী তীরস্থ নাসিক সহরের পঞ্চবটী কুটীর ও অপরাপর ঘাট মন্দিরের দৃশ্য।

[৯ পৃষ্ঠা।

প্রেসিডেন্সীতে এইটী দ্বিতীয় নগর। পুণা ও বোম্বাই সহরে যে সমস্ত সুন্দর দ্রষ্টব্য স্থান আছে, উহা একে একে বর্ণনা করিলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রস্তুত হয়।

যাঁহারা বোম্বাই সহর হইতে শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র পঞ্চবটী কুটীরের শোভা দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা বোম্বে হইতে নাসিক নামক ষ্টেশনে যাত্রা করিবেন। এই পঞ্চবটী বন বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গোদাবরী নদীর উপরিভাগে অবস্থিত। প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসর অন্তর এখানে একটী মেলা হয়, ঐ মেলা পুষ্কর মেলা নামে খ্যাত। শ্রীরামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত পঞ্চবটী কুটীরের সন্নিকটস্থ একস্থানে শ্রীলক্ষ্মণদেব দশানন ভগ্নী শূর্পণখার কুৎসিত ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার নাসিকা ছেদন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত এই স্থানটী নাসিকা নামে খ্যাত হইয়াছে। নাসিক রোড নামক ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল পথ ট্রামে যাইলে নাসিক সহরে পৌছান যায়। এই সহর হইতে পূর্ব্ব দক্ষিণাভিমুখে পঞ্চবটীস্থ শ্রীরামচন্দ্রের পর্ণশালা বিরাজিত। স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। এখানে গোদাবরী তীরস্থ নাসিকের মন্দিরের অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়নগোচর হইলে আত্মহারা হইতে হয়। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত সেই মনোমুগ্ধকর গোদাবরী তীরস্থ মন্দিরের একটী চিত্র প্রদত্ত হইল।

বোম্বে সহর হইতে দ্বারকাপুরীর অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলে, প্রাতে বোম্বে ডক হইতে মিঃ সেফার্ড কোম্পানীর ষ্টীমারে দুই টাকা দিয়া টিকিট খরিদ করিতে হয় এবং সন্ধ্যাকালে নির্ব্বিঘ্নে কচ্ছ-সাগরোপকণ্ঠে দ্বারকায় পৌছিবেন। ইংরাজ রাজার কৃপায় এক্ষণে সকল তীর্থেই অল্প ব্যয়ে অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে যে স্থানে দস্যু, তস্করাদির ভয়ে কেহ যাত্রা করিতে সাহস করিতেন না, এক্ষণে ইংরাজরাজের সুশাসনগুণে সেইস্থানে নির্ভয়ে সকলে অক্লেশে অবাধে যাতায়াত করিয়া তীর্থ দর্শন পূর্ব্বক জীবন ও নয়ন সার্থক করিতেছেন।

কচ্ছ দেশ

কচ্ছদেশ একটী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি প্রায়-দ্বীপ। সিন্ধু দেশের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ইহা অবস্থিত। এই স্থানটী বৃহৎ "রণ" নামক অগভীর লোনা-হ্রদের দ্বারা সিন্ধুদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কচ্ছ দেশ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। দেশটী প্রায়ই শস্য শূন্য। ইহার পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে কেবল পর্ব্বত মালায় সজ্জীকৃত। এদেশে ঘোড়া ও বন্য গর্দ্দভ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার অধিবাসীরা রাজাকে রাও বলে। তাঁহার অধীনে অন্যূন দুইশত জমিদার আছেন। দেশের মধ্যস্থলে ভোজনগরই ইহার রাজধানী। ১৮১৯ খৃঃ এখানে ভূমিকম্প হওয়াতে, এই দেশটী প্রায় ধ্বংস হইয়াছিল ; এমন কি সেই প্রলয়কর সময় স্থানীয় ভূমিখণ্ড ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহ জলে ডুবিয়া একটী প্রকাণ্ড বালির বাঁধে পরিণত হইয়া যায়। সাধারণে ঐ বাঁধকে বিধাতার বাঁধ বলিয়া থাকেন। তৎপরে স্থানীয় রাজার অনুগ্রহে সেই বালির বাঁধ এক্ষণে নূতন কলেবরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অরণ্য শব্দ হইতে লবণ হ্রদের নাম "রণ" হইয়াছে, অর্থাৎ একটী বালুকাময় অগভীর ঝিল। ইহার দক্ষিণ পশ্চিমস্থান মরশুমকালে জলপূর্ণ হয়, অন্য সময়ে কেবল লবণময়। লবণ হ্রদের মধ্যে কয়েকটী দ্বীপ আছে, তাহাতে কেবল বন্য গর্দ্দভ ও নানাজাতীয় অদ্ভুত কীট পতঙ্গের গতিবিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। কচ্ছদেশের পূর্ব্ব সীমানায়ও ঐরূপ একটী "রণ" আছে।

কচ্ছদেশে কয়েকটী বিখ্যাত স্থান আছে, যথা—উত্তর পশ্চিম কোণে দ্বারকাপুরী, দক্ষিণ উপকূলে সোমনাথ। কথিত আছে, এই স্থানের নিকট-বর্ত্তী কোন একস্থানে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধ কর্ত্তৃক হত হন। সোমনাথের উত্তরদিকে কেবল জঙ্গল ও পর্ব্বতময় এক প্রদেশ আছে, উহা গির নামে প্রসিদ্ধ। গির নামক স্থানে যে পর্ব্বত আছে, তাহার পাদদেশে মহারাজ অশোকের রাজত্ব

দ্বারকার মন্দির পথের দৃশ্য। [১০ পৃঃ।

লের কতকগুলি প্রস্তর লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। সেই পর্ব্বতের প্রায় তার নিকট কতকগুলি সুন্দর সুশ্রী জৈন মন্দির দণ্ডায়মান থাকিয়া অতীত ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এইস্থানের পশ্চিমদিকে সুবিখ্যাত শত্রুঞ্জয় পর্ব্বত গর্ব্বভরে আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। এই শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতের শিখরদেশেও অনেক জৈন দেবালয় দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং দ্বারকাপুরী দর্শনের ফেরত যাত্রীরা এই সকল প্রাচীন দেবালয়ের শোভা দেখিয়া চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। এই শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতের সন্নিকটে পালিতানা নগর শোভা পাইতেছে।

পালিতানা নগরের পশ্চাদ্ভাগে কচ্ছদেশের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে কাথিবার দ্বীপ মস্তক উন্নত করিয়া বিরাজমান। এই কাথিবার ১৮৮টী ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত; তন্মধ্যে ৯৬টী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ও ৭০টী বরোদার গুইকুমারের, অবশিষ্ট গুলি নিষ্কর। রাজবংশীয় বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য এখানে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, উক্ত বিদ্যালয়টী "রাজকুমার" কলেজ নামে খ্যাত। এ প্রদেশে যতগুলি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য আছে, তাহার মধ্যে ভবনগরই সর্ব্বপ্রধান। ভারতবর্ষীয় রাজগণের মধ্যে এই ভবনগরের রাজাই প্রথমে নিজ রাজ্য মধ্যে রেলপথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং আপন রাজ্য দক্ষতার সহিত শাসন করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। এখন যাত্রীরা সুবিধামত এই স্থান হইতে জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক, পূর্ব্ব উপকূল দিয়া সচ্ছন্দে বোম্বাই সহরে গমনাগমন করিয়া থাকেন।

দ্বারকা

দ্বাপর যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নামে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া দুর্জ্জয় কংসকে বিনাশপূর্ব্বক মথুরার সেই শূন্য সিংহাসনে বৃদ্ধ উগ্রসেনকে অভিষেক করান, তদ্দর্শনে কংসমহিষী অস্তি ও প্রাপ্তি দুঃখিত মনে, পিতা জরাসন্ধের

শরণাপন্ন হন। মহাবল মগধাধিপতি কন্যাদ্বয়ের নিকট এই অশুভ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আচরণে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যাদবদিগকে সমূলে উন্মূলন করিবার জন্য বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় নৃপতিগণের বল সংগ্রহপূর্ব্বক মহাদর্পে মথুরা অবরোধ করিলেন, তখন কৃষ্ণপক্ষীয় মহাবলপরাক্রান্ত রাজগণ যাদবদিগের প্রতিকূলে শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখবর্ত্তী করিয়া জরাসন্ধের অনুগামী হইলেন। এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত নৃপতিগণের একত্র সম্মিলনে কালসম মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে, কত রাজগণ কত সৈন্যগণ যে প্রাণ দিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই, তৎপরে যাদবদিগের নিকট জরাসন্ধকে সদলবলে পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে হইল, কারণ যাদবপতি যে পক্ষে সহায় তাঁহাদের কি কখন পরাজয় সম্ভব? নিলর্জ্জ জরাসন্ধ বারম্বার পরাজিত হইয়াও যাদবদিগকে সুবিধা পাইলেই উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ, রাজগণ ও যাদবকুল ক্রমশঃ ক্ষয় হইতেছে দেখিয়া মন্ত্রণাগৃহে গমনপূর্ব্বক গরুড়কে এমন একটী নিরাপদ স্থান অনুসন্ধান করিতে বলিলেন, যথায় যাদবগণ সচ্ছন্দে নির্ব্বিঘ্নে বসবাস করিতে পারেন। আজ্ঞাপ্রাপ্তে গরুড় পৃথিবীর নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়া দ্বারাবতীপুরে এই স্থান মনোনীত করিয়া নারায়ণ সমীপে যথাযথ নিবেদন করিলেন, তৎশ্রবণে যাদবপতি শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের উপর সন্তুষ্ট হইয়া বিশ্বকর্ম্মাকে তথায় এমন একটী পুরী নির্ম্মাণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন, যাহাতে যাদবগণ সহ তিনি সচ্ছন্দে ঐ পুরী মধ্যে বসবাস করিতে পারেন।

গরুড় প্রমুখ্যাত বিশ্বকর্ম্মা সমস্ত অবগত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুযায়ী সবিশেষ যত্নের সহিত তথায় সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, নদ, নদী, তড়াগ, দীঘি ও অসংখ্য কূপ সকল এরূপভাবে নির্ম্মাণ করিলেন, যাহাতে যাদবগণের কোনরূপ অসুবিধা না হয়, আরও ঐ সকল জলাশয়ে কমল পরিমল রক্তকমলে সুশোভিত, তাহার উভয় কূলে সুমেরু ও হিমালয়জাত শ্বেত পীত, নীল, লোহিত বর্ণ সর্ব্ব ঋতুজাত রত্ন পুষ্প ও রত্নফলবিশিষ্ট তাল, তমাল

অশ্বত্থ ও বট প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষ সংযোজিত করিলেন, অত্র বৃক্ষশাখায় ময়ূর, ময়ূরী, কোকিল ও নানাজাতীয় বিহঙ্গম সকল শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমনের প্রতীক্ষায় প্রেমে পুলকিত হইয়া পরমানন্দে বিহার করিতে লাগিল। দ্বারাবতীতে যে সকল নদ ও নদী প্রবাহিত হইতেছে, তাহাদের বালুকা অথবা সলিলরাশি অতি নির্ম্মল ও সুশীতল, বিশেষতঃ উহাদের জল কখন তীরভূমি হইতে নিম্নগামী হয় না এবং ঐ সকল জলাশয় জলদকুসুম ও জলদ লতাগুল্মে সুশোভিত, যাবতীয় পদার্থই যেন বিশ্বকর্ম্মার সবিশেষ যত্নের পরিচয় প্রদান করিতেছে। দ্বাপরযুগে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মানসে এই পুরীর সৃষ্টি হয় এই নিমিত্ত ইহার নাম দ্বারকাপুরী হইয়াছে। দ্বারকায় দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের ঐ মনোমুগ্ধকর নিরাপদ আবাসভূমি বহু পুণ্যফলে দর্শন লাভ হয়।

বর্ত্তমান দ্বারকা যাহা এক্ষণে আমাদের নয়নগোচর হয়, উহা মহাভারত কথিত সেই দ্বারকাপুরী নহে। শ্রীকৃষ্ণের সেই সাধের দ্বারকাপুরীর অধিকাংশই সমুদ্র গর্ভে নিহিত, এক্ষণে সেই পুরীর অবশিষ্ট যাহা কিছু দর্শন পাই, অর্থাৎ মুরলীধারী বনমালীর সাধের পুরীর তাহাই স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

দ্বারকা বরোদারাজ গাইকোবারের অধিকারভুক্ত। সহরটী ক্ষুদ্র এবং কাঠিয়াবারের মধ্যে প্রধান বন্দর ও হিন্দুদিগের একটী পবিত্র তীর্থ। দ্বারকা—বরোদা রাজ্যের ও থমণ্ডল প্রদেশস্থ বাথের নামক জেলার একটী প্রধান নগর। এখানে বোম্বে নগরের দেশী পদাতিক সৈন্য ও থমণ্ডল ব্যাটালিয়ান নামে একদল গোরা সৈন্য অবস্থান করিয়া থাকে।

দ্বারকায় যতগুলি রাস্তা আছে তন্মধ্যে দুই একটী ব্যতীত সকলগুলিই অপ্রশস্ত। কচ্ছোপসাগরের সুনীল সলিল সৌন্দর্য্যই দ্বারকার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। এ দৃশ্য—বিশ্বপতির বিচিত্র সৃষ্টি-কৌশলের মহান্ ও বিরাট ভাব দর্শন করিয়া মানুষের আশা কিছুতেই পূর্ণ হয় না।

দ্বারকার শ্রীমন্দির

দ্বারকায় দ্বারকাপতির মন্দিরই তীর্থযাত্রীদিগের প্রধান দ্রষ্টব্য। এই দ্বারকার পথ হইতে শ্রীমন্দিরের দৃশ্য অতি সুন্দর। পাঠকবর্গের প্রীতির জন্য ঐ সুন্দর মন্দিরপথের একখানি দৃশ্য প্রদত্ত হইল। দ্বারকায় দ্বারকানাথের দর্শন এবং পুণ্যবতী গোমতী নদী যথায় সাগরের সহিত সঙ্গম হইয়াছেন, কথিত আছে সেই সঙ্গমস্থানে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিলে স্থান মাহাত্মগুণে জীবের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। এই গোমতী এখানে সাগরের সহিত মিলিত হইয়া ইহার পবিত্রতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন।

দ্বারকাপতির মূল মন্দিরটী পঞ্চতল এবং উচ্চে একশত ফুটের ন্যূন নহে। প্রবাদ এইরূপ যে, এই সুবৃহৎ মন্দিরটি শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মা এক রাত্রিতে নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যের অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমন্দিরের সম্মুখভাগে একটী প্রশস্ত নাট মন্দির আছে। এই সুন্দর নাটমন্দিরটী ৬০টী স্তম্ভের উপর স্থাপিত হইয়া নির্ম্মাণকারীর গৌরব প্রকাশ করিতেছে। ইহার ত্রিকোণাকৃতি চূড়াটি কম বেশ ১৭০ ফুট উচ্চ।

যাত্রীগণ প্রদত্ত দক্ষিণাদি হইতে এই দেবের বার্ষিক আয় প্রায় চারি সহস্র টাকা উদ্ধিত হয়। বলা বাহুল্য যাত্রী সমাগম অধিক হইলে আয়ও অধিক হয়। এখানে যাত্রীদিগকে স্থানীয় নিয়মগুলি পালন করিতে হয়। প্রথমে দেব দর্শনের পূর্ব্বে গোমতী নদীতে অবগাহন ও তর্পণাদি করিতে হয়। এই সময় বরোদার রাজার প্রধান কর্ম্মচারীর গদীতে দুই টাকা, রাজ কর জমা দিয়া ম্যাজেষ্টারের ছাপ লইতে হয়, এই ছাপ না দেখিলে প্রহরীরা কথনই নদীতে অবগাহন করিতে দেয় না। তৎপরে শুদ্ধ কলেবরে মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইয়া যথাক্রমে ৪॥০ ও পূজার মূল্যের ৩।০ আনা

টি দর্শনী সমেত ৭৸৹ আনা দিয়া দেব দর্শন করিতে হয়। মন্দির অভ্য- ভগবান রণছোড়জীউর পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক বেন। স্থানীয় পূজারীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম যে, প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে এখানকার পাণ্ডারা দেবালয়টী রাজার অধীন হইবার সময় বিগ্রহমূর্ত্তিটী গুপ্তভাবে লইয়া গিয়া গুজরাটের অন্তর্গত ঢাকুর নামক ন প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি মূল বিগ্রহ মূর্ত্তি তথায় বিরাজ করিতেছেন। রূপে দ্বারকার ঐ শূন্য সিংহাসনে রণছোড়জীউর পবিত্র মূর্ত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কিন্তু কোন বিশেষ কারণ বশতঃ ইহাও অপহৃত হইয়া, বটদ্বীপে টীর অপর তীরে সেই মূর্ত্তি পূজারীগণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভগবান কাপতি তথায় শঙ্খেশ্বরস্বামী নামে বিরাজ করিতেছেন।

এক্ষণে আমরা যে মূর্ত্তি দর্শন পাইয়া থাকি, ইনি তৎপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ার সুপাহারার ব্যবস্থায়, নির্ব্বিঘ্নে বিরাজমান থাকিয়া ভক্তদিগকে দর্শন ন উদ্ধার করিতেছেন।

যাত্রীগণ প্রথমে দ্বারকায় আসিয়া এই দ্বারকাপতির দর্শন লাভ করিয়া ন ও নয়ন সার্থক পূর্ব্বক মহাব্রত উদযাপন করেন। তৎপরে পাণ্ডাদের কে পতিত হইয়া তাঁহাদের উপদেশমত বটদ্বীপস্থ প্রাচীন দ্বারকানাথ খেশ্বর স্বামীর" দর্শন করিবার জন্য অনেকে তথায় গমন করেন। এই ীপে ভগবানের প্রাচীন মূর্ত্তি দর্শনের নিমিত্ত প্রত্যেক যাত্রীর নিকট রীরা পাঁচ টাকা দেবকর বা দর্শনী আদায় করিয়া তবে দেব দর্শন করান।

ভক্তগণ দ্বারকায় আসিয়া সাধ্যমতে মনের সাধে এখানকার দেবতা ছোড়জীউকে" বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি প্রদান করিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত ি। এই পোষাক খরিদ কেবল পূজারীদের কিছু লাভের জন্য কারণ হই বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই পোষাক খরিদ করেন সত্য, কিন্তু পাণ্ডারা াত্র শ্রীঅঙ্গে শোভা বৃদ্ধি করিয়াই তৎক্ষণাৎ উহা বাজারে বিক্রয়

করিয়া থাকেন। এইরূপে একই পোষাক বৃন্দাবনের যমুনাতীরের তলে বস্ত্র হরণের ঘাটের ন্যায় পুনঃ পুনঃ ক্রীত ও বিক্রীত হইয়া থাকে।

দ্বারকাপুরীর অন্য নাম কুশস্থলী। পূর্ব্বকালে ইহা পরম আনর্ত্তরাজের রাজধানী ছিল। তৎপরে দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় রাজধানীতে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও নানাপ্রকার নদ নদী সকল বি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া ইহার সৌন্দর্য্য শতসহস্রগুণে বৃদ্ধি হইয়াছে।

দ্বারকামাহাত্ম্য—যে দ্বারকায় তেত্রিশ কোটি দেবতাগণ, ঋ গন্ধর্ব্বগণ, সতত হৃষ্টচিত্তে গমনাগমন করিয়া ভগবানের স্তবগুণ গান তেন, যথায় লক্ষ্মীস্বরূপিণী রুক্মিণীদেবী ও কত শত মহিষী একত্রে সুখে করিয়া কত আনন্দ অনুভব করিতেন, যে দ্বারকার প্রতি রজবিন্দু পবিত্র, যে দ্বারকায় নারায়ণ-পুষ্করিণী নামে পুণ্যতোয়া সরোবর বির যে সরোবর ভারতের চারি ধামের মধ্যে সর্ব্বত্রই পূজনীয়, যাত্রীগণ ভক্তিসহকারে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিয়া থাকেন এবং তীর্থ নিয়ম অ পিতৃপুরুষগণের উদ্ধার কামনা করিয়া তর্পণপূর্ব্বক চরিতার্থ বোধ করে স্থানে গ্রহণাদি পর্ব্বদিনে বহু দূরদেশ হইতে ভক্তগণ আসিয়া মুক্তি করিয়া থাকেন, যে দ্বারকার তুলনা করিতে দেব ও ঋষিগণও হার ম যে দ্বারকা দর্শনে নরও নারায়ণ হন এমন কি কথিত আছে, এই স্থানমাহাত্ম্যগুণে গর্দ্দভ পর্য্যন্ত দেহত্যাগ করিলে চতুর্ভুজ হইয়া থ সেই দ্বারকার মাহাত্ম্য আমার ন্যায় স্বল্পবুদ্ধি নরে [illegible]প প্রকাশ ক সমর্থ হইবে। দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া পুণ্যস্থান দ্বারকার বিষয় উ করিতে করিতে, দ্বারকার কাহিনী শুনিতে শুনিতে এবং বিশ্বকর্ম্মা অট্টালিকার শোভা দর্শন করিতে করিতে আত্মহারা হইবেন সন্দেহ নাই

যিনি শুদ্ধচিত্তে দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া তীর্থপদ্ধতি ক্রমে সক সম্পাদন পূর্ব্বক তৃণমাত্র দান করিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তব পিতৃপুরুষগণের সহিত বৈকুণ্ঠে স্থানপ্রাপ্ত হন্। না

বহু দূরদেশ হইতে যিনি এই পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইয়া দেহত্যাগ করিতে পারেন, শ্রীহরির কৃপায় আর কখন তাঁহাকে গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। কালক্রমে সেই বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত দ্বাপরযুগের ঐ অদ্ভুত রত্নখোদিত বহু দূরব্যাপী শ্রীকৃষ্ণের পুরীর অধিকাংশই এক্ষণে সাগরগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে।

দ্বারকার নিম্নভাগে দেবগণের দুর্ল্লভ এক পুণ্যবতী নদী আছে। ভক্তগণ উহাকে পাপনাশিনী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এখানে স্নান করিবার সময় পাহাড় হইতে যে জল পতিত হইয়া গোমতী নদীর সহিত সাগর যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানে লোহার শিকল ধরিয়া স্নান করিতে হয়; কারণ ঐ স্রোতগামী সঙ্গম স্থানে ভক্তিসহকারে অবগাহন করিতে পারিলে জন্মজন্মান্তরের কলুষনাশ হইয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান দ্বারকায় পাঁচটী প্রধান মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে জগৎমুট নামক মন্দিরই নানা কারুকার্য্যে শোভিত এবং প্রসিদ্ধ। ইহার উচ্চতা ১৩১ ফিট্। এখানে বহুবিধ তীর্থ ও বিগ্রহ মূর্ত্তি বিরাজিত যথা:—গোমতীতীর্থ, সাগরতীর্থ, সাগর-গোমতীসঙ্গম, সপ্তকুণ্ড, নৃপ-কূপ, গঙ্গাতীর্থ ও গো-প্রচার তীর্থ ইত্যাদি।

দ্বারকায় বহুবিধ মঠ আছে; তন্মধ্যে মহারাজ শঙ্করস্বামীর মঠই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই সকল মঠে সাধু সন্ন্যাসীরা তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিবার সময় বিশ্রাম করিয়া থাকেন। ঐ সকল ধর্ম্মাত্মাদিগকে দর্শন করিলেও মহা পুণ্য সঞ্চয় হয়, সন্দেহ নাই।

দ্বারকাপুরে যে সমস্ত পাণ্ডা আছেন, তাঁহারা সকলেই দচ্নি ব্রাহ্মণ, কিন্তু বাঙ্গালা বা হিন্দী ভাষা বেশ বুঝিতে পারেন। এখানে উপস্থিত হইয়া যাঁহাকে তীর্থ গুরু মান্য করা যায়, তিনিই যাত্রীদিগের থাকিবার

জন্য বাসা, আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীরই অভাব মোচন করিয়া থাকেন, কিন্তু সুফলের সময় সাধ্যমত বিরক্ত করিয়া টাকা আদায় করিতে ত্রুটি করেন না। এই সকল পাণ্ডাদের নিকট নাস্তিকতা ভাব দেখাইলে আর অধিক জোর জবরদস্তি করেন না। যাত্রী সংগ্রহ করিবার জন্য ইহাদেরও বিস্তর গোমস্তা আছে, তাঁহারাও খতিয়ান বহি দেখাইয়া অপর তীর্থ স্থানের ন্যায় যাত্রী সংগ্রহ করিতে থাকেন। ঐ গোমস্তাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, তাহারা যাত্রীর সকল বিষয়েই সহায়তা করিয়া থাকেন। এই তীর্থে উপস্থিত হইয়া যাঁহার যে পাণ্ডা নির্দ্দিষ্ট আছেন—তিনি তাঁহারই সন্ধান করিবেন, আর যিনি নূতন, তিনি ইচ্ছানুযায়ী নূতন পাণ্ডা নিযুক্ত করেন।

দ্বারকাপুরী হইতে ৯ ক্রোশ দূরে তামড়া নামক একটী স্থান আছে। ভক্তগণ বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া তথায় গমন করেন। সেখানে যে একটী পুণ্যপুকুর আছে,ঐ পুষ্করিণী হইতে গোপীচন্দন নামক তিলকমাটি অতি আগ্রহের সহিত সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কারণ কথিত আছে, যাঁহার দেহে এই পবিত্র চন্দন অঙ্কিত হয়, তাহার শরীরে লক্ষ্মী, সরস্বতী, পার্ব্বতী ও সাবিত্রীদেবী সদাসর্ব্বদা বিরাজমান থাকেন, অর্থাৎ কখন তাঁহার কোন দুর্গতি হয় না। বহু পুণ্যে মানব জন্ম সংঘটন হয়, অতএব মনুষ্যমাত্রেই এই সকল তীর্থের সেবা করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবেন।

এখানে একটীমাত্র ব্রাহ্মণ ভক্তিসহকারে দক্ষিণাসহ ভোজন করাইলে অন্য স্থানের সহস্র ব্রাহ্মণ-ভোজনের তুল্য ফললাভ হয়। দ্বারকায় সুফলের প্রথা আছে। এই সকল তীর্থের নিয়মগুলি পালনসহকারে ধর্ম্মে মতি রাখিতে পারিলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পুত্র পৌত্রাদি লইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে পারা যায়। এইরূপে দ্বারকার শোভা দর্শন করিয়া অন্য তীর্থ স্থানে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম।
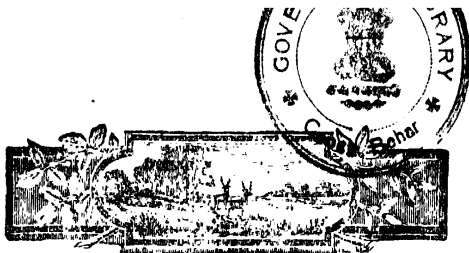
গৌহাটীর অন্তর্গত

"কামরূপ বা কামাখ্যা" দর্শন যাত্রা

কলিকাতা হইতে কামাখ্যাদেবীকে দর্শন করিতে হইলে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে দার্জ্জিলিং মেলগাড়ীতে আরোহণপূর্ব্বক বরাবর পার্ব্বতী-পুর জংসন ষ্টেশনে আসিতে হয়। পার্ব্বতীপুর ষ্টেশন তিনটী রেল লাইনের সন্ধিস্থল। যাঁহারা কামাখ্যাদেবীকে দর্শন করিতে যাইবেন, তাঁহাদিগকে এই স্থানে মেল গাড়ী হইতে অবতরণপূর্ব্বক ধুব্‌ড়ী-এক্‌টেনসন্ পথটী অবলম্বন করিতে হইবে, অর্থাৎ পার্ব্বতীপুর ষ্টেশন হইতে যে শাখা ধুব্‌ড়ী লাইন আছে, সেই লাইনের সাহায্যে ধুব্‌ড়ী ঘাট নামক ষ্টেশনে যাইতে হইবে। এই ধুব্‌ড়ী-ঘাট ষ্টেশন এক অদ্ভুত দৃশ্য। এখানে আসিলে কত সাধু, কত সন্ন্যাসী, কত তস্কর দেখা যায়, আরও কত আরকাটীদিগের প্রলোভনে পতিত হইয়া, কত অসহায় নিরীহ লোকদিগকে বিষণ্ণ মনে আসাম চা-বাগানে যাইতে হইতেছে, সেই মহামারী কুলীদিগের চালান ব্যাপার সমস্তই দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ এখানে বিদেশ হইতে স্বদেশ যাত্রা করিয়া আপন স্বজনগণের

সহিত মিলিত হইবার জন্য আহ্লাদিত মনে যাত্রা করিতেছেন, কে তীর্থ যাত্রা করিবার আশায় এক রেল গাড়ী হইতে অপর গাড়ী বদ করিবার জন্য ব্যস্তসহকারে আপন মোট গাঁটরীর তত্ত্বাবধান করিতে- ছেন ; কেহ স্ত্রী, পুত্র, পরিবারবর্গকে ছাড়িয়া দাসত্বের জন্য দুঃখিত মনে কর্ম্ম স্থানে যাইতেছেন, কেহ কোথায় দুষ্কর্ম্ম করিয়া রাজার শাসন ভয়ে প্রাণের দায়ে কোন নিভৃত স্থানে পলাইতেছেন। এইরূপ কত প্রকার লোকদিগকে এই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। চা-বাগানের এই সকল কুলীদিগের পাষাণভেদী বিলাপধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে, তাহাদের সেই ম্লান মুখগুলি নয়নপথে পতিত হইলে মনে হয় যে, আরকাটীরা কি করুণাময় পরমেশ্বরের সৃষ্ট মানব, না নরপিচাশ সদৃশ নিষ্ঠুর রক্তলোলুপ রাক্ষস ধরায় মানবরূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে ? মায়া, দয়া, ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া তাহারা যে ব্যবসায় রত হইয়াছে—তাহা অতি নিকৃষ্ট। আরকাটীদিগের এই কুলী চালান ব্যাপার নয়নগোচর হইলে তাহাদিগকে নরপিচাশ বলিয়াই অনুমান হয়।

ধুবড়ী—গোয়ালপাড়া জেলার একটী প্রধান মহকুমা। ইহার উত্তরে ভুটানপর্ব্বত, দক্ষিণে গারোপর্ব্বত, পূর্ব্বে কামরূপ পর্ব্বত, পশ্চিমে কুচবিহার ও রংপুর সহর অবস্থিত। এই ধুবড়ী ঘাট নামক ষ্টীমার ষ্টেশন হইতে যখন ব্রহ্মপুত্রের অতল সলিলরাশির উপর দিয়া বাষ্পীয় পোতখানি ভাসিতে ভাসিতে অগ্রসর হয়। তখন প্রাণে এক অনি- র্ব্বচনীয়ভাবের উদয় হইতে থাকে।

গৌহাটী

গৌহাটী—কামরূপ জেলার একটী প্রধান মহকুমা। পূর্ব্বে এই স্থানে সুপারির হাট ছিল, এই নিমিত্ত এই স্থানের নাম গৌহাটী হইয়াছে। কামাখ্যাদেবী দর্শনেচ্ছুক যাত্রীদিগকে এই গৌহাটী নামক ষ্টীমার ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। গৌহাটী একটী প্রকাণ্ড সহর। গুয়া অর্থে সুপারি, আর হাটী শব্দে বাণিজ্য স্থান অর্থাৎ যে স্থানে ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহা দীর্ঘে তিন মাইল এবং প্রস্থে অন্যূন দেড় মাইল স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সহরটী প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত যথা—পূর্ব্বে উজান বাজার। এই স্থানে সাহেবদিগের বাস স্থান, কোর্ট, আফিস, আদালত, কাছারী, পোষ্টাফিস, বাজার, হাট ও যাত্রীদিগের থাকিবার বাসা বাড়ী প্রভৃতি বিদ্যমান। কোর্টের নাগাও এক প্রকাণ্ড দিঘী, সংস্কার অভাবে ইহা শৈবালে পরিপূর্ণ। এই দিঘীটী আহাম রাজাদিগের (আসামের অপভ্রংশ আহাম) আমলের নির্ম্মিত। ইহা এই স্থানে অবস্থান করিয়া প্রাচীন রাজাদিগের কীর্ত্তি-কলাপ সাক্ষ্যস্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহাদের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। সহরের মধ্যভাগ পান বাজার নামে প্রসিদ্ধ। এখানে স্কুল, কলেজ, বোর্ডিং এবং নেটিভদিগের বাসস্থান আরও নানাবিধ দ্রব্যের বড় বড় প্রসিদ্ধ দোকান আছে। ব্যবসা ও কর্ম্ম উপলক্ষে এখানে বহু আসামী, নেপালী এবং বাঙ্গালীদিগকে বাস করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল নেপালী বা আসামী স্ত্রীলোক এখানে বসবাস করেন, তাঁহারা সদাসর্ব্বদাই ম্যাকলা (স্তনের উপরিভাগ হইতে কোমর পর্য্যন্ত ঢাকা একপ্রকার কাঁচলীর ন্যায় জামা বিশেষ) পরিধান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মুখশ্রী আমাদের চক্ষে তাদৃশ সুশ্রী না হইলেও,

বর্ণ যেন দুধে আলতা গোলা। ইহার পশ্চিম ভাগটী ফাঁসী বাজার নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে অধিকাংশ ভাগই দোকান। এই ফাঁসী বাজার ও উজান বাজারে দুইটী প্রসিদ্ধ তরিতরকারীর হাট আছে। পান বাজারে সেরূপ বিখ্যাত বাজার নাই—তবে এখানে প্রাতে রাস্তার ধারে মৎস্য ও তরকারীর অল্প সংখ্যক দোকান বসে, উহাতেই স্থানীয় অধিবাসীদিগের অনেক উপকার হয়। এতদ্ভিন্ন পান বাজারে দুই-একখানি ডিস্পেন্সারী ও এণ্ডির দোকান দেখিতে পাওয়া যায়, এই অসামীএণ্ডি জগদ্বিখ্যাত। আবশ্যক থাকিলে এখানে ঐ সকল এণ্ডি সুবিধা দরে খরিদ করিতে পারেন। মৎস্য এবং মালভোগ রম্ভা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত দ্রব্যই কলিকাতা অপেক্ষা দুর্ম্মূল্য। গো দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু মহিষ দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানে পাহাড়ী অসভ্য স্ত্রী পুরুষের মধ্যে স্ত্রীলোকের ভাগই অধিক আছে। তাহারা নিত্য পাহাড় হইতে কাষ্ঠ কাটিয়া আনিয়া বাড়ী বাড়ী বিক্রয়পূর্ব্বক যে মূল্য উপার্জ্জন করে, উহাতেই তাহাদের স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। বড় বড় জ্বালানী কাষ্ঠ গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে, এরূপ সতত দেখিতে পাওয়া যায়। গৌহাটীর রাস্তাগুলি পরিষ্কার ও প্রশস্ত। ধূলা থাকিলেও তাহা অনুমান হয় না এবং বৃষ্টি হইলেও পথে কর্দ্দম হয় না। মোহনভোগ নামে এপ্রদেশে এক প্রকার রম্ভা আছে, উহা দেখিতে যেরূপ নয়নানন্দদায়ক—আস্বাদেও সেইরূপ সুমিষ্ট, অথচ দামেও কম; কারণ এদেশবাসীগণের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ঐ সকল রম্ভা খাইলে বাতগ্রস্ত হইতে হয়। মৎস্যের মধ্যে রুই মৎস্যই এখানে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়, কিন্তু কলিকাতা সহর অপেক্ষা অনেক সুলভ। মৃগেল মৎস্যগুলি স্থানীয় অধিকাংশ অধিবাসী খায় না। এই নিমিত্ত একটী /১ হইতে /১৷৷ সের পর্য্যন্ত মৃগেল মৎস্য এখানে /০ আনা মূল্যে বিক্রয়

হয়। আমরা এ দেশে যেরূপ শাল বা শোল মৎস্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকি, তথাকার অধিবাসীগণও সেইরূপ এই মৃগেল মৎস্যকে ঘৃণা করেন। মৃগেল মৎস্যগুলি কেবল গরীব বা নীচ জাতীয় লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। বলাবাহুল্য, আমরা তীর্থযাত্রী—সুতরাং মৎস্যের আস্বাদ করি নাই। এ দেশে পান সকলেই ব্যবহার করেন, এবং প্রত্যেক বাটীতে পানের গাছও দেখিতে পাইলাম, তাহারা আবশ্যক মত ঐ সকল গাছ হইতে পান তুলিয়া ব্যবহার করেন। কাঁচা সুপারি এদেশবাসীদিগের এক উপাদেয় সামগ্রী।

গৌহাটী সহর হইতে কামাখ্যাদেবীর মন্দির অন্যূন তিন মাইল দূরে অবস্থিত। এই তিন মাইল পথ অতিক্রম করিতে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়। এখানকার ঘোড়ার গাড়ীগুলি দীর্ঘ, উচ্চ ও প্রশস্ত। চারিজন লোক অক্লেশে গমনাগমন করিতে পারেন, এইরূপ একখানি ঘোড়ার গাড়ী গৌহাটী হইতে কামাখ্যাদেবীর মন্দিরের পদপ্রান্ত পর্য্যন্ত যাইতে মেলার সময় এক টাকার কমে ভাড়া পাওয়া যায় না, অপর সময়ে ইহা অপেক্ষা সুবিধা দরে পাওয়া যায়। আমরা অম্বুবাচী মেলার সময় গিয়াছিলাম, সুতরাং আমাদিগকে প্রত্যেক গাড়ীখানির প্রতি এক টাকা হিসাবে ভাড়া দিতে হইয়াছিল। এই তিন মাইল পথ অতিক্রম করিতে এক ঘণ্টা সময় লাগে।

পাহাড়ের পদপ্রান্তে আমরা সকলে উপস্থিত হইবামাত্র পাণ্ডা নিযুক্ত গোমস্তাগণ দলে দলে আসিয়া যাত্রী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, এবং যত্নের সহিত আপন আপন পাণ্ডার শিষ্য করিবার জন্য যাত্রীদিগকে অনুরোধ করিলেন। আমরা প্রথমেই ঐ সকল গোমস্তাগুলিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, দেবীর স্থানে কেবল বিশ ঘর পাণ্ডার বাস স্থান ব্যতীত অপর কোন যাত্রা থাকিবার বা বাস করিবার

উপযুক্ত বাসা বাড়ী পাওয়া যায় না ; তাহাদের নিকটে এইরূপ উপদেশ পাইয়া আমাদের প্রথমে বাসা ঠিক না করিয়া কোথাও যাইতে মন উঠিল না ; কারণ আমাদের দলমধ্যে স্ত্রী, পুত্র ও পরিবারবর্গকে লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ ষোলজন লোক ছিলাম এবং বিছানা পত্র মোট গাঁটরী প্রভৃতি বিস্তর ছিল, এই হেতু প্রথমে বিশ্রাম স্থান ঠিক করিয়া এই সকল মোট গাঁটরীর গতি করিয়া পরে দেব স্থানে যাইতে মনস্থ করিলাম। একটী গোমস্তা আমাদিগের সঙ্গে স্ত্রীলোক দেখিয়া দুই পয়সা লাভের প্রত্যাশায় প্রাণপণে আমাদের মনস্তুষ্টি করিতে লাগিলেন, এবং সঙ্গে করিয়া পান বাজার নামক স্থানে আমাদের অবস্থানের জন্য একটী বাসা বাড়ী ঠিক করিয়া দিলেন। তাহাদের বিশ্বাস, স্ত্রীলোক সঙ্গে না থাকিলে দুই পয়সা উপায় হয় না।

অম্বুবাচী মেলার সময় এখানে এত যাত্রীর সমাগম হয় যে,শ্রীক্ষেত্রের রথোৎসবের সময়ের ন্যায় এই জঙ্গলাপূর্ণ দূরদেশেও যাত্রীগণ বাসস্থান সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, বাধ্য হইয়া প্রত্যহ লোক প্রতি এক টাকা হিসাবে সামান্য বাসার জন্য ভাড়া দিতে বাধ্য হন। গৌহাটী সহর হইতে কামাখ্যাদেবীর মন্দিরের পদ প্রান্ত পর্য্যন্ত এই তিন মাইল পথ গাড়ীতে আসিবার সময় যে সকল ঘর বাড়ী দেখিতে পাইলাম, তন্মধ্যে ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহের সংখ্যা বড়ই অল্প। অধিকাংশ বাড়ীগুলি টিনের ছাদযুক্ত, এবং কতকগুলি তৃণাচ্ছাদিত। সে যাহা হউক, [illegible]গুলি বেশ কারুকার্য্যশোভিত। আমরা টিনের চালযুক্ত তিনখানি কক্ষ মধ্যে কাষ্ঠের বেড়া দেওয়া ঘর পাইলাম। এই তিনখানি ঘরের মধ্যে একখানিতে স্ত্রীলোক, একখানিতে বয়োজ্যেষ্ঠ লোক, অপরখানিতে বয়োকনিষ্ঠ লোকগুলি অধিকার করিলাম। এইরূপ টীনের ঘরে প্রত্যহ লোক প্রতি এক টাকা হিসাবে ভাড়া ধার্য্য করিয়া তন্মধ্যে আপন দ্রব্য

সামগ্রী ও মোট গাঁটরীগুলি স্থাপন করিয়া সেদিনকার মত বিশ্রাম করিতে মনস্থ করিলাম। কারণ গোমস্তা ঠাকুর বলিলেন, দেবী স্থানে ব্রহ্মপুত্র বা সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নান না করিয়া প্রবেশ নিষিদ্ধ। এ গাড়ী ও গাড়ী ষ্টীমার প্রভৃতিতে গমনাগমন করিয়া আমরা এত ক্লান্ত হইয়াছিলাম যে বিশ্রাম না করিলে অসুস্থ হইতে হইবে, এই নিমিত্ত সেদিন আর কোথাও বাহির হইলাম না। বাসাবাটী হইতে ব্রহ্মপুত্র অন্যূন অর্দ্ধ মাইল, আবার সৌভাগ্যকুণ্ডও তদপেক্ষা অধিক, এই সকল কারণে সেদিন এক জঠরানল নিবৃত্তি ভিন্ন অপর কোন কার্য্যই হইল না। যাহা হউক, গোমস্তার পরিচিত লোকের নিকট বাসা পাইয়া মনে মনে ভাবিলাম, বোধ হয়—এই ভাড়ার মধ্যে গোমস্তার কিছু দস্তুরি আছে; নচেৎ এইরূপ সামান্য টীনের ঘরের এত দূরদেশেও এক টাকা ভাড়া অসম্ভব, কিন্তু পরক্ষণেই সে সন্দেহ দূর হইল; কারণ আমাদের পর যে সকল যাত্রীর সমাগম হইল, তাহারা কেহ ২৲ কেহ ১॥০ টাকা ভাড়া ধার্য্য করিয়া আমাদের পশ্চাদ্ভাগে বাসা লইতে লাগিলেন। যাহা হউক, গোমস্তা ঠাকুর যখন জানিতে পারিলেন যে, সেদিন আমরা কোথাও যাইব না; তখন তিনি আমাদিগকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া প্রস্থান করিলেন, আবার পরক্ষণেই ঐ গোমস্তাটীকে দেখিলাম; আমরা যে স্থানে বাসা লইয়াছিলাম, সেই বাটীতেই অপর এক দল স্ত্রী, পুত্রসহ বাঙ্গালী যাত্রী আনিয়া রাখিলেন, তাহাদের প্রত্যেকের ভাড়া ১।০ ধার্য্য হইল। এই গোমস্তাটী অতি মিষ্টভাষী এবং যাত্রীদিগকে অত্যন্ত যত্ন করেন, এই নিমিত্ত যিনি একবার তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার যত্নে বশীভূত হইয়া পড়েন। এইরূপে আমরা আশ্রয় পাইয়া এবং আরও দুই-দশজন জাতি ভাইয়ের সহিত মিলিত হইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। কেন না আমাদের পার্শ্বে যে দুইখানি ঘর

থালি ছিল, তাহাতে কোন্ জাতীয় কিরূপ লোক আসিবেন—ইহাই ভাবনা ছিল, এক্ষণে জগজ্জননী কামাখ্যাদেবীর কৃপায় সে সকল ভাবনা দূর হইল। এই পান বাজারের বাসা বাটী হইতে কামাখ্যাদেবীর মন্দির অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। কামাখ্যাদেবী যে পাহাড়ে বিরাজ করিতেছেন, সেই পাহাড়ের নাম নীলাচল পর্ব্বত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামক তিনটী পর্ব্বত সমষ্টি হইয়া এই নীলাচল পর্ব্বত সংগঠিত।

বর্ত্তমান আসামপ্রদেশ—হরকোপানলে দগ্ধ কামদেব পুনঃ স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত এই স্থানের নাম কামরূপ হইয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থানে নানাবিধ তীর্থ সকল বিরাজমান ছিলেন। কথিত আছে, যে এ স্থানে ব্রহ্মপুত্র নামক নদ ও করোতুয়া নাম্নী গঙ্গা প্রবাহিতা, দেবী মহামায়া স্বয়ং কামাখ্যা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন, এ পুণ্যভূমি দেবতাদিগের ক্রীড়া স্থান বলিয়া খ্যাত এবং দেবগণ আপন ইচ্ছানুযায়ী ইন্দ্রপুরী সদৃশ মনোহর প্রাসাদ সকল নির্ম্মাণ করিয়া সতত বিহার করিতেছেন। ব্রহ্মা এই পুরীতে অবস্থানকালে নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া এ স্থান প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে খ্যাত। কালের কি বিচিত্র গতি! দেবগণের সেই সাধের সুন্দর প্রাসাদের অধিকাংশগুলিই এক্ষণে ধ্বংস বা লোপ পাইয়াছে। মহাতপা বশিষ্ঠদেবের শাপে যে স্থানে দেবী উগ্রতারা বিরুদ্ধভাবে পূজিত হইয়াছিলেন এবং ভগবান মহেশ্বরকে ম্লেচ্ছের ন্যায় অবস্থান করিতে হইয়াছিল; শেষ বিষ্ণুর আগমনে তাঁহার শাপ মুক্ত হইয় মুক্তিপ্রদ পাইয়াছিলেন, যে কামরূপ বা কামাখ্যাতে "মহামুদ্রা যোনি পীঠ বিরাজিত," যে পর্ব্বতে ত্রিগুণাতীত হইয়াও আমি "রক্ত পাষাণ রূপিণী" শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়, যে স্থানে হয়গ্রীব মাধব এবং উমানন্দ নামে ভৈরব অবস্থিত। যে ক্ষেত্রে দেবী মোক্ষদার নিত্য বিহার স্থান;

যে স্থানে ব্রহ্মকুণ্ড অবস্থিত, যে কুণ্ডের মাহাত্ম্যগুণে পরশুরাম স্পর্শমাত্র মাতৃহত্যা মহাপাপজনিত হস্তসংলগ্ন পরশু স্খলিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই নিত্যধাম প্রভাবময় ক্ষেত্রে জীবের মুক্তি নিঃসংশয়। মানবজন্ম ধারণ করিয়া এই পবিত্র মোক্ষদায়িনী কামাখ্যাদেবীকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া জীবন সার্থক করিতে কেহ যেন কখন অবহেলা না করেন।

অম্বুবাচীতে কামাখ্যাদেবীর দর্শন প্রশস্ত। এই সময় এই স্থানে কত দূরদেশ হইতে নানা স্থানের ভক্তগণ উপস্থিত হইয়া এক মহা মেলায় পরিণত করেন। এই অম্বুবাচী উৎসবের সময় পুলিস প্রহরীগণ এবং উচ্চতম পুলিস-কর্ম্মচারী এখানে উপস্থিত থাকিয়া যাহাতে ভক্তগণের দেবী দর্শনে কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। কামরূপ তীর্থ স্থানটী গৌহাটীর পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত।

ব্রহ্মপুত্রে স্নানযাত্রা

পর দিবস প্রত্যূষে আমাদের পাণ্ডার অধীনস্থ যাবতীয় যাত্রীগণ তাঁহার আদেশ মত প্রথমে তাঁহার বাসায় গমন করিলাম, এবং তাঁহাকে তীর্থগুরু পদে মান্য করিলাম। বলাবাহুল্য, তিনিও সন্তুষ্টচিত্তে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। তৎপরে ব্রহ্মপুত্রনদে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নানের আয়োজন হইল। কামাখ্যাদেবীর নাটমন্দিরের পূর্ব্বাভিমুখে যে সোপানশ্রেণীযুক্ত রাস্তা আছে, সেই রাস্তার উপর দিয়া সদলবলে বরাবর অর্দ্ধ মাইল পথ অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মপুত্রনদের তীরে পৌঁছিলাম। পথিমধ্যে কত ভিখারী, কত ব্রাহ্মণ, কত ফুলওয়ালী এই পবিত্র নদের অর্চ্চনার নিমিত্ত আমাদিগকে বেষ্টন

করিতে লাগিল, তাহার সংখ্যা নাই। আমরাও সাধ্যমত সকলকে সং
করিয়া আবশ্যক মত কিছু পুষ্প খরিদ করিলাম, এবং মনের সুখে
তীর্থতীরে পাণ্ডার সাহায্যে মন্ত্রপাঠ সহকারে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান এ
পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করিলাম। এখানে এই নদতীরে দেখিলা
আমাদের ন্যায় কত ভক্ত আসিয়াছেন—উহা বর্ণনাতীত। এ তী
ঘাট-অঘাটের কোন বিচার নাই, যিনি যে স্থানে সুবিধা বুঝিতেছেন-
তিনি আপন যাত্রীদিগকে লইয়া সেই স্থানেই স্নান কার্য্য সম্পন্ন কর
ইতেছেন, এইরূপে অল্পক্ষণের মধ্যে তীর্থ স্থানের ঘাটটী লোকে লোক
রণ্য হইল। আমরা স্নান কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পাণ্ডার উপদেশ ম
পাণ্ডু ঘাটে যাত্রা করিলাম; তথায় পাণ্ডার নিকট উপদেশ পাইলা
এই স্থানে পূর্ব্বে ব্রহ্মকুণ্ড তীর্থটী ছিল—এক্ষণে সেই কুণ্ড নদের গর্ভে
বিলীন হইয়াছে। যাহা হউক, তাঁহার আজ্ঞা মত এই কুণ্ডের জল স্পর্শ
করিয়া পাণ্ডুশিলায় আরোহণ করিলাম। পাণ্ডুশিলাটী অধিক উচ্চ নয়,
সুতরাং অক্লেশেই ইহাতে আরোহণ করিলাম। এখানে চারিটী গণেশ
মূর্ত্তি আছে, এই ঘাটের তীরে যুধিষ্ঠির ভীম, নকুল ও সহদেব আবার
ইহারই এক স্থানে পাণ্ডবনাথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুন মিলিত হইয়া
পাষাণরূপে অবস্থান করিতেছেন। এই সকল পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন শেষ
হইলে পাণ্ডা ঠাকুর আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবুজি! এখন আপ-
নারা এই নদের তীরস্থ তীর্থ স্থান সকল দর্শন করিবেন না যে কামাখ্যা-
দেবীর দর্শনের জন্য আসিয়াছেন, সেই মহামায়ার দর্শন অগ্রে করি-
বেন? এই নদের উপর যে সকল তীর্থ বিরাজিত, সেই সকল তীর্থ
একে একে দর্শন ও পূজা করিতে হইলে অদ্য আপনাদের দেবী দর্শন
হইবে না।"

তাঁহার নিকট এইরূপ অবগত হইয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি-

লাম, "মহাশয়! গুরুজন এবং পঞ্জিকাতে দেখিয়াছি যে, প্রথমে উমানন্দ ভৈরবজীউর দর্শন করিয়া তৎপরে কামাখ্যাদেবীর দর্শনের নিয়ম আছে।"

তখন তিনি বলিলেন, "এরূপ নিয়ম আমাদের তন্ত্রশাস্ত্রে নাই— তবে তথায় কর্ম্মনাশা নামে একটী পর্ব্বত আছে। এখানকার তীর্থ সকল সেবা করিয়া যে পুণ্য উপার্জ্জন হয়, যদি দৈবাৎ শেষ কেহ সেই কর্ম্মনাশা পাহাড় দেখেন, তাহা হইলে তাহার সকল তীর্থ ফল নাশ হয়, এই ভয়ে অনেকে প্রথমে ঐ স্থানে গমনপূর্ব্বক পরে অপরাপর তীর্থ সকলের সেবা করিয়া থাকেন। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, যাহাতে কর্ম্মনাশা পর্ব্বত আপনাদের নয়নপথে পতিত না হয়, সে বিষয় আমিও সতর্ক থাকিব। বেলা যত অধিক হইবে, দেবী স্থানে জনতা ততোধিক হইতে থাকিবে।" এইরূপ জ্ঞাপন করিলে দলস্থ সকলেই দেবী দর্শনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

শ্রীশ্রীকামাখ্যাদেবী দর্শন যাত্রা

পাণ্ডবঘাট হইতে মহাদেবীর শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, পথিমধ্যে মন্দিরের প্রবেশ পথের প্রাচীর গাত্রে নানাপ্রকার প্রস্তর খোদিত দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি সকল দর্শন করিয়া ততই মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। মন্দিরের মধ্যে স্থানে স্থানে নানাবিধ সুবৃহৎ বৃক্ষ সকল সারি সারি দণ্ডায়মান থাকিয়া শাখা-প্রশাখাগুলি বিস্তারপূর্ব্বক যেন দেবীর আজ্ঞায়ই পরিশ্রান্ত ভক্তযাত্রীদিগকে স্নিগ্ধ বায়ু ও ছায়া প্রদান করিতেছে। এই সকল প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করিতে করিতে মনের আনন্দে সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়া বাহির

হইতে মহামায়ার ভুবন বিখ্যাত মন্দিরের দৃশ্য দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইলাম।

কামাখ্যাদেবীর মন্দিরটী একটী বৃহৎ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, এবং তিন অংশে বিভক্ত। মন্দিরের দুইটী প্রবেশ দ্বার আছে, এই দুইটী দ্বারই সিংহদ্বার নামে খ্যাত। প্রথম দ্বার হইতে দ্বিতীয় দ্বারটী অনেক দূরে অবস্থিত। দ্বিতীয় দ্বারের সন্নিকটেই শ্মশানভূমি; এই শ্মশান-ভূমিতে কেবল স্থানীয় পাণ্ডাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তাঁহা-দের সৎকার এই স্থানেই সম্পন্ন হয়। অনেক পাণ্ডা এই স্থানে যাত্রী সংগ্রহ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়াছিলাম যে, কামাখ্যায় সর্ব্ব সমেত বিশ ঘর পাণ্ডা স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করেন, পাণ্ডাবৃত্তিই তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায়। যে কামাখ্যা পর্ব্বতে দেবী বিরাজ করিতেছেন, তাহার আশে-পাশে এই সকল পাণ্ডারা বাস করিয়া থাকেন। পাঠকবর্গের প্রীতির জন্য দেবী মন্দিরের একটী চিত্র প্রদত্ত হইল।

এখানকার পাণ্ডাদিগের একটী পঞ্চাইত সভা আছে, গৌহাটীর ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় প্রতি বৎসর এই সভার সভ্যগণকে ডাকাইয়া কোন্ পাণ্ডা কিরূপ উচ্চ হারে খাজনা দিবেন, তাহার একটী সভা হয়। এইরূপে পাণ্ডাদিগের মধ্যে অধিকাংশের ভোটে ৺কামাখ্যা-দেবীর সেবাদি চালাইবার জন্য একজনকে তিনি প্রধান পাণ্ডা পদে নিযুক্ত করেন। সেই প্রধান পাণ্ডা "দলই" উপাধিতে ভূষিত হন। এই দলইয়ের অধীনে দেবোত্তর সম্পত্তির ভারার্পণ হয়। তাহার হিসাবাদি রাখিবার জন্য কর্ম্মচারী আছেন, দেবীর যথানিয়মে সেবার নিমিত্ত পুরোহিত নিযুক্ত আছেন। যে সমস্ত দক্ষিণা এখানে আদায় হয়, উহা পুরোহিত মহাশয়ের প্রাপ্য। প্রণামী ও পূজার দ্রব্যাদি যে সকল

শ্রীশ্রীকামাখ্যা দেবীর মন্দিরের দৃশ্য। [৩০ পৃষ্ঠা]

সংগৃহীত হয়, উহা কামাখ্যা মাতার ভাণ্ডারে জমা হইয়া থাকে। দেবীর যে সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, উহার বাৎসরিক আয় অন্যূন ছয় হাজার টাকা মাত্র। এই সম্পত্তির আয় এবং যাত্রীদিগের প্রণামী ও পূজার দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়লব্ধ মূল্যের দ্বারা যে সমস্ত আয় হয়, তদ্দ্বারা সুচারুরূপে দেবীর সেবা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখানে পাণ্ডাদের যাত্রী-গণের উপর কোনরূপ জুলুম দেখিলাম না; খুসী হইয়া যিনি যাহা প্রদান করেন, তাঁহারা প্রায়ই তাহাতেই সন্তুষ্ট হন। পথিমধ্যে আমাদের পাণ্ডা, দেবীর পূজার নিমিত্ত নৈবেদ্য খরিদ করিবার জন্য মূল্য চাহিলে আমরা তাঁহাকে একটী টাকা প্রদান করিলাম, তিনি ঐ মূল্য হইতে আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্য খরিদ করিয়া সংগ্রহ করিলেন। আমরা কেবল জবা ও পুষ্প মাল্য ইচ্ছামত সংগ্রহ করিলাম, আর স্ত্রীলোকেরা শাঁখা, শাড়ী সাধ্যমত যাহা বাটী হইতে লইয়া গিয়াছিলেন, এই সময় তাঁহারাও পাণ্ডার নিকট ঐ সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী প্রদান করিলেন। এইরূপে সকলে দ্বিতীয় সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশপূর্ব্বক মন্দির মধ্যে যাইবার সময় প্রাচীরের এক স্থানে অলিন্দার মধ্যে একটী মূর্ত্তি নির্দ্দেশপূর্ব্বক পাণ্ডা ঠাকুর বলি-লেন, ভক্তগণ দর্শন করুন, এই মূর্ত্তিটী মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের, এইরূপ কত শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি এখানে দেখিলাম—তাহার ইয়ত্তা নাই; কারণ কাহার কি নাম কিছুই জানিতে পারিলাম না। যাহা হউক, মন্দির পথ অতিক্রমপূর্ব্বক এবার মূলমন্দির মধ্যে উপস্থিত হইলাম, এই স্থানের কিয়দংশ স্থান অন্ধকারময়, সেই অন্ধকার পথটী সাবধানের সহিত পার হইয়া পাণ্ডার উপদেশ মত প্রথমে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী, যাহা "সৌভাগ্য-কুণ্ড" নামে খ্যাত, সেই কুণ্ডের পবিত্র বারি স্পর্শ করিতে অনুমতি করিলেন; তৎপরে সেই পবিত্র বারিস্পর্শে শুদ্ধকলেবরে পাণ্ডার সহিত ভিতরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বলবাহুল্য, পাণ্ডা ঠাকুর সম্মুখবর্ত্তী

হইয়া সেই অসংখ্য যাত্রীর জনতা ভেদ করিতে লাগিলেন, আর আমরা সকলে তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলাম। মধ্যে মধ্যে পুলিস প্রহরীগণের হুঙ্কার রব শুনিতে লাগিলাম।

মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত এক দশভুজা দুর্গা মূর্ত্তি দর্শন পাইলাম। পাণ্ডা ঠাকুর বলিলেন, এই দশভুজা দুর্গা মূর্ত্তিই কামাখ্যাদেবীর প্রতিনিধিস্বরূপ বিরাজিতা। যাবতীয় পর্ব্ব-ক্রিয়া এই মহামায়ার নিকটেই সম্পন্ন হয়। যে প্রকোষ্ঠে এই দশভুজা মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন, সেই প্রকোষ্ঠের ছাদটী শ্রেণীবদ্ধভাবে দ্বাদশটী প্রস্তর স্তম্ভোপরি শোভা পাইতেছে। এই সকল স্তম্ভের দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকস্থ প্রাচীর গাত্রে প্রস্তর খোদিত বিস্তর মূর্ত্তি দেখিতে পাই-লাম, তন্মধ্যে এক স্থানে অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের ও কুচবিহারের রাজাদের মূর্ত্তি আছে। এই দশভুজা দুর্গাদেবীর সন্নিকটেই নাট্যমন্দির শোভা পাইতেছে। তথায় ব্রাহ্মণগণ সমস্বরে বেদ পাঠ করিতেছেন এবং ভক্তগণ গললগ্ন কৃতবাসে মহামায়ার কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন। এই নাট্যমন্দিরের পরই দেবীর বলিদানের স্থান। আমরা স্বচক্ষে দেখিলাম, এখানে হংস, পারাবত প্রভৃতি বলি হইয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। তৎপরে মূল কামাখ্যাদেবীর মন্দির। এই মন্দিরে প্রবেশ এক মহামারী ব্যাপার। সে জনতা ভেদ করিয়া কিরূপে প্রবেশ করিব, ইহাই চিন্তার বিষয় হইল; অবশেষে পাণ্ডার উপদেশ মত পৃথক পাঁচ টাকা ঘুস দিয়া পশ্চাদ্ভাগের দ্বার দিয়া সুস্থ শরীরে প্রবেশ করিলাম। কামাখ্যাদেবীর মূলমন্দিরের চারিদিকে চারিটী প্রবেশ দ্বার আছে, কিন্তু সম্মুখভাগের দ্বারেই জনতা অধিক দেখিলাম; যদিও বহু কষ্টে এই দ্বারদেশে উপস্থিত হওয়া যায়, তথাপি প্রহরীদিগের গুঁতার চোটে অস্থির হইয়া পশ্চাদপদ হইতে হয়।

এই মূল কামাখ্যাদেবীর মন্দির সমভূমি হইতে চারি-পাঁচ হাত নিম্নে অবস্থিত। যাহা হউক, করুণাময়ী কামাখ্যাদেবীর কৃপায় আমরা নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার পীঠস্থান দর্শন করিলাম। বলাবাহুল্য, পশ্চাদ্ভাগের দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিলে বোধ হয়, সেদিন আমাদের ভাগ্যে পীঠ-স্থান দর্শন ঘটিত না। কেবল আমরাই যে এরূপ ঘুস দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলাম—তাহা নয়, আমাদের ন্যায় কত লোক যে এই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, উহা বর্ণনাতীত। মেলার সময় পাণ্ডারা এই উপায় অবলম্বন করিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, মন্দিরাভ্যন্তরে চতুষ্কোণাকৃতি পীঠ স্থান একটী গহ্বর মধ্যে বিরাজিত। উহা লম্বে ছয় ফিট্ এবং প্রস্থে আন্দাজ এক ফুট্ হইবে। পীঠ স্থানটী একখানি শ্বেত প্রস্তরের ন্যায় প্রসারিত অবস্থায় আছেন, সেই প্রস্তরখানির এক পার্শ্বদেশ রৌপ্যের পাত দিয়া বাঁধান। পাণ্ডা ঠাকুর যে নৈবেদ্য, সাড়ী প্রভৃতি আনিয়াছিলেন, উহা মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, তৎপরে জবা ফুল ও পুষ্পমাল্য পাদদেশে স্থাপন করতঃ মহা ব্রত উদ্যাপন করিয়া একটী সিকি ঐ গহ্বর মধ্যে প্রণামীস্বরূপ প্রদান করিলাম। গহ্বরের উপরে স্বর্ণ নির্ম্মিত একখানি বহু মূল্য মুকুট শোভা পাইতেছে। মন্দির প্রাঙ্গণ মধ্যে একটী ক্ষুদ্র জলধারা ইহার এক স্থান হইতে উত্থিত হইয়া ঐ গহ্বর স্থানটীকে প্লাবিত করিয়া বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, উহাই বহির্ভাগে চরণামৃত-রূপে এক কুণ্ডে পতিত হইতেছে। আসল কামাখ্যাদেবীর অন্য কোন প্রকার মূর্ত্তি নাই। এইরূপে মহামায়ার দর্শন ও স্পর্শনসহকারে মনের আনন্দে মন্দির প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সুধারূপ সেই "চরণামৃত" পান করিয়া জীবন সার্থক করিলাম। মন্দিরের সম্মুখভাগে এক বৃহৎ ঘণ্টা দোদুল্য-মান রহিয়াছে, ভক্তগণ প্রদক্ষিণ করিবার সময় ঐ বৃহৎ ঘণ্টায় ঘা দেন,

এবং সাক্ষ্য রাখিয়া আপন আপন আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতে থাকেন।

দেবীর উৎসব

প্রতি বৎসর এই দেবীর বিবিধ প্রকার উৎসব হইয়া থাকে, তন্মধ্যে দুর্গোৎসব, অম্বুবাচী ও পুংসবন, এই তিনটী উৎসবই অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়।

অম্বুবাচী উৎসব—প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিবসে সূর্য্যদেব যে বারে যে সময় মিথুন রাশিতে গমন করেন, তাহার পরের সেই বারে সেই সময়ে পৃথিবী স্ত্রীধর্ম্মিণী হন। জ্যোতিষ পণ্ডিতগণ ইহাকেই অম্বুবাচী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু এখানকার পাণ্ডাদের মত স্বতন্ত্র দেখিলাম; তাঁহারা এই অম্বুবাচী সময়ে কামাখ্যাদেবী রজস্বলা হন বলিয়া প্রচার করেন এবং প্রমাণস্বরূপ এই সময় মহামায়াকে শ্বেত বস্ত্র পরিধান করাইলে উহা রক্তবর্ণ হয়, সাধারণকে উহাও দেখাইয়া থাকেন। এই তিন দিবস বেদাধ্যয়ন ও বীজ বপন নিষিদ্ধ। অম্বুবাচীকালে যদি কোন যতী, বিধবা ব্রহ্মচারী, বা ব্রাহ্মণ স্বপাক বা পরপাক আহার করেন, তাহা হইলে চণ্ডালের পাক অন্ন আহার করিলে যে পাপ স্পর্শে, তাঁহাকে সেই পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

মহামায়ার ঐ রক্তবর্ণ পরিধেয় কাপড়ের এক টুকরা সংগ্রহ করিতে পাণ্ডার কৃপা প্রার্থনা করিতে হয়। কথিত আছে, ঐ রক্তবর্ণ বস্ত্রের এক টুকরা গৃহস্থের বাটীতে থাকিলে কামাখ্যাদেবীর কৃপায় সেই গৃহস্থের সকল দিকে মঙ্গল হয়।

কাশীধামে যেরূপ কুমারী পূজার প্রথা আছে, এখানেও সেইরূপ

সধবা পূজার নিয়ম আছে। একটী সধবার পূজা সেবা সমেত ২॥০ টাকা খরচ, পাণ্ডার নিকটে উহা প্রদান করিলে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, কিম্বা নিজ হইতে সাড়ী, রুলি, লোহা, সিন্দুর, মিষ্টান্নপূর্ণ পিত্তলের থালা একখানি, জলপূর্ণ পিত্তলের গেলাস একটী, এবং পৃথক্ কিছু দক্ষিণা দিতে হয়। ইহাতে খরচ অধিক পরে, সুতরাং আমাদের দলমধ্যে যে কয়জন সধবা পূজা করিয়াছিলেন, তাহারা কেবল ২॥০ মূল্য দিয়া পাণ্ডার নিকট আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী লইয়া পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন।

দুর্গোৎসব—এই দুর্গোৎসবের মহামারী জনতার বিষয় বাঙ্গালী হিন্দুদিগকে নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই পূজার সময় কালীঘাটের জনতা স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

পুংসবন—কামাখ্যাদেবী এবং কামেশ্বর নামে এথানে যে প্রসিদ্ধ মহাদেব বিরাজ করিতেছেন—এই উভয় দেবদেবীর সহিত প্রতি বৎসর পৌষ মাসে কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথিতে অতি সমারোহে বিবাহ উৎসব হয়, এই উৎসবকে পুংসবন উৎসব বলে।

কামাখ্যাদেবীর প্রকাশ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এইরূপ ;—

কুচবিহারের মহারাজ ধর্ম্মাত্মা বিশ্বসিংহ তন্ত্রমধ্যে মহামায়ার যন্ত্র-পীঠের মহিমা পাঠে অবগত হইলেন, এই পীঠস্থান তাঁহারই বিশাল রাজ্যমধ্যে এক স্থানে শৈলশিখরে বিরাজ করিতেছেন। দাক্ষায়নী গুপ্তভাবে যে কোথায় কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কোনরূপে সন্ধান করিতে পারিলেন না, তখন রাজা এক মনে এক প্রাণে প্রায়োপবেশনপূর্ব্বক জগজ্জননীর শ্রীচরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ত্রিরাত্র অতিবাহিত করিয়াও যখন পাষা-

নীর প্রাণে দয়া হইল না দেখিলেন, তখন ব্যাকুল অন্তরে রাজ্যে
নানা স্থানে নানা দিকে দূত সকল তাঁহার সন্ধানে প্রেরণ করিলেন
ইহাতেই যে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন—এমন নয়, স্বয়ং তিনিও দাক্ষায়নী
উদ্দেশে বহির্গত হইয়া স্বীয় বিস্তৃত বিশাল রাজ্যের নানা বনে ও নান
পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই অজানিত দুর্গম পথে তিঃ
যাহাকেই সম্মুখে দেখিতেন, তাহাকেই ব্যাকুল অন্তরে মায়ের বিষ
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই মায়ের সন্ধান বলিতে পারিলে
না। মায়াময়ী, মায়ের মায়া নরে কিরূপে বুঝিতে পারিবে? অবশেষে
তিনি নীলাচলের এক স্থানে এক জঙ্গলপ্রান্তে বিশ্রাম করতঃ হতাশ
প্রাণে কেবল মায়েরই শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হই
লেন, করুণাময়ী দাক্ষায়নী ভক্তের দুরাবস্থা দর্শনে কাতর হইয়া এই
নিভৃত স্থানে তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শনদানে বলিলেন, "বৎস রে! তো
অচলা ভক্তিতে আমি বাঁধা পড়িয়াছি, তাই তোকে দেখিতে আসি
য়াছি। আহা! তোর কোমলপ্রাণে যে সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছিস্, উহ
আমার প্রাণে শেলসম বিদ্ধ হইতেছে। শুন বৎস! আমি ব্রহ্মপুত্র
তটস্থ উচ্চ গিরিশিখরে বিরাজ করিতেছি।" দেবী রাজা বিশ্বসিংহকে
এইরূপে স্বপ্নে দর্শন দিয়াই অন্তর্হিতা হইলেন। মহারাজ স্বপ্নে দাক্ষা
য়নীর দর্শন এবং সন্ধান পাইয়া হৃষ্টচিত্তে পর্ব্বতের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপ
স্থিত হইলেন, এবং নিকটস্থ পাহাড়ীদিগকে উন্মাদের ন্যায় মায়ের সন্ধান
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পাহাড়ীরা সমাগত রাজাকে অভ্যর্থনা
সহকারে বলিল, "হুজুর! আমরা এখানে কখন কোন মা বা বাপকে
দেখিতে পাই না—তবে আমাদের মধ্যে কাহারও কখন বিপদ-আপদ
উপস্থিত হইলে আপনার সম্মুখস্থ যে স্থান হইতে জলস্রোত প্রবাহিত
হইতেছে দেখিতেছেন, ঐ স্থানে ভক্তিপূর্ব্বক মানত করিলে এব

শ্রীমূর্ত্তির আবির্ভাব হয়, তাঁহারই কৃপায় আমরা সকলে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া থাকি।"

রাজা বিশ্বসিংহ তখন মনে মনে বুঝিলেন যে, এই অসভ্য পাহাড়ীরাই মায়ের সুসন্তান, কেন না আমি এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও যখন তাঁহার কৃপার পাত্র হইতে পারিলাম না, আর ইহারা ভক্তিসহকারে মানতপূর্ব্বক একটীবার মাত্র আহ্বান করিলেই স্নেহময়ী অস্থির প্রাণে মূর্ত্তিমতী হইয়া ইহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন, ইহাতেই প্রমাণ পাইতেছে যে, এই সকল পাহাড়ীরা আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান, যখন ইহাদের সন্ধান পাইয়াছি, তখন নিশ্চয়ই ইহাদের সাহায্যেই মায়ের দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হইব, সন্দেহ নাই। রাজা এইরূপ চিন্তায় মগ্ন, এমন সময় পাহাড়ীরা তাঁহাকে পুনর্ব্বার বলিল, "হুজুর, আপনি যগ্যপি কোন বিপদে পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ স্থানে মানত করুন, নিশ্চয় তিনি উদ্ধার করিবেন।"

পাহাড়ীদিগের নিকট মহামায়ার সন্ধান পাইয়া তিনি সেই স্থানে মানতপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে তাঁহারই শ্রীচরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন। এতদিন যিনি গুপ্তভাবে প্রচ্ছন্ন ছিলেন, আজ ভক্তের কাতর প্রার্থনায় তাঁহাকে অস্থির হইতে হইল। যে মহামায়ার মায়ায় জগৎ মুগ্ধ, যে মায়ার জন্য তিনি মায়াময়ী নাম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই মায়ারূপ মায়াদেবীর মায়া আমার ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তি কিরূপে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবে। সে যাহা হউক, দাক্ষায়নী রাজার কাতর প্রার্থনায় প্রসন্নমনে মূর্ত্তিমতী হইয়া বলিলেন, "রাজন! তোমার অচলা ভক্তিতে আমি মুগ্ধা হইয়াছি, অতএব আমার আদেশ মত তুমি এই স্থানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দাও।"

মহারাজ বিশ্বসিংহ দেবীর আদেশ মত ঐ প্রস্রবণটীকে চিহ্নস্বরূপ

মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক এই স্থানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া "যোনি-পীঠ" প্রতিষ্ঠা করিয়া মহামায়ার আজ্ঞা পালন করিলেন। এইরূপে কামাখ্যায় কামাখ্যাদেবীর প্রতিষ্ঠা সংবাদ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইলে পর, একদা কালাপাহাড় সদলবলে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া কামাখ্যাদেবীর কোনরূপ মূর্ত্তি দেখিতে না পাইয়া ক্রোধে মন্দিরটী ধ্বংস করিলেন, এবং স্বস্থানে প্রস্থান করিবার সময় পথিমধ্যে এক দৈববাণী শুনিতে পাইলেন যে, "কালা তোর অত্যাচারে আমি প্রপীড়িতা, তুই সাবধান না হইলে শীঘ্রই ইহার প্রতিফল ভোগ করবি।"

দৈববাণী শ্রবণ করিবামাত্র তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে স্থানীয় দেবদেবীর মন্দির সকল ধ্বংস করিতে লাগিলেন। এইরূপে কালাপাহাড় কর্ত্তৃক কামাখ্যা পর্ব্বতে কামাখ্যাদেবীর মন্দির ধ্বংস হইলে কিছুদিন পর মহা-রাজ শুক্লধ্বজ বহু অর্থ ব্যয়সহকারে ঐ ভগ্ন মন্দিরটী মনের মত সংস্কার করিয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন। পূর্ব্বে রাজাজ্ঞা ব্যতীত কেহ মন্দির মধ্যে কামাখ্যাদেবীর আদি মূর্ত্তি দর্শন করিতে পাইতেন না, কিন্তু এক্ষণে অতি হীন জাতি ভিন্ন সকল হিন্দু ভক্তই অবাধে দেবীর দর্শন পাইয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী

কামাখ্যাদেবীর মূল মন্দিরে যোনিপীঠ-স্থান দর্শন এবং পূজা সমা-পনান্তে পাণ্ডার উপদেশ মত তাঁহারই সহিত এই পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে ভুবন বিখ্যাত শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরীর দর্শন করিলাম। এই উচ্চ গিরি-শৃঙ্গটী যথায় জগদম্বা বিরাজ করিতেছেন, উহা কামাখ্যাদেবীর পূ অপেক্ষা আয়তনে অনেক ছোট। গিরিশৃঙ্গ হইতে যেদিকে দৃষ্টিপাত

করা যায়, সেইদিকেই স্বভাবের অতুল শোভা নয়নগোচর হইতে থাকে, বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিকটীতে দৃষ্টিপাত করিলে সমস্ত গৌহাটী সহরটীর শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। এ প্রদেশের চতুর্দ্দিকেই পাহাড়বেষ্টিত, সুতরাং যখন তখন ভূমিকম্প অনুভব হয়, এই কারণেই উচ্চ গৃহ এখানে নির্ম্মিত হয় না। গিরিশৃঙ্গে ভুবনেশ্বীর পূজার্চ্চনা সমাপ্ত করিয়া মনের সুখে বিশ্রামের জন্য বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

এই দিন সকাল হইতে ক্রমাগত পরিভ্রমণ করিতে করিতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম এবং বেলাও অতিরিক্ত হইয়াছিল, সুতরাং সকলেই বাসাবাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জঠরানল নিবৃত্তির উপায় করিতে ব্যস্ত হইলেন।

অপরাহ্নকালে বিশ্রামের পর এই বাসা বাটীতে যখন সকলে মিলিত হইয়া এক পুরা মজলিসে পরিণত হইল, তখন স্থানীয় অধিবাসীরা এবং আমাদিগের ন্যায় অনেক বিদেশী যাত্রী সকলেই মহানন্দে নানাপ্রকার গালগল্প করিতে আরম্ভ করিলেন; বলাবাহুল্য, আমরাও ইহাতে বাদ পড়ি নাই। এমন সময় স্থানীয় একটী প্রাচীন লোককে দলমধ্যে একজন প্রশ্ন করিলেন, "মহাশয়, আপনাদের দেশে যে স্ত্রীলোকেরা বিদেশী লোক পাইলে যাদু করে, তাহাকে কোনরূপে ছাড়ে না, একথা কি সত্য?" তদুত্তরে তিনি হাস্যসহকারে বলিলেন, "ও কথা কি আপনারা বিশ্বাস করেন? এই যে কয়দিন আপনারা এখানে অবস্থান করিয়া চারিদিক্ পরিভ্রমণ করিতেছেন, তাহা হইলে একবারও কি আপনারা তাহাদের নয়নপথে পতিত হইতেন না; ও সব বাজে কথা, বহুকাল পূর্ব্বে এইরূপ একটী গুজব কথা শুনা যাইত বটে, কিন্তু এক্ষণে ইংরাজরাজের সুশাসন গুণে আর ও সব কথা কিছু শুনিতে পাওয়া যায় না; যদিও কোন কোন প্রাচীন লোকের ঐরূপ বিদ্যা জানা

আছে, তথাপি তাহারা রাজার শাসন ভয়ে উহা কোনরূপে বাহিরে প্রকাশ করিতে সাহস করেন না। এই কামরূপ জেলা অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে এক জঙ্গলাকৃত পর্ব্বতের মধ্যে কতকগুলি পাহাড়ীরা বাস করে, তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল স্ত্রীলোকদিগের বর্ণ এত সুন্দর, যেন দুধে আল্‌তা গোলা ; শুনিয়াছি, তাহারাই পর পুরুষ পাইলে অত্যন্ত যত্ন করিয়া থাকে ; কিন্তু ঐ সকল স্ত্রীলোকের মুখশ্রী নয়নগোচর হইলে আমাদের বাঙ্গালা দেশের লোকের অভক্তি হয়। যদি কখন কোন লোক পথ ভ্রান্ত হইয়া এই অপরিচিত স্থানে তাহাদের কবলে পতিত হন বা আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহাদের যত্নে মুগ্ধ হইয়া আরও নিরুপায় হইয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বাধ্য হইয়া তাহাদের সহিত বাস করিতে থাকেন, আবার সেই ব্যক্তি যদি কখন জীবনের মধ্যে সুবিধা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তখন স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্বজনগণের নিকটে আপনাকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করাইবার জন্য মনোমত যাহা ইচ্ছা, তাহাই প্রচার করেন, ইহাই আমার বিশ্বাস। ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাবতী, মায়াবিনী মানবীগণ যে এখানে কোথায় আছে, তাহা কখন কাহারও মুখে শুনিতে পাই নাই।"

তৎপরে বশিষ্ঠাশ্রমের বিষয়ও উঠিল। এই বশিষ্ঠাশ্রমের অপূর্ব্ব কাহিনী শ্রবণ করিয়া বাসাস্থ সকলেই ঐ পবিত্র আশ্রম দর্শন করিবার জন্য উৎসুক হইলাম। বশিষ্ঠাশ্রমে যাইতে হইলে কামাখ্যা হইতে সাত মাইল গো-শকটে যাইতে হয়।

পর দিবস বশিষ্ঠাশ্রম যাইবার জন্য আয়োজন করিতেছি, এমন সময় পাণ্ডা ঠাকুর সধবা পূজা সম্পন্ন করাইবার জন্য তাঁহার বাটীতে যাবতীয় যাত্রীদিগকে আহ্বান করিলেন। আমরাও সকলেই সধবা পূজা

করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম, সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার বাটীতে গিয়া যত শীঘ্র পারিলাম—সধবা পূজা সম্পন্ন করিলাম। এখানে এই পাণ্ডাদিগের প্রত্যেক বাটীতে একটী মোটা ফাঁপা বাঁশের চোঙ্গা গৃহমধ্য হইতে বহির্ভাগ পর্য্যন্ত সংলগ্ন আছে; অনুসন্ধানে ইহার কারণ জানিতে পারিলাম যে, রাত্রিকালে ব্যাঘ্রের ভয়ে কেহ বাটী হইতে বাহিরে আসেন না, কিন্তু যদি কাহারও এই সময় মধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে বাটীর মধ্যে উহা ত্যাগ করিয়া ঐ মোটা চোঙ্গার সাহায্যে সেই অপদার্থ বিষ্ঠা বাহিরে নিষ্ক্রান্ত করিয়া থাকেন; ইহাই এখানকার নিয়ম। এইরূপে পাণ্ডাদের বাস ভবনের শোভা এবং সধবা পূজা সমাপনান্তে এখান হইতে বশিষ্ঠাশ্রম যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এখানকার পাণ্ডাদের পরিচয়ে জানিতে পারিলাম যে, তাঁহারা সকলেই নবদ্বীপবাসী বাঙ্গালী।

ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য

শান্তনু নামে এক তপোনিষ্ঠ মুনি ভার্য্যাসহ ব্রহ্মসাগর তীরস্থ গন্ধমাদন পর্ব্বতোপরি আপন আশ্রমে বাস করিতেন। একদা শান্তনু পূজার জন্য পুষ্পচয়ন করিতে গমন করিলে ব্রহ্মা কোন কারণবশতঃ ঐ আশ্রম স্থান দিয়া গমন করিবার সময় শান্তনুর নবযৌবন সম্পন্না সুন্দরী ভার্য্যার অপরূপ রূপ দর্শনে মুগ্ধ হন, এবং কামান্ধ হইয়া হিতাহিত জ্ঞানশূন্যসহকারে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে, সাধ্বীসতী এই অপরিচিত পরপুরুষের গর্হিত কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া কোপান্বিত-কলেবরে তাহাকে বলিলেন, "মনে রাখুন, আমি মুনিপত্নী। তোমার গলে আবার যজ্ঞপবীত দেখিতেছি, তুমি জ্ঞানী হইয়াও যদ্যপি এইরূপ

গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় তোমায় রূঢ় অভি-সম্পাৎ প্রদান করিব।”

এই কথা বলিয়া তিনি ভয়ে তৎক্ষণাৎ ধর্ম্ম রক্ষা করিবার মানসে স্বীয় আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করতঃ অর্গলাবদ্ধ করিলেন। এদিকে ব্রহ্মা যুবতীর তেজোদ্দীপ্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ রুদ্ধ দ্বারদেশে আপন বীর্য্য স্খলন করতঃ সুস্থ শরীরে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মুনিবর পুষ্পচয়ন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে আপন আশ্রমের দ্বারদেশে অগ্নি তুল্য দীপ্য-মান তেজ দেখিতে পাইয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং আপন পত্নীকে ইহার সবিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলেন।

শান্তনু-পত্নী অমোঘা, স্বামীর সাদর সম্ভাষণে বিনীতভাবে আদ্যো-পান্ত সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “স্বামিন্! যদি আপনি ইহার কোনরূপ প্রতিকার না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় ঐ চরণে ভক্তি রাখিয়া প্রাণ ত্যাগ করিব।”

শান্তনু অমোঘার নিকট যাহা শ্রবণ করিলেন, উহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ধ্যানে মগ্ন হইলেন, এবং যোগবল অবলম্বনে অবগত হইলেন যে, দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য আরও জগতের উপকারার্থে সর্ব্বলোক পিতামহ “ব্রহ্মা” একটী তীর্থের অবতারণা করিবার মনস্থ করিয়া এই-রূপ লীলা করিয়াছেন। তখন শান্তনু শোকাতুরা পত্নীকে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রিয়া অমোঘাকে উপ-দেশছলে বলিলেন, “পুরাকালে “বাক” নামে প্রজাপতি জগতের মঙ্গলের জন্য একদা লীলাপ্রকাশ করিবার জন্য কামান্ধচিত্তে স্বকন্যাতে উপগত হইবার স্পৃহা করিলে পুত্রী তাঁহার কামিতাভাব বিলোকনপূর্ব্বক লজ্জিতা হইয়া রোহিত (হরিণ বিশেষ) রূপ ধারণ করিয়াছিল, তদ্দর্শনে ব্রহ্মাও হরিণরূপ ধারণ করিয়া তাহার অনুগমন করিতেছিলেন; মহেশ্বর

এই অদ্ভুত ঘটনা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, ক্রোধে উন্মত্তের ন্যায় পিনাক লইয়া শরপ্রয়োগে সেই হরিণের মস্তক ছেদন করিলে, হরিণরূপধারী ব্রহ্মার দেহ হইতে এক মহাজ্যোতি বিনির্গত হইয়া জগতের হিতের জন্য আকাশ মার্গে মৃগশীর্ষা নক্ষত্র নামে উদিত হইলেন, তদ্দর্শনে শঙ্কর রোষে আর্দ্র নক্ষত্ররূপী হইয়া অম্বরে মৃগব্যাধিরূপী ত্রিপুরান্তক মৃগ-শীর্ষান্তিক রূপে তথায় উদয় হইয়া সেই কামুক প্রজাপতি পিতার লীলার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতে লাগিলেন, এইরূপে তাঁহারা আকাশমার্গে উদিত হইয়া জগতের হিতসাধন করিতেছেন। অতএব প্রিয়ে! ব্রহ্মার ঐ তেজ জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত তোমায় পান করিতে অনুরোধ করিতেছি।"

ইহা শুনিয়া অমোঘা মহা চিন্তান্বিতা হইলেন। কারণ কিরূপে পতি বাক্য অবহেলা করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইবে, আবার কিরূপেই বা পরপুরুষের বীর্য্য জ্ঞানত জানিয়া-শুনিয়া পাপ করিবে; এইরূপ নানা-প্রকার চিন্তা করিয়া শান্তনুকে বলিলেন, "প্রভো! পতিই আমার দেবতা। পতি বাক্য অমান্য করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইবার বাসনা আমার নাই, কিন্তু আপনি বিচার করিয়া দেখুন; আমি জ্ঞানত পর পুরুষের বীর্য্য কিরূপে সেবন করিব? আমার সবিনয় প্রার্থনা এই যে, ঐ রেত প্রথমে আপনি পান করিয়া আমাতে অনুরক্ত হউন, তাহা হইলে সকল দিক্ই বাজায় হইবে।"

শান্তনু পত্নীর যুক্তিপূর্ণ বাক্যে প্রীত মনে তদনুসারে কার্য্য করিলেন।

কালের গতি কে রোধ করিতে পারে, অমোঘা যথাসময়ে পূর্ণগর্ভা হইয়া জলরাশিসহ এক পূর্ণকান্তি সর্ব্বলক্ষণযুক্ত ব্রহ্মার সদৃশ পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্র প্রসব হইবার পূর্ব্ব হইতে মুনিবর ধ্যানযোগে সমস্ত

অবগত হইয়া উত্তরে কৈলাস পর্ব্বত, দক্ষিণে গন্ধমাদন পর্ব্বত, পূর্ব্বে সম্বত্তক পর্ব্বত ও পশ্চিমে জারুধি পর্ব্বত। এই চারি পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটী প্রকাণ্ড কুণ্ড খনন করিয়া রাখিয়াছিলেন। যথাকালে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তিনি জলরাশিসহ ঐ জাতক পুত্রটীকে সেই কুণ্ডে স্থাপিত করিলেন। এদিকে সর্ব্বজ্ঞ "ব্রহ্মা" পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, জানিতে পারিয়া শান্তনু কর্তৃক যে পর্ব্বত চতুষ্টের মধ্যবর্ত্তী স্থানে পুত্র স্থাপিত হইয়াছিল, তথায় গমন করতঃ ঐ পুত্র মুখ দর্শন করিলেন, এবং প্রীত মনে তাহার দেহ শুদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া লৌহিত্য নামে জনসমাজে তাহাকে খ্যাত করিলেন। এইরূপে লৌহিত্য কিছুকাল কুণ্ডমধ্যে অবস্থান করিয়া একদা বারিরূপে যোজন প্রমাণ আপন দেহ বিস্তার করিলেন। এতাবৎকাল লৌহিত্য যে কুণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন, মুনিবর ঐ কুণ্ডের নাম ব্রহ্মকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ করিলেন।

পরশুরাম—যিনি ভগবানের যোড়শাবতার বলিয়া খ্যাত, যিনি জমদাগ্নির ঔরসে বিদর্ভরাজের কন্যা রেণুকার গর্ভে দেবগণের কাতর প্রার্থনায় মহাবীর্য্য এবং মহাধনুর্দ্ধর ক্ষত্রিয় বীর "কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন"কে বিনাশ করিবার জন্যই তাঁহার পঞ্চম গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি পরশুসহ জন্ম গ্রহণ করাতে পরশুরাম নামে খ্যাত হন, যে পরশুরাম জন্মাবধি এক দণ্ড কথনও তাঁহার মূল অস্ত্র "পরশু"কে ত্যাগ করিতেন না, যিনি ধনুর্ব্বিদ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন; সেই পরশুরাম একদা কোন বিশেষ কারণবশতঃ পিতা জমদাগ্নির আদেশে স্নেহময়ী গর্ভধারিণীর শিরচ্ছেদন করিবামাত্র মাতৃহত্যা মহাপাপে লিপ্ত হন, তদ্দ্বারা তাঁহার হস্তস্থিত পরশু অস্ত্র সংবদ্ধ হইয়া যায়; যিনি বহু চেষ্টা করিয়াও উহা স্খলিত করিতে পারেন নাই; যে পুত্র উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া জগৎকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন যে—মাতার ন্যায়

শ্রেষ্ঠ গুরু ধরায় আর দ্বিতীয় নাই, কিন্তু পিতা যখন সেই পরম পূজনীয়া মাতার গুরু, তখন শ্রেষ্ঠ গুরু পিতার বাক্য কিরূপে লঙ্ঘন করিব? যাঁহার যুক্তিপূর্ণ বাক্যে এবং অদ্ভুত পিতৃভক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া জমদগ্নি সন্তুষ্টচিত্তে তাহার অনুরোধে অপরাপর শাপগ্রস্ত পুত্রদিগকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন; যাহার কাতরোক্তিতে রেণুকাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া আপন মহিমা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আবার যাহার প্রার্থনায় জমদগ্নির বরপ্রভাবে রেণুকা, যে পরশুরাম কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই; পরশুরাম মাতৃহত্যা মহাপাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াও কিছুতেই নিষ্পাপ হইতে পারেন নাই। শেষ পিতার উপদেশ মত এই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিবামাত্র তীর্থপ্রভাববশতঃ মুক্তি পাইয়া হস্তসংবদ্ধ পরশু অস্ত্র স্খলিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; যে ভগবান পরশুরাম এই পবিত্র কুণ্ডের মাহাত্ম্য দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং ইহাকে তীর্থ শ্রেষ্ঠ জানিতে পারিয়া পাপীদিগের মুক্তির নিমিত্ত আপন অমোঘ অস্ত্র "পরশু" দ্বারা পথ প্রস্তুতপূর্ব্বক ঐ পবিত্র কুণ্ডের জল মর্ত্তলোকে আনয়ন করিয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন; যে কুণ্ড হইতে এই জলধারা প্রবাহিত হইয়াছে, মর্ত্ত্যলোকে তিনিই ব্রহ্মপুত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

ব্রহ্মপুত্রে ভক্তিসহকারে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান, পিতৃপুরুষদিগের মুক্তি কামনা করিয়া তর্পণ করিলে, ভগবান পরশুরামের কৃপায় অন্তে তিনি অব্যর্থ বৈকুণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হয়। ইহাতে অমন্ত্রক স্নান করিলেও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। যে ব্রহ্মপুত্রের এত মাহাত্ম্য, সেই ব্রহ্মপুত্রে ভক্তিসহকারে মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক স্নান এবং পিতৃপুরুষদিগের উদ্ধার কামনা করিয়া কাহার না তর্পণ করিতে ইচ্ছা হয়? প্রতি চৈত্র

মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ সকল ব্রহ্মার আদেশে এই ব্রহ্মপুত্র নদে আগমন করিয়া থাকেন; এই কারণে ঐ সময় দলে দলে কাতারে কাতারে কত দূরদেশ হইতে কত সাধু, কত সন্ন্যাসী এবং কত ভক্তগণ আপন মুক্তি কামনা করিয়া ইহাতে ভক্তিসহকারে স্নানপূর্ব্বক জীবন সার্থক বোধ করিয়া থাকেন। এইরূপে ভগবান পরশুরামের কৃপায় ব্রহ্মকুণ্ড হইতে ব্রহ্মপুত্র মর্ত্ত্যধামে আবির্ভাব হইয়াছেন।

আমরা বেলা ৯ ঘটিকার সময় পাণ্ডার বাটী হইতে বশিষ্ঠাশ্রমে যাত্রা করিব, ইহা অবগত হইয়া পাণ্ডা ঠাকুর উপদেশ দিলেন, অদ্য উক্ত আশ্রমে যাত্রা বন্ধ করুন, কারণ এখন বেলা অধিক হইয়াছে, এখান হইতে তথায় পৌঁছিতে তিন-চারি ঘণ্টা সময়ের কম হইবে না; অতএব আমার কথামত অদ্য ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে যে সকল তীর্থ স্থান আছে, উহাই দর্শন করুন এবং আগামী কল্য প্রাতে যাহাতে বশিষ্ঠাশ্রমে যাওয়া হয়—তাহার জন্য প্রস্তুত হইবেন। পাণ্ডার উপদেশ মত সকলেই উহাতে স্বীকৃত হইলাম; তখন পাণ্ডা ঠাকুর তাঁহার অধীনস্থ সকল যাত্রীগুলিকে এক সঙ্গে তথায় যাত্রা করিতে অনুরোধ করিলেন, অধিকন্তু তিনি নিজেও আমাদের সহিত যাইবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

কামরূপ বা ভস্মাচল দর্শন যাত্রা

দেবাদিদেব মহাদেব যখন এই স্থানে তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন, তখন রতিপতি কামদেব পঞ্চাননের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া কন্দর্প নাম অর্জ্জন করেন। কামদেব ব্রহ্মার মন হইতে স্ত্রী পুরুষের ক্রীড়ার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি ব্রহ্মা প্রদত্ত যে পঞ্চ

কামরূপে ব্রহ্মপুত্র নদের নৌকার দৃশ্য। [৪৭ পৃষ্ঠা]

শর উপহার পাইয়াছেন, তাহারই প্রভাবে স্ত্রীপুরুষদিগকে ক্রীড়ার পুত্তলের ন্যায় কামাতুর করিতে সক্ষম হন, এমন কি দেববেবীরা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট সতত পরাস্ত, এই কারণে কামদেব একদা দেবকার্য্য-সাধনের নিমিত্ত দর্পসহকারে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যাইয়া ভগবান ত্রিলোচনের রোষাগ্নিতে এই স্থানে তিনি ভস্মীভূত হন। এই নিমিত্ত এই পর্ব্বতের নাম ভস্মাচল হইয়াছে, আবার শেষ যে স্থানে তিনি স্বরূপত্বলাভ করিয়াছিলেন, সেই স্থান কামরূপ নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

কামরূপ পাহাড়টী উমানন্দ নামক স্বয়ম্ভু "লিঙ্গরাজ"কে মস্তকে স্থাপিত করিয়া ব্রহ্মপুত্র নামক নদের উপরিভাগে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া ভগবানের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। এই উমানন্দ ভৈরব-নাথকে দর্শন করিতে যাইতে হইলে নৌকা বা ডোঙ্গার সাহায্যে যাইতে হয়। অদ্য এখানে যতগুলি তীর্থ স্থান দর্শন করিব—সকল-গুলিই এই নদের মধ্যভাগে অবস্থিত, সুতরাং সমস্ত তীর্থ স্থানগুলি দর্শনের নিমিত্ত নৌকা ভাড়া করা হইল। পাঠকবর্গের প্রীতির জন্য এখানকার নৌকার দৃশ্য প্রদত্ত হইল।

ব্রহ্মপুত্রের তীর হইতে এই কামরূপ পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া উমানন্দ মহাদেবের দর্শন আশে পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিবার সময়, ইহার বাম পার্শ্বে একটী নির্জ্জন গুহা দেখিতে পাইলাম, এবং পাণ্ডা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, এই জনশূন্য গহ্বরটীর মধ্যে যদ্যপি ব্যাঘ্র থাকে, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে কত লোকের অনিষ্ট করিবে—তাহার ইয়ত্তা নাই, আপনাদের দেশে যেরূপ ব্যাঘ্রের উৎপাত শুনিতে পাই—তাহাতে প্রাণে ভয় হয়।"

তখন পাণ্ডা ঠাকুর মৃদু হাস্যসহকারে বলিলেন, "যদ্যপি আপনাদের

ভয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি অগ্রগামী হই, আপনারা আমা পশ্চাদ্গামী হউন, বাবু! উহা আর কিছুই নয়, তবে সময় মত সা সন্ন্যাসীরা এই স্থানে আসিলে এই গুহাটীতেই বাস করিয়া থাকেন।”

এই ভস্মাচল পর্ব্বতে উঠিবার সোপানগুলি অত্যন্ত সতর্কের সহিত উঠিতে বা নামিতে হয়। আমরা সকলেই এই অপ্রশস্ত সোপানশ্রেণীর সাহায্যে দেবতার মন্দির প্রাঙ্গণে নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, এখানে দুইটী মন্দির বিরাজিত। একটীতে ভগবান উমানন্দ স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন, অপরটীতে এই দেবেরই নাট্যমন্দির। উৎসব কালে এই নাট্যমন্দিরে নৃত্য গীত হইয়া থাকে। মূলমন্দিরটী যদি পর্ব্বতোপরি ফাঁকা স্থানে মহারাজ বিশ্বসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু মন্দিরাভ্যন্তরটী দিবাভাগেই আলোক ব্যতীত গমনাগমন করা দুরূহ। ইহার প্রধান কারণ এই যে, নৃত্য মন্দিরটী সমতলভূমি অপেক্ষা মূলমন্দিরের গর্ভ স্থান পর্য্যন্ত অত্যন্ত নিম্নভাগে অবস্থিত। এই গর্ভ স্থানেই ভগবান উমানন্দ ভৈরব লিঙ্গরূপে বিরাজ করিতেছেন। শিবরাত্রির সময় এই স্থানে ভক্তগণের এত সমাগম হয় যে, এই স্থান এক মহামেলায় পরিণত হয়। উমানন্দদেবের মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে কর্ম্মনাশা নামে এক গিরিশৃঙ্গ আছে। কথিত আছে যদ্যপি দৈবাৎ কেহ সেইদিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে এখান যাবতীয় তীর্থফল সমস্তই নাশ হয়। এই নিমিত্ত ঐ স্থানের নাম কর্ম্মনাশা হইয়াছে।

উর্ব্বশী-কুণ্ড

উমানন্দ পাহাড়ের সন্নিকটেই উর্ব্বশীগিরি, সাধারণে উহাকে উর্ব্বশী-কুণ্ড বলিয়া থাকেন। এই কুণ্ডটী ব্রহ্মপুত্র নদের নির্দ্দিষ্ট ঘাটের সন্নিকটে কিছু উপরিভাগে অবস্থিত। পাণ্ডার নিকটে উপদেশ পাইলাম, ঐ কুণ্ডটী এক্ষণে নদের গর্ভে বিলীন। পাণ্ডা ঠাকুর কুণ্ড স্থানটী নির্দ্দেশ করিলে আমরা সকলে সেই স্থানের পবিত্র জল স্পর্শ করিলাম। এখানে বিষ্ণুর পদচিহ্ন থাকায় ভক্তগণ পিতৃপুরুষদিগের মুক্তি কামনা করিয়া পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। এই জলমগ্ন কুণ্ডের স্থান নিরূপণ করিবার জন্য পাণ্ডারা এখানে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং ঐ মূর্ত্তিটীকে উর্ব্বশী নামে বিখ্যাত করিয়াছেন।

অশ্বক্লান্ত দেবালয়

এই দেবালয়টী ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তটে চিত্র পর্ব্বতের উপরিভাগে অবস্থিত। গৌহাটী পদপ্রান্তে ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগিরি নানাবিধ বৃক্ষলতা পরিশোভিত হইয়া বিরাজ করিতেছে, অশ্বক্লান্ত দেবালয়টী ঐ সকল উপগিরির মধ্যে একটী গিরি বিশেষ। প্রবাদ এইরূপ যে,দ্বাপরযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীদেবীকে হরণ করিয়া, যখন দ্বারকা প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তাঁহার অশ্ব সকল অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, এই স্থানে তিনি বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত এই স্থানের নাম অশ্বক্লান্ত হইয়াছে। এই পাহাড়ের উপরিভাগে প্রস্তরোপরি সেই সকল ক্লান্ত অশ্বদিগের পাষাণ মূর্ত্তি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই অত্যুচ্চ পর্ব্বতে উঠিবার জন্য পর্ব্বত গাত্রে সোপনা-

গুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে নির্ম্মিত আছে, এবং ইহার মধ্যে মধ্যে কতকগুলি গুহাও আছে, ঐ সকল গুহা মধ্যে নানাবিধ অঙ্গহীন অবস্থায় দে মূর্ত্তিগুলি দর্শন পাওয়া যায়।

চিত্র পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিয়া একটী মন্দির দেখিতে পাইলাম। ইহা দুইটী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। প্রথম প্রকোষ্ঠের প্রাচীর গাত্রে কৃষ্ণপ্রস্তর খোদিত দশ মহাবিদ্যার মূর্ত্তি বিরাজিত; এই দশ মহা বিদ্যার মন্দির সংলগ্ন আর একটী মন্দির আছে, তন্মধ্যে ভগবান কূর্ম অবতারের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন পাওয়া যায়। এখানে মন্ত্রপাঠসহকারে সঙ্কল্প পূর্ব্বক দেবতার পূজা দিবার নিয়ম আছে, কিন্তু পূজারী সঙ্গে করিয়া না আনিলে কিরূপে কাহার সাহায্যে দেবার্চ্চনা হইবে? অতএব এই তীর্থে আসিবার সময় একজন পূজারী সঙ্গে থাকা আবশ্যক। দেবালয়ের প্রথম প্রকোষ্ঠের পর দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠটীতে ভগবান জনার্দ্দন অনন্তফণার উপর অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া ভক্তদিগকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন, এবং স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। এই প্রকোষ্ঠদ্বয়ের সন্নিকটেই একটী দোলমঞ্চ আছে, দোলযাত্রা উৎসব সময় এই মঞ্চমধ্যে ভগবান জনার্দ্দনের দোললীলা অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। চিত্র গিরিটী অন্যূন অর্দ্ধ মাইল স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। দেবালয়ের উত্তরদিকে একটী নিভৃত স্থানে কমলদল সুশোভিত কানন দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় ময়ূর, ময়ূরী, পাপীয়া, কোকিল প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ সমস্বরে উচ্চ রব তুলিয়া যাত্রীদিগকে জনার্দ্দনের শ্রীচরণে ভক্তিদান করিতে উপদেশ দিতেছে। আহা, কি মনোরম সুন্দর দৃশ্যাবলী! প্রকৃতির অনন্ত শোভা সম্পদময় কি প্রেমপূর্ণ নির্জ্জন স্থান! এই স্থানে উপস্থিত হইলে ক্ষণেকের জন্য সংসার মায়া ভুলিয়া কেবল ভগবানের বিভূতি দর্শন করিয়া জীবনের

শেষ ভাগ অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা হয়। কৃপাময় জনার্দ্দনের কৃপা না হইলে কি কেহ কখন এই পুণ্য স্থানে আসিতে পারেন ?

এই সকল তীর্থ স্থানে দেবতাদিগের দর্শন ও অর্চ্চনা করিয়া সেদিন-কার মত বাসা বাটীতে প্রত্যাগমন করিলাম, কারণ বেলা অতিরিক্ত হওয়ায় ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াছিলাম। আরও পাণ্ডা ঠাকুর উপ-দেশ দিলেন, "এখানে অন্যান্য যে সমস্ত তীর্থ স্থান আছে, উহার মধ্যে সকলগুলিই নদের পরপারে গৌহাটী সহরের দিকে অবস্থিত ; অতএব আপনারা আগামী কল্য বশিষ্ঠাশ্রম দর্শনপূর্ব্বক আমার নিকটে সংবাদ পাঠাইলে, আমি এমন একটী বিশ্বস্ত লোক আপনাদের সঙ্গে দিব, যিনি আমার অপেক্ষা আপনাদিগকে যত্নসহকারে পরপারের তীর্থ সকল দর্শন করাইয়া গোহাটী ষ্টীমার ঘাটে পৌঁছাইয়া দিবেন, তাহা হইলে আর আপনাদের উজান বহিয়া এই স্থানে আসিতে হইবে না, কারণ আপনা-দের দলে লোক অধিক থাকাতে বাসা ভাড়া অত্যন্ত বেশী পড়িতেছে।" তাঁহার যুক্তিপূর্ণ বাক্যে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া পরদিন প্রাতে বশিষ্ঠাশ্রমে যাত্রার নিমিত্ত গো-শকট ভাড়া করিলাম, এবং তথায় আহারীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিবার জন্য ক্ষণেকের নিমিত্ত হুরাহুরি আরম্ভ করিয়া ব্যস্ত হইলাম। কারণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলাম, বশিষ্ঠাশ্রমে খাদ্য-সামগ্রী দুষ্প্রাপ্য।

বশিষ্ঠাশ্রম

বাসা বাটী হইতে বশিষ্ঠাশ্রম অন্যূন সাত মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে দোকান পাঠ, হাট বাজার কিছুই নাই। এই সাত মাইল পথ গো-শকটে যাইতে হয়। মেলার সময় একখানি গো-যান ২॥০ সিকা ভাড়ার কম পাওয়া যায় না, কিন্তু অপর সময় ১॥০ সিকা ভাড়ায় পাওয়া যায়। এই আশ্রমটী ব্যতীত তথায় অন্য কোন লোকালয় নাই। কামাখ্যা হইতে এই সাত মাইল পথের মধ্যে চারি মাইল গৌহাটী সহরের মধ্য দিয়া মাঠের উপর অপ্রশস্ত রাস্তার সাহায্যে যাত্রা করিতে হয়, অবশিষ্ট তিন মাইল জঙ্গলের ভিতর পর্ব্বতময় পথ দিয়া যাইতে হয়। প্রাতে সাতটার সময় গো-যানে আরোহণ করিয়া বেলা [illegible]টার সময় তথায় পৌঁছিলাম। এই দীর্ঘকাল গো-যানে যাত্রা ক[illegible] দেহ যেন আরষ্ট হইল। জঙ্গল ও পর্ব্বতের মধ্যপথে যাইবার সময় কেবল ব্যাঘ্রের বোট্‌কা গন্ধ পাইয়া অত্যন্ত ভয় হইল; কারণ যে ভয়াবহ স্থান দিয়া যাইতেছি, উগ্র ব্যাঘ্র, মহিষ, হস্তী প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাস-ভূমি ব্যতীত অপর কাহারও বাস স্থান হইবার সম্ভাবনা নয়। মেলার সময় বলিয়া আমাদের ন্যায় এখানে কত যাত্রী, কত গো-যান যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভরসার মধ্যে এই যাত্রীসমাগম ব্যতীত বিপদ

বশিষ্ঠাশ্রমের দৃশ্য। [৫৩ পৃষ্ঠা]

Sulov Press.

টিলে বাঁচিবার অপর কোনরূপ উপায় নাই, এইরূপে অতি কষ্টে বশিষ্ঠাশ্রমে উপস্থিত হইলাম। আশ্রমটী পরম পবিত্র এবং নির্জ্জন। এই আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে মন যেন ভগবচ্চরণে রত হয়, এবং সেই পরম পুরুষ ভগবানের তপস্যা করিয়া জীবনের শেষ ভাগ এই স্থানেই অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা হয়।

আশ্রমের পূর্ব্বদিকটী নিবিড় অরণ্যপূর্ণ, প্রায় সকল বৃক্ষগুলিই বড়; পশ্চিমদিকে আশ্রমের অনতিদূরে চা-করদিগের চা-বাগান। এখানে ব্যাঘ্র, সর্প ও জোঁকের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, পূর্ব্ব হইতে এইরূপ উপদেশ পাইয়া সকলেই সাবধানে ছিলাম, এবং এই নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে সকলেই সমস্বরে "জয় বশিষ্ঠ মহামুনি কী জয়" শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া আশ্রমটী প্রতিধ্বনিত করিতেছিলাম। বশিষ্ঠাশ্রমের উপরস্থ বন মধ্য পথ দিয়া ঝরঝর নাদে একটী প্রস্রবন সবেগে আসিয়া এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তরোপরি পতিত হইয়া দ্বিধারা হইতেছে, ঐ দুই ধারার মধ্যে একটী ধারা আবার অপর একখানি প্রস্তরে বাধা পাইয়া দুইদিকে বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। দৃশ্যটী এই নির্জ্জন আশ্রমের শোভা অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছে। পাঠকবর্গের প্রীত্যর্থে এবং বুঝিবার সহজ উপায়ের জন্য এই স্থানে সেই আশ্রমের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

বশিষ্ঠাশ্রমে ব্যাসদেবের মন্দিরটী একটু উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত, মন্দিরের সম্মুখে করোগেট টীনের ছাদযুক্ত একটী নাটমন্দির আছে, ইহার পার্শ্বে দুইটী কুটরী ও একটী বারান্দাযুক্ত করোগেট টীনের একখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। লোকালবোর্ড হইতে যাত্রীগণের বিশ্রামের জন্য ঐ ঘরটী প্রস্তুত হইয়া যে কত উপকার হইয়াছে, উহা বর্ণনাতীত।

একটী প্রস্রবন হইতে যে তিনটী ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, মন্দিরের

নিম্নে পর্ব্বতবেষ্টিত স্থানে উহা ত্রিধারা গঙ্গা নামে খ্যাত; কিন্তু এই তিনটী ধারা আবার পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হইয়াছে; যথা—সন্ধ্যা, ললিতা ও কান্তা। এই সকল জলধারাগুলি প্রস্তরোপরি প্রবাহিত হওয়ায় এবং ঐ সকল প্রস্তরখণ্ডগুলি জলমগ্ন না হইয়া এক একটী গিরিশৃঙ্গের ন্যায় জাগিয়া অতীত ঘটনার সাক্ষ্য দিতেছে। কথিত আছে, ঐ সকল পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর বসিয়া মহামুনি বশিষ্ঠদেব তপস্যা করিতেন। এক্ষণে যাত্রীগণ অদ্যাপিও সেই বশিষ্ঠদেবের একটী পবিত্র পাষাণময় মূর্ত্তি দর্শন পাইয়া থাকেন, আর এই পবিত্র মূর্ত্তির দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া ভক্তগণ এই ভয়াবহ স্থানে আসিয়া থাকেন। যে বশিষ্ঠ ব্রহ্মার প্রাণ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহার ক্রোধাগ্নিতে পতিত হইয়া বামদেবকে গুহক চণ্ডালরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, যিনি ইক্ষ্বাকু বংশীয় সূর্য্যকুল পুরোহিত ছিলেন, যে মহাতপা বশিষ্ঠের অভিশাপে ভগবান মহেশ্বরকে ম্লেচ্ছরূপে বিহার করিতে হইয়াছিল, এবং দেবী উগ্রতারা বিরুদ্ধভাবে পূজিত হইয়াছিলেন, আজ সৌভাগ্যক্রমে সেই দেবের পাষাণময় পবিত্র মূর্ত্তি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করিলাম।

ভগবান বশিষ্ঠদেব যখন এই স্থানে অবস্থান করিতেন, তখন এই আশ্রমটী নানাবিধ ফল ফুলে সুসজ্জিত ছিল। এক্ষণে যৎসামান্য আম্র, কাঁঠাল, কদলী বৃক্ষ এবং ফুল, তুলসী ও জবা বৃক্ষাদি দণ্ডায়মান থাকিয়া ইহাই যে বশিষ্ঠাশ্রম, তাহার প্রমাণ দিতেছে। মন্দিরের সম্মুখভাগে নাটমন্দিরে ব্রহ্মার পাষাণময় চতুর্ভুজ মূর্ত্তির দর্শন পাওয়া যায়।

মন্দিরাভ্যন্তরে বশিষ্ঠদেবের পাষাণময় মূর্ত্তি, বামে তারাদেবী ও জলমগ্ন শিব, দক্ষিণে গঙ্গা ও জলমগ্ন শিবালয়; দেবালয়ের গাত্রে বাসুদেব নারায়ণ ও মহাদেবের মূর্ত্তি বিরাজমান।

পরিশ্রান্ত যাত্রীগণ এই প্রস্রবনে অবাধে স্নান করিয়া পরিতৃপ্ত হন। এই নির্জ্জন আশ্রমটী অসংখ্য ভক্তগণের আগমনে ক্ষণেকের জন্য সরগরম হইয়া উঠিয়াছিল। আশ্রমের মধ্যে কেবলমাত্র দুই ঘর পাণ্ডা বাস করেন, তাঁহারাই যাত্রীদিগকে দেবতা দর্শন এবং পূজার্চ্চনা করাইয়া দক্ষিণা বা প্রণামী আদায় করিয়া থাকেন। আমাদের জয়ধ্বনির কোলাহল শব্দ শ্রবণ করিয়া পাণ্ডা ঠাকুর যাত্রীসমাগম জানিতে পারিয়া ধীরে ধীরে মৃদুমন্দ গমনে জলমগ্ন শিবালয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন, আমরাও তাঁহার দর্শনে বিনা বাধায় আশ্রমটীর উপর দিকে আরোহণপূর্ব্বক প্রথমে একটী ভগ্ন প্রাচীরবেষ্টিত মন্দির দর্শন করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম। এই মন্দিরটী দেখিলেই অতি প্রাচীনকালে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান হয়। আমরা সদলবলে তথায় উপস্থিত হইবামাত্র পাণ্ডা ঠাকুর নিকটে আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং একে একে উপরোক্ত দেবালয়গুলির অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দেবতাদিগের দর্শনদানে চরিতার্থ করাইলেন। তৎপরে তাঁহার উপদেশ মত ফুল ও বিল্বপত্র সংগ্রহসহকারে দেবাদিদেব মহাদেবের পূজার্চ্চনা সম্পন্ন করিয়া, পাণ্ডা ঠাকুরকে সাধ্যমতে প্রণামী দিয়া সন্তুষ্ট করিলাম, এবং পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "গুরুজি! এখানে এত বোট্‌কা গন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যায় কি নিমিত্ত?"

তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "বাবু সাহেব! ব্যাঘ্রগণ যখন তখন এই ঝরণায় জল পান করিতে আসিয়া থাকে, কিন্তু এখানে এই "বাবার" এমনি মাহাত্ম্য যে, তাহারা আশ্রমসীমার মধ্যে কখন কাহারও প্রতি অত্যাচার বা প্রাণনাশ করিতে পারে না।" এইরূপ উপদেশ পাইয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক আশ্রমের নিম্নভাগে প্রস্রবনের এক ধারে জঠরানল নিবৃত্তির জন্য যখন আমাদের দলস্থ লোক সকল রন্ধন

কার্য্যে ব্যস্ত হইলেন, তখন অবসর পাইয়া আমার ন্যায় আরও দুই-চারিজন স্বাধীন বন্ধুলোক এই আশ্রমের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিবার সময়, এক স্থানে পাহাড়ীগণ একটী উচ্চ বৃক্ষ হইতে কাঁঠাল পারিতেছে দেখিতে পাইয়া, তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিবার জন্য সেই দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, এমন সময় আরও কতিপয় বাঙ্গালী ভদ্র-লোক একটী ছ'নলা বন্দুক সমভিব্যাহারে আমাদের দিকে আসিয়া আমাদেরই দলে মিলিত হইলেন। তখন আমরাও এই নবাগত বন্ধু-দিগের সহিত নানাপ্রকার বাক্যালাপে বুঝিতে পারিলাম যে, যে বাবুটীর হস্তে বন্দুক, তিনি নিকটস্থ চা-বাগানের ডাক্তার। তিনি আপন বন্ধু-বান্ধবদিগকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া এই আশ্রমের শোভা দেখাইতে-ছেন। এইরূপে সকলে মিলিত হইয়া ঐ পাহাড়ীদিগের নিকট উপস্থিত হইলাম, এবং তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলাম। আমাদিগকে দেখিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে সেই পাহাড়ীগণ সম্বোধন করিয়া বলিল, "এ বাবু, তু কাঁঠাল খাবি।" এই কথা বলিয়া একটী এচোরকে আপন অস্ত্র দ্বারা পরিষ্কাররূপে খণ্ড খণ্ডপূর্ব্বক যত্নের সহিত আমাদিগকে উপহার প্রদান করিল, আমরাও সাগ্রহে উহা গ্রহণ করিলাম। ডাক্তার বাবু উক্ত উপহার সামগ্রীগুলি আমাদের মধ্যে সকলকে বিতরণ করিয়া অব-শিষ্ট যাহা রহিল, তাহা নিজে আস্বাদ করিতে লাগিলেন। এই এচোর খণ্ডগুলি খাইতে আমাদের ইচ্ছা না থাকিলেও ডাক্তার বাবুর অনু-রোধে কিছু আস্বাদ গ্রহণ করিয়া বুঝিলাম, ইহা কাঁচা কাঁঠাল হইলেও এক উপাদেয় সামগ্রী। তৎপরে আত্মীয়স্বজনের সহিত মিলিত হইয়া আহারাদি সম্পন্নপূর্ব্বক অপরাহ্নকালে আপন আপন গো-শকটে আরো-হণ করিয়া সকলেই বশিষ্ঠদেবের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে বাসাবাটীতে প্রত্যাগমন করিলাম। পর দিবস পাণ্ডার নিকট উপস্থিত হইয়া অপরাপর যে সকল

ব্রহ্মপুত্র নদের উপরিভাগে উপদ্বীপের দৃশ্য। [৫৭ পৃঃ
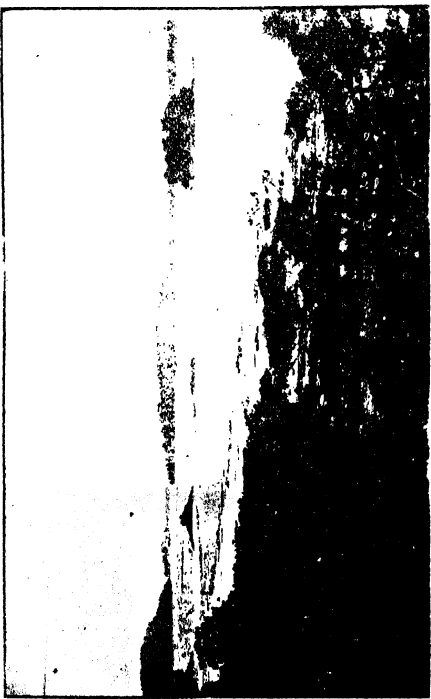
দ্রষ্টব্য তীর্থস্থানগুলি দেখিতে বাকি ছিল, সেইগুলি দর্শন করিবার জন্য তাঁহার নিকট অনুরোধ করাতে, তিনি আমাদের মনোগত ভাব অবগত হইয়া একটী বিশ্বাসী লোক সংগ্রহ করিয়া, অদ্যই আমাদের বাসাবাটীতে পাঠাইবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। এই শেষ তারিখে আমাদের রন্ধন করিতে হয় নাই, কারণ এই দিবস মহামায়ার ভোগের প্রসাদ পাইয়াছিলাম। সে যাহা হউক, সর্ব্বশেষে তীর্থ গুরু পাণ্ডাকে সাধ্যমত দক্ষিণা প্রদানসহকারে এখানকার নিয়ম সকল পালন এবং অম্বুবাচী সময়ের মহামায়া কামাখ্যাদেবীর অমূল্য ছিন্ন রক্ত বস্ত্র উপহারস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, কামাখ্যাদেবীকে একবার শেষ দর্শনপূর্ব্বক বাসা বাটী হইতে কামেশ্বরদেবকে দর্শন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

শ্রীশ্রীকামেশ্বরদেব দর্শন যাত্রা

কামেশ্বরদেবের মন্দির ব্রহ্মপুত্র নদের পরপারে অবস্থিত। এই কামেশ্বর ও কামাখ্যাদেবীর সাহত প্রতি বৎসর পৌষ মাসে কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথিতে অতি সমারোহে বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে; সেই উৎসবকে পুংসবন উৎসব বলে। সকল তীর্থ স্থানেই পাণ্ডার দ্বারা দর্শন স্পর্শন কার্য্য হইয়া থাকে। ব্রহ্মপুত্রের পরপারের তীর হইতে কামেশ্বরদেবকে দর্শন করিবার জন্য দুইখানি গো-শকট ভাড়া ধার্য্য হইল। এই দুইখানি গো-শকটে যত লোক ধরে, তত লোকই আরোহণ করিলাম, অবশিষ্ট লোকগুলি গোমস্তা ঠাকুরের সহিত পদব্রজে হাঁটাপথে গমন করিতে লাগিল। এইরূপে কামেশ্বরদেবের মন্দিরের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম। কামেশ্বরদেবের মন্দিরে উঠিতে অপরাপর মন্দির অপেক্ষা কিছু অধিক ক্লেশভোগ করিতে হয়;

কারণ এই দেবালয়ে উঠিবার সুবিধা মত রাস্তা বা সোপান নির্ম্মিত নাই, অথচ মন্দিরটী অতি উচ্চে অবস্থিত। এই উচু নীচু সঙ্কীর্ণ পথের উপর দিয়া আরোহণপূর্ব্বক ভগবান কামেশ্বরদেবের দর্শন লাভ হয়। ইহার উপর চড়ায়ে আরোহণ করিবার সময় কোন স্থান বৃক্ষের শীকর ধরিয়া, আবার কোথাও বা উচ্চ পাহাড়ের প্রস্তর খণ্ডের সাহায্যে আরোহণ করিতে হয়। এই সমস্ত কষ্টভোগ দেখিয়া আমরা অসমর্থ স্ত্রী, পুত্রদিগকে ইহার উপরে উঠিতে নিষেধ করিলাম ; কারণ একটী স্থান এত সঙ্কীর্ণ ও পিছল যে, সেই স্থানটী অতি সন্তর্পণে উঠিতে না পারিলে পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা। আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা এই ভয়াবহ কষ্ট দেখিয়াও উপরে যাইবার সাহস করিলেন, তাঁহাদিগকে সাবধানের সহিত আরোহণ করাইয়া অতি কষ্টে দেবস্থানে পৌঁছিলাম।

এই অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গের উপর হইতে নিম্নভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে মাথা ঘুরিতে থাকে, কিন্তু স্থানটী অতি নির্জ্জন এবং মনোমুগ্ধকর। মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবান কামেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের অর্চ্চনাদি পাণ্ডার দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া জীবন সার্থক বোধ করিলাম। মন্দির পার্শ্বে একখানি করোগেট টীনের চালযুক্ত ঘরে ভগবানের ভোগ মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা এই ভোগ মন্দিরের নিকট একটি সুবিধা মত নিম্নে অবতরণ করিবার পথ দেখিতে পাইয়া, ঐ রাস্তারই সাহায্যে নীচে নামিলাম। এইরূপে কামেশ্বরদেবের দর্শন ও অর্চ্চনাদি সম্পন্ন করিয়া এখান হইতে হিন্দুদিগের জাগ্রত দেবতা ভগবান কেদারেশ্বর মহাদেবের দর্শন আশে গো-শকটের সাহায্যে তথায় যাত্রা করিলাম।

শ্রীশ্রীকেদারেশ্বর মহাদেবজীউ

যে পর্ব্বতে ভগবান কেদারেশ্বর বিরাজ করিতেছেন, উহা অতি উচ্চে অবস্থিত। কিন্তু এই অত্যুচ্চ পর্ব্বতে উঠিবার রাস্তাটী ভাল এবং সোপানশ্রেণীতে সজ্জীকৃত। এখানে কমলেশ্বরনাথ, কেদারেশ্বরনাথ এবং জয়দুর্গাদেবীর পবিত্র মূর্ত্তিত্রয়ের দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন চরিতার্থ করিলাম, স্থান মাহাত্ম্যগুণে এই সময় হৃদয় ভক্তিভরে এবং আনন্দে অধীর হইল। সে যাহা হউক, এই সকল দেবদেবীর পূজার্চ্চনা সম্পন্ন করিয়া এখান হইতে গৌহাটী ষ্টীমার ঘাটে যাইবার জন্য গাড়োয়ানকে আদেশ করিলাম; কারণ ঐ সকল সমুন্নত পাহাড়ে আরোহণ ও অবতরণ এবং গো-শকটে পরিভ্রমণ করিয়া এত ক্লান্ত হইয়াছিলাম যে, পুনরায় পাহাড়ে আরোহণ করিবার স্পৃহা মন হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছিল। গোমস্তা ঠাকুর যখন স্থির জানিতে পারিলেন যে, আমরা এখান হইতে আর অপর কোন তীর্থ স্থানে যাইব না; তখন তিনি নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া অনুরোধ করিলেন, "বাবু সাহেব! আপনারা যখন এতদূর আসিয়া অর্থ ব্যয় ও ক্লেশভোগ করিয়াছেন, তখন গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া পুষ্করিণীতে স্নান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন কেন? এখান হইতে জগদ্বিখ্যাত শ্রীশ্রীহয়গ্রীব মাধবজীউর দেবালয় অতি সন্নিকট—অতএব আমার উপদেশ মত তথায় এক দিবস বিশ্রামপূর্ব্বক শ্রীশ্রীহয়গ্রীবদেবের দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিতে অবহেলা করিবেন না। আমার একান্ত ইচ্ছা, প্রথমে আপনাদিগকে এই পর্ব্বতের নীচে কালাপাহাড়ের কবর স্থান দেখাইয়া, তৎপরে শ্রীশ্রীহয়গ্রীবমাধবের পূজার্চ্চনা করাইয়া শেষ গৌহাটী সহরের ষ্টীমার ঘাটে পৌছাইয়া দিব।"

গোমস্তা ঠাকুরের নিকটে এইরূপ উপদেশ প্রাপ্তে, অত্যাচারী দেব দ্রোহী কালাপাহাড়ের কবর স্থান দেখিতে ইচ্ছা হইল।

যে কালাচাঁদ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, যিনি ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া হিন্দু দেবদেবীর প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করিবার জন্যই কালাপাহাড় নাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন, যিনি সংসারী হইয়া পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করিবার জন্য চাক্‌রী করিতে গিয়া একদিকে প্রাণের দায়ে অপরদিকে সম্রাট দুহিতার অপরূপ রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়া এক ঘরে হইয়াছিলেন, যে কালাচাঁদ জাতি হইতে উদ্ধার মানসে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের নিকট হত্যা দিয়াও সমাজ হইতে মুক্তির কোন কিছু উপায় করিতে পারেন নাই, অধিকন্তু যে কালাচাঁদের পরিচয় অবগত হইয়া পুরীর প্রধান পাণ্ডা দেবালয় হইতে তাহাকে দূরীভূত করিলে, তিনি মনের দুঃখে স্বেচ্ছায় সম্রাটের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, যে কালাচাঁদের হিন্দু দেবদেবীর প্রতি বিদ্বেষভাবের ইহাই প্রধান কারণ হইয়াছিল, যে কালাচাঁদের চরিত্রের বিষয় প্রথম খণ্ডে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণনা হইয়াছে, সেই স্বনামখ্যাত কালাপাহাড় মোগল সেনাপতি হইয়া কিরূপে কাহার নিকট পরাজিত এবং দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, উহা অবগতির নিমিত্ত পাণ্ডা ঠাকুরকে বারম্বার অনুরোধ করাতে, তিনি সংক্ষেপে তাহার মৃত্যুর কারণ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন।

গোমস্তা ঠাকুর বলিলেন, "বাবু সাহেব—এই কালাপাহাড় যবনত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, কলিকালে হিন্দু দেবদেবীর ক্ষমতা অন্তর্হিত হইয়াছে। এই বিশ্বাসেই তিনি মনের সাধে হিন্দু দেবদেবীর উপর ক্রমাগত অত্যাচার আরম্ভ করিতে লাগিলেন, এমন কি যে স্থানে হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান আছে বলিয়া সংবাদ

ইতেন, সেই স্থানেই তিনি সদলবলে উপস্থিত হইয়া বিনা বাধায় বালয় ও দেবতাদিগের প্রতিমূর্ত্তির উপর অত্যাচার করিয়া পরিত্রাণ ইতেন বলিয়াই অত্যন্ত সাহসী হইয়াছিলেন, যদিও কামাখ্যাদেবীর ন্দির ধ্বংস করিবার সময় এক দৈববাণীর দ্বারা তাহাকে সতর্ক করা ইয়াছিল, কিন্তু কালের গতি কে রোধ করিতে পারে? তিনি বিনা ধায় অত্যাচার করিতে করিতে যখন আমাদের এই জাগ্রত দেবতা গবান "কেদারেশ্বরের" মন্দির ধ্বংস করিতে পর্ব্বতের শিখরদেশে পস্থিত হন, তখন ভগবান তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া ঐ গিরিশিখর ইতে সর্ব্বসমক্ষে তাহাকে এই কথা বলিয়া পর্ব্বতের পাদদেশে নিক্ষেপ রিলেন, "রে দুরাত্মন! আমি বারম্বার তোর অত্যাচারে প্রপীড়িত ইয়া তোকে সাবধান করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই তোর চৈতন্য হইল না; এক্ষণে তাহার ফলভোগ কর।" এইরূপে কালাপাহাড় নিগৃহীত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলে তাহার সর্ব্বশরীর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া এক জড়-পিণ্ডের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া কালার অপরাপর সাহায্যকারীরা সকলেই প্রাণভয়ে আপন আপন ত্রুটি স্বীকার করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। এইরূপে ভগবান কেদারে-শ্বর আপন মহিমা প্রকাশ করিলে তদবধি অপর কোন প্রাণী হিন্দু দেবদেবীর প্রতি অত্যাচার করিতে সাহস করেন নাই। এই মহাবীর কালাপাহাড়ের মৃত্যু সংবাদ ভারতের নানা স্থানে বিঘোষিত হইলে পর স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীগণ দুঃখিত মনে কালাপাহাড়ের সেই মৃত দেহ এই পর্ব্বতের পাদদেশে অতি সমারোহে কবর প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার আত্মার মঙ্গল কামনা করিয়া প্রতি বৎসর এই স্থানে এক মহা মেলায় পরিণত করিয়া থাকেন, অদ্যাপিও ঐ মেলা প্রচলিত রাখিয়াছেন। মেলার সময় কত দূরদেশ হইতে কত সহস্র মুসলমানগণ

উপস্থিত হইয়া কায়মনপ্রাণে কালাপাহাড়ের আত্মার মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। পাণ্ডার নিকট কালাপাহাড়ের অধঃপতনের ইতিহাস শ্রবণ করিয়া এখান হইতে ভগবান শ্রীশ্রীহয়গ্রীব মাধবের দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইলাম।

শ্রীশ্রীহয়গ্রীবমাধবের দর্শন যাত্রা

এই স্থান হইতে শ্রীশ্রীহয়গ্রীবমাধবের দেবালয় দর্শন করিতে যাইতে হইলে পথিমধ্যে একটী নদী পার হইতে হয়। ভগবান শ্রীশ্রীহয়গ্রীবমাধবের দেবালয় হাজো নামক গ্রামে অবস্থিত। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রস্তরময় ৺মাধবজীউর পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিলাম। এই মাধবজীউর মন্দিরে উপস্থিত হইলে ঠিক যেন বালেশ্বরের ক্ষীরচোরা গোপীনাথজীউর মন্দির বলিয়া ভ্রম হয়। ভগবান শ্রীশ্রীহয়গ্রীবমাধবের অশ্বের ন্যায় গ্রীবা থাকায় এই দেবতার নাম শ্রীশ্রীহয়গ্রীব-মাধব হইয়াছে। এই তীর্থ স্থানে পাণ্ডারা যাত্রী পাইলে তাহাদের পুরাতন খতিয়ান বহি দেখাইয়া অপরাপর তীর্থ স্থানের ন্যায় যাত্রীদিগের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া আপন আপন শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন, আর যাহারা এই তীর্থে নূতন আসিয়াছেন, তাহারা ইচ্ছানুযায়ী পাণ্ডা মনোনীত করিয়া তাঁহাকেই পাণ্ডা পদে মান্য করিতে পারেন। আমরা এখানকার নূতন যাত্রী, সুতরাং গোমস্তা ঠাকুরের উপদেশ মত লক্ষীদেব শর্ম্মা নামে একজনকে পাণ্ডা পদে বরণ করিলাম। বলাবাহুল্য, লক্ষী পাণ্ডা আমাদিগকে যত্নের সহিত তাঁহার আপন বাস ভবনে লইয়া গিয়াছিলেন। পাণ্ডার ঠিকানা জেলা রাজসাহী, গ্রাম ও পোষ্টাফিস হাজো নগর। এই হাজো নগর, গোহাটী হইতে অন্যূন ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানে একটী কথা বলিবার আছে, কি কামাখ্যায়, কি

গৌহাটী সহরে, কি এই হাজো গ্রামে, আসাম অধিবাসীদিগের কথা কিছু আড়ো আড়ো, জিহ্বা যেন তালুতে সংলগ্ন করিয়া কথা কন, তাঁহারা "শ" স্থানে "ছ" আর "ত" স্থানে "ট" বর্ণ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। এই কারণে তাঁহাদের বাক্যগুলি বুঝিতে এদেশবাসী লোক-দিগের পক্ষে কিছু কষ্ট বোধ হয়, সে যাহা হউক, এই পাণ্ডার বাস ভবনে সপরিবারে কিঞ্চিৎ বিশ্রামপূর্ব্বক বাসা বাটীর সন্নিকটে মাঠের মধ্যে বরাহ কুণ্ড নামে যে একটী ছোট কুণ্ড আছে, উহাতেই স্নান তর্পণ সম্পন্নপূর্ব্বক শুদ্ধকলেবরে দেব দর্শন করিতে যাত্রা করিলাম। কথিত আছে, ভগবান বরাহ অবতার স্বয়ং এই কুণ্ডটী খনন করেন, সুতরাং এই কুণ্ডে স্নান করিলে অশেষ পুণ্য লাভ হয়, সন্দেহ নাই।

সর্ব্বপ্রথমেই আমরা এই বরাহ কুণ্ডে স্নানসহকারে নিকটস্থ সিদ্ধি-দাতা গণেশজীউর বন্দনা করিলাম, তৎপরে পর্ব্বতের নিম্নভাগে মাঠের উপর "অপুনর্ভব" নামে আবার একটী পবিত্র নদের জল স্পর্শ করিয়া গোকর্ণ যোগীর পাষাণময় মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। কথিত আছে, দ্বাপর যুগে গোকর্ণ যোগী এই স্থানে পর্ব্বত গুহায় বসিয়া তপস্যা করিতেন, একদা দশস্কন্ধ রাবণ এই স্থান দিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলে, যোগীবর তাঁহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া গুহা মধ্যে প্রবেশ করেন, তখন রাবণ সেই গুহার দ্বার প্রস্তর খণ্ড দ্বারা বন্ধ করিয়া চলিয়া যান, কিছুকাল পরে স্থানীয় অধিবাসীরা গুহার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন যে, যোগীবর পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ শরীরে অক্ষত দেহে ভগবানের তপস্যা করিতেছেন, তখন পাণ্ডারা এই গোকর্ণ যোগীর নাম চিরস্মরণীয় রাখি-বার নিমিত্ত তাঁহার পাষাণময় একটী মূর্ত্তি এই পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠা করেন, অদ্যাপি যাত্রীগণ তাঁহার ঐ পাষাণময় পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক বোধ করেন। এইরূপে এখানে ভগবান শ্রীশ্রীহয়-

গ্রীবমাধব এবং গোকর্ণ যোগীর পাষাণময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া হাজো গ্রামে পাণ্ডার বাটীতে প্রত্যাগমন করিলাম।

পাণ্ডা ঠাকুর আমাদিগকে এখানে আরও দুই-একদিন অবস্থান করিয়া স্থানীয় তীর্থ স্থানগুলি দর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু ক্রমাগত পদব্রজে ভ্রমণ, গোযানে আরোহণ এবং নদনদী সকল পার হইয়া, অনিদ্রা, অনিয়মে আহার এই সকল কারণবশতঃ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম, সুতরাং আর কোন স্থানে না যাইয়া আপন গন্তব্য স্থানে প্রত্যাগমন করিতে স্থিরসঙ্কল্প করিলাম। এই হাজো গ্রামে যে সকল পাণ্ডারা বাস করেন, দেখিতে পাইলাম, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও অবস্থা স্বচ্ছল নহে, কারণ এই দুর্গম পথে এত ক্লেশভোগ সহ্য করিয়া অতি অল্প যাত্রীরই সমাগম হয়। সুখের বিষয়, এখানে যাত্রী সংখ্যা কম হইবার জন্য পয়সা অভাবে পাণ্ডারা দরিদ্র অবস্থায় থাকেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা সেরূপ বেশী নয়। কাকুতি-মিনতি ভিন্ন যাত্রীদিগের প্রতি দুর্ব্যবহার বা পীড়ন করিতে তাঁহারা জানেন না। আমরা সকলে মিলিয়া লক্ষ্মী পাণ্ডাকে কেবলমাত্র পাঁচ টাকা প্রণামীস্বরূপ দিয়াছিলাম, উহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইয়া দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এইরূপে এখানকার দেবতা সকল এবং হাজো গ্রামের শোভা দর্শন করিয়া কোথাও গো-যান, কোথাও অশ্ব-যান আবার কোথাও বা নদনদী সকল পার হইয়া অতি কষ্টে গৌহাটী সহরে পৌঁছিলাম. তথায় যে গোমস্তা ঠাকুর আমাদের সহিত ছিলেন, তাঁহাকে সন্তুষ্টপূর্ব্বক বিদায় দিয়া আপন গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলাম। আহোম, কোচ, মিকির, কাছারী, গারো, হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক কামরূপের অধিবাসী।

যে কয়টী তীর্থ এখানে বর্ত্তমান আছে, অর্থাৎ পাণ্ডার নিকট অবশিষ্ট যাহা শুনিতে পাইতেছি, তাঁহাদেরই বা সেবা না করিব কেন ? তোমরা পুরুষ মানুষ হইয়া যেরূপ ক্লান্তভাব দেখাইতেছ, আমরা স্ত্রীলোক, আমরা কিন্তু সেরূপ কষ্ট অনুভব করি নাই। তাঁহার উত্তরে এই শিক্ষালাভ করিলাম, কষ্ট যতই হউক না কেন, স্ত্রীলোকেরা তীর্থ সেবা করিতে কখন কুণ্ঠিত হন না। তীর্থ সেবা যে মুক্তির একমাত্র উপায়—তাঁহারা উহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। পূর্ণব্রহ্ম বলরাম স্বয়ং তীর্থ পর্য্যটন করিয়া নরলোকদিগকে যে উপদেশ দিয়াছেন, উহারা তাহাই প্রতি পদে পালন করিবার চেষ্টা করেন। স্ত্রীলোকদিগের হৃদয়েই ধর্ম্মভাব সতত বর্ত্তমান আছে, আর এই নিমিত্তই পণ্ডিতগণ স্ত্রীলোকদিগকে "লক্ষ্মী" বলিয়া উপমা দিয়া থাকেন, অর্থাৎ স্ত্রী ভাগ্যেই ধন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার অর্থ—যে স্থানে ধর্ম্ম অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে নিশ্চয়ই ধর্ম্মের সহচর দয়া, মমতা ও সুখ বিরাজ করিতেছেন। যে স্ত্রীজাতি এতগুলি গুণে অলঙ্কৃতা, অজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই স্ত্রীজাতিকে অনর্থক অবজ্ঞা করিয়া না জানি কতই পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়া থাকেন। আর এক কথা —যাহা চাক্ষুস দেখিতে পাওয়া যায়, তীর্থ স্থানে স্ত্রীলোক সঙ্গে না থাকিলে তীর্থের নিয়মগুলি সুচারুরূপে কখনই সম্পন্ন হয় না ; যদি কখন কেহ তীর্থের সমস্ত নিয়মগুলি পালন করিয়া থাকেন, তাঁহাকে জানিতে হইবে যে, উহা কেবল এই স্ত্রীলোকদিগের অনুরোধেই সম্পন্ন হইয়াছে, কেন না অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, পাণ্ডাদের উৎ-পীড়ন দেখিয়া অনেক ধর্ম্মপ্রাণ পুরুষ তাঁহাদের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া জ্ঞানত নিয়মগুলি বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, আমরা পাতালপুরীতে উপস্থিত হইয়া হর-গৌরী (এই দুইটীই যোনী-পীঠ, অর্থাৎ এই পীঠ যোনীর আকৃতি) একখানি ২॥• হস্ত লম্বা

ও ১।০ হস্ত প্রশস্ত ডিম্বাকারে যে প্রস্তর দর্শন করিলাম, ইহাই গৌরী নামে খ্যাত। এই প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে ৫।৬ অঙ্গুলী প্রমাণ গ লম্বাকৃতি গর্ত্ত আছে। এখানে কূর্ম্ম, চক্র, নৃসিংহ, বরাহ এবং কতি শালগ্রাম শিলা বিরাজ করিতেছেন, সকল মূর্ত্তিগুলিই জলমধ্যে অ স্থিত। পূজারীর নিকট উপদেশ পাইলাম, এখানকার এই হর-গৌ নামক যোনী-পীঠ কামাখ্যা পাহাড়ের অবস্থিত যোনী-পীঠের অনুক মূর্ত্তি। অর্থাৎ এই পবিত্র পীঠ দর্শন করিলে কামাখ্যাদেবীর দর্শন স্বরূ ফললাভ হইয়া থাকে। শুনিলাম, সম্প্রতি ইহার সন্নিকটে একটি পবিত্র জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ঐ মূর্ত্তি দর্শন করিবার একা ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র বিকট গন্ধ পাওয়া শার্দ্দূল ভয়ে পাণ্ডার পরামর্শ মত দ্রুতপদে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয় এখান হইতে সম্মুখস্থ অন্য পথের সাহায্যে যত নিম্নে নামিয়াছিলাম পুনর্ব্বার তত উর্দ্ধে উঠিয়া ভগবান চন্দ্রশেখরজীউকে দর্শন করিতে যাত্রা করিলাম।

চন্দ্রশেখর

পাতালপুরী হইতে সদলবলে ক্রমাগত আরোহণ করি প্রথমে যে ঢালু পথ দিয়া অবতরণ করিয়াছিলাম, পুনরায় সেই স্থানে আসিয় উপস্থিত হইলাম। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত গিরি-সেতু পার হইয়া এই পর্ব্ব তের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে যথায় চন্দ্রনাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, তথায় এক ঘণ্টার মধ্যে অতি কষ্টে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরাভ্যন্তরে ভগ বানের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গমূর্ত্তি ভক্তিসহকারে দর্শন, স্পর্শন ও যথানিয়মে প্রণামাদি সম্পন্ন করিয়া করুণাময়ের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে আপন আপন ব্রত উদ্যাপন করিলাম।

চন্দ্রনাথ পাহাড়ের যে শৃঙ্গে ভগবান চন্দ্রশেখরজীউ বিরাজ করিতেছেন, সেই অত্যুচ্চ শৃঙ্গটী সমতলভূমি হইতে অন্যূন এক হাজার এক শত পোনের ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। স্থানীয় পূজারীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, এই মন্দিরটী কামাখ্যাদেবীর মন্দির যে পাহাড়ে অবস্থিত, তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। চন্দ্রনাথদেবের মন্দিরটী দেখিতে ঠিক স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরের ন্যায় ত্রিপ্রকোষ্ঠে বিভক্ত। পাণ্ডার নিকট অবগত হইলাম, সর্ব্বপ্রথমে এই চন্দ্রনাথদেবের মন্দিরটী ত্রিপুরাধিপতি ধন্যমাণিক্য বাহাদুর অকাতরে বহু অর্থ ব্যয়সহকারে নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠা করেন, এবং প্রভুর নৈমিত্তিক পূজা নির্ব্বাহের জন্য কতকগুলি ভূসম্পত্তিও প্রদান করেন, সেই আয়ের দ্বারা যথানিয়মে ভগবানের পূজা হইত। ৺চন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ পূর্ব্বে এখানে যে স্থানে ছিলেন, এক্ষণে তিনি সেই স্থানে নাই; কারণ একদা কালাপাহাড় সদলবলে এখানে উপস্থিত হইয়া উক্ত প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গসহ মন্দিরটী ধ্বংস করিয়া দেন; তৎপরে তাহারই অল্প ব্যবধানে বর্ত্তমান মন্দিরটী এই জেলার অন্তর্গত সারায়াতলী গ্রামের রামসুন্দর সেন নামে জনৈক পুণ্যাত্মা নিজ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়া শিবলিঙ্গটী পুনঃপ্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক আপন কীর্ত্তি স্থাপন করেন। এখান হইতে চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর।

এই অত্যুচ্চ চন্দ্রনাথের মন্দির হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দিগ্‌দিগন্ত পরিপূরিত ব্যাস সাধনালয় দেখা যায়, "চন্দ্রনাথ" তীর্থ কি রমণীয় স্থান! কেবল হিন্দু নহে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে যাঁহার মন আকৃষ্ট হয়, শান্তপ্রকৃতির মুক্ত বাতাসে যাঁহার শান্তিলাভ হয়, পর্ব্বত তাঁহার তীর্থক্ষেত্র। অনভ্যস্ত ব্যক্তির পর্ব্বতারোহণ যেমন কষ্ট সাধ্য, অদৃষ্ট ব্যক্তির পর্ব্বত দর্শন ও সেইরূপ আশ্চর্য্য,আবার পর্ব্বতানিভিজ্ঞ লোকের

পার্ব্বত্য শোভা দর্শন ততোধিক মনোরঞ্জন ! ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ পথে চন্দ্র সূর্য্যসহ নক্ষত্রপুঞ্জ, মধ্যপথে বায়ু সাগরে ভাসমান বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত মেঘমালা, নিম্নে হরিৎক্ষেত্র ও নানাবিধ বৃক্ষশ্রেণী লইয়া একটী উগ্যান সুরচিত। এই স্থান হইতে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মনে হয়, নিম্নতলে একটী অপূর্ব্ব দেশ ! অদূরে বঙ্গোপসাগরের সলিলরাশি যেন ধূসর বর্ণ অনন্ত গগণপথ নীলাভ প্রতীয়মান হয়, নিম্ন দেশটীও তেমনি একটী ধূসরিত প্রাকৃতিক উগ্যান ; অতি ক্ষুদ্র বিশেষ জীবগণ যেন অসংখ্য বামন ; ঊর্দ্ধস্থ চন্দ্র সূর্য্যকে এখান হইতে আমরা ক্ষুদ্রতর মনে করিতে লাগিলাম। নিম্নতলের স্বভাবোগ্যানটীর সৃষ্টি—তেমনি ক্ষুদ্রতায় পরিপূর্ণ দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম ; কেন না এখান হইতে বাষ্পচালিত শকট যানগুলি যেন ধাতুনির্ম্মিত বালকের অতি ক্ষুদ্র ক্রীড়া শকট বলিয়া মনে হইতে লাগিল ; গগণপ্রাচীর যেন ঐ প্রদেশের ভূমি সংলগ্ন। চারিদিকে বায়ুরাশিতে আবদ্ধ, তাহারই মধ্যে অনন্তজীব পর্য্যটক পরিভ্রমণে নিরন্তর ব্যস্ত। হে অনুচ্চ পর্ব্বত ! তোমার বিচিত্র ক্রোড়ে বিশ্বরহস্যের একি প্রহেলিকা !

নিম্নে সমতলভূমিতে অবস্থিত মনুষ্যগুলি ছাগবৎ অনুমান হয়, গ্রামগুলি যেন ছোট ছোট ঝোপের ন্যায় এবং রাস্তাগুলি একগাছি মোটা রজ্জু পতিত থাকিলে যেরূপ দেখায় ঠিক্ সেইরূপ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্যাপি এখানে সেই প্রাচীন পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের নিদর্শন স্থান বর্ত্তমান থাকিয়া কালাপাহাড়ের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ৺বিরূপাক্ষদেবের ন্যায় এখানেও দিবস মধ্যে যথাসময়ে প্রত্যহ একবার একজন পুরোহিত আসিয়া দেবতার পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন মাত্র। যে দেবের মহিমা আবালবৃদ্ধবনিতার প্রমুখাৎ শুনিতে পাওয়া যায়, সেই দেবের এখানে এমন কোন কিছু উল্লেখযোগ্য পূজার ধূমধাম বা ক্রীড়া-

কল্প না দেখিতে পাইয়া মর্ম্মাহত হইলাম। বলাবাহুল্য, পূজা বা ভোগাদির প্রাচুর্য্য যাহা কিছু আছে, সমস্তই ভগবান স্বয়ম্ভূনাথের শ্রীমন্দিরে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে যে ভগবান চন্দ্রনাথের দর্শনের নিমিত্ত কত না ভাবিত হইয়াছিলাম, আজ প্রভুর কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে সেই দেবের দর্শনলাভে মহাব্রত উদ্যাপন করিলাম। এইরূপে এই চন্দ্রনাথ পাহাড়-স্থিত তীর্থগুলির সেবা এবং যথানিয়মগুলি পালনসহকারে আপন আপন মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া সাবধানের সহিত ইহার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম। ভারতবর্ষের বিখ্যাত তীর্থ স্থান যথা কাশী, শ্রীক্ষেত্র, বৃন্দাবন প্রভৃতির ন্যায় এই চন্দ্রনাথ তীর্থ স্থানও পঞ্চক্রোশী। ইহার দক্ষিণ-সীমানা বাড়বানল, উত্তরে লবণাক্ষ, পশ্চিমে ব্যাসকুণ্ড এবং পূর্ব্বে মন্দাকিনী যাহা জনসমাজে সহস্রধারা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

এই অত্যুচ্চ পর্ব্বতের নিম্নদেশ হইতে প্রথমে আরোহণ করিয়া মধ্যভাগে উনকোটী শিবের বাটী, পরে ৺বিরূপাক্ষদেবের দর্শন, তৎপরে পাতালপুরী সর্ব্বশেষ পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে ভগবান চন্দ্রনাথ মহাদেবের দর্শন। এইরূপে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালপুরী পর্য্যটন করিয়া যে কিরূপ পর্য্যাস্ত ক্লান্ত বা পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, উহা ভুক্তভোগী না হইলে অপরে কিছুতেই কখন কেহ অনুভব করিতে পারিবেন না। সে যাহা হউক, এই অপরিচিত স্থানে প্রথমেই স্ত্রীপুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া যেরূপ কষ্টভোগ করিয়াছি—উহা বর্ণনাতীত। এখানে যতটুকু জ্ঞানলাভ করিয়াছি, তাহাতে সাধারণের নিকট বলিতে পারি,যেন কেহ কখন আমার ন্যায় প্রথমেই কোন অপরিচিত স্থানে একেবারে অসমর্থ স্ত্রীপুত্রদিগকে লইয়া উপস্থিত না হন? সে যাহা হউক, ঐ দিবস অপর কোন তীর্থ স্থানে গমন না করিয়া বরাবর প্রায় দুই মাইল পথ অতি-

ক্রমপূর্ব্বক সীতাকুণ্ডের বাসাবাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম।

পর দিবস প্রত্যুষে ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া মাতা ঠাকুরাণীকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য এখানকার অবশিষ্ট তীর্থ স্থানগুলি দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইলাম। পাণ্ডা ঠাকুরের উপদেশ মত এবার সর্ব্ব প্রথমেই "জ্যোতির্ম্ময়" নামক তীর্থ দর্শনে যাত্রা করিলাম। এই তীর্থ স্থানটী বাসা বাটী হইতে অনূ্যন উত্তরদিকে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। জ্যোতির্ম্ময় তীর্থ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। ইহার মাহাত্ম্য দর্শন করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়—এক পর্ব্বতের গাত্র স্থান হইতে অবিরত অবিশ্রান্তভাবে তীর্থ মাহাত্ম্যহেতু অগ্নিশিখা বহির্গত হইতেছে। এই অগ্নিই মহাদেবের নেত্রাগ্নি নামে প্রসিদ্ধ। পুরোহিত মহাশয় এখানে বিল্বপত্র ঘৃতে ডুবাইয়া মন্ত্র উচ্চারণসহকারে আমাদিগকে আহুতি প্রদান করাইলেন, এবং ঐ হোমাগ্নির তাপ আপন অঙ্গে লাগাইতে অনুমতি করিয়া এখানকার নিয়মগুলি পালন করাইলেন, তৎপরে এখান হইতে সীতাকুণ্ড নামক প্রাচীন পুণ্যকুণ্ডে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

সীতাকুণ্ড

সীতাকুণ্ড নামক তীর্থ কুণ্ডটী এক্ষণে কলির চারি সহস্র বৎসর অতীত হওয়ায় শ্রীরাম বাক্যে ভরাট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মহর্ষি ভার্গবের আশ্রম মন্দিরের চূড়াটী অদ্যাপি এই পবিত্র কুণ্ড স্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য মস্তক উন্নত করিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এখানে অপরাপর অনেকগুলি মন্দির ভগ্নাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানটী অতি নির্জ্জন এবং কানন সৌন্দর্য্যে এত

সমলঙ্কৃত যে এখানে উপস্থিত হইবামাত্র স্থানমাহাত্ম্যগুণে প্রাণ যেন ভগবৎপ্রেমে মুগ্ধ হয়। ভক্তগণ এক্ষণে এই নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া পাণ্ডাদিগের নিকট ইহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত হন, এবং সাধ্বীসতী সীতাদেবীর মহিমা স্মরণপূর্ব্বক স্থানীয় পুণ্যভূমির কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা মস্তকে লেপন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিতে থাকেন।

রাম ও লক্ষ্মণ কুণ্ড

মহর্ষি ভার্গবের আশ্রমের অনতিদূরে পাশাপাশি এই কুণ্ডদ্বয় অবস্থিত। এই কুণ্ড দুইটী ঠিক্ ছোট চৌবাচ্চার ন্যায় দেখিতে, কিন্তু সংস্কার অভাবে ইহাদের জল দুর্গন্ধময় হইয়াছে। যাহা হউক, পাণ্ডার উপদেশ মত এই কুণ্ডদ্বয়ের পবিত্র বারি স্পর্শ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিলাম। কথিত আছে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ভার্গব মুনির আশ্রমে শ্রীলক্ষ্মণ ও সীতাদেবীসহ উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদের প্রীতার্থে যোগবল অবলম্বনে তিনটী কুণ্ডের আবির্ভাব করেন। এই তিনজনের মধ্যে যিনি যে কুণ্ডে স্নান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, ঋষি ভার্গবের আদেশে সেই কুণ্ডটী সেই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপে এখানকার যাবতীয় তীর্থ স্থানগুলি দর্শন স্পর্শন ও সেবাপূর্ব্বক সেদিনকার মত পাণ্ডার সহিত সীতাকুণ্ডের বাসাবাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

এই কয়দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম অনিদ্রা এবং অনিয়মে আহার করিয়া অত্যন্ত কষ্টভোগ হওয়াতে সেদিন ইচ্ছানুরূপ আহার করিবার মানসে নিকটস্থ বাজারে প্রবেশ করিলাম। এই বাজার মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় মেছো হাটার শুটকী মৎস্যের দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল,

সুতরাং ফলমূল সম্মুখে যাহা পাইলাম, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া বাসা-বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম এবং আহারান্তে নির্ব্বিঘ্নে বিশ্রাম করিয়া যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইলাম। বিশ্রামান্তে খোদ পাণ্ডা অধিকারী মহাশয় আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া এই কয়দিন কিরূপে কোন্ কোন্ স্থান দর্শন হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন আমরা একে একে যে সকল তীর্থ স্থান দর্শন করিয়াছি, উহা প্রকাশ করিলাম। ইহাতে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন, আপনাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, কেন না এখান-কার যাবতীয় যে সকল প্রধান প্রধান তীর্থ আছেন, এক আদিনাথ ব্যতীত সকলগুলিই আপনারা দর্শন করিয়াছেন। এবার মাতা ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,"এই আদিনাথের দর্শন লাভ আমাদের ভাগ্যে কখন হইবে বাবা!" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "মা! এই আদিনাথের দর্শন অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে; কারণ এই তীর্থ স্থানটী প্রথমতঃ এখান হইতে বহু দূরে অবস্থিত, দ্বিতীয়তঃ আদিনাথের দর্শন যাত্রা করিতে হইলে এখান হইতে প্রথমে রেলযোগে চট্টগ্রাম, তৎপরে নৌকা বা ষ্টীমারযোগে জলপথে কত নদ নদী অতিক্রম করিয়া শেষ বঙ্গোপসাগরের মধ্যে মহেশখালি দ্বীপোপরি ভগবান আদিনাথের দর্শন লাভ হয়। এই নিমিত্ত বলিতেছি, তথায় অতি অল্প লোক প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়া থাকেন; বিশেষতঃ আপনারা স্ত্রীলোক, সঙ্গে ছোট ছোট পুত্র-কন্যা। এই সকল অসমর্থ লোক-দিগকে সঙ্গে করিয়া সেই দুর্গম জল পথে যাইতে আমি কখনই আপনা-দিগকে উপদেশ দিতে পারি না। এই আদিনাথ ভগবান স্বয়ম্ভূনাথের অষ্ট মূর্ত্তির মধ্যে অন্যতম এক অপমূর্ত্তি বলিয়া জানিবেন।" আদিনাথ ভগবান স্বয়ম্ভূনাথের অন্যতম মূর্ত্তি অবগত হইয়া পর্য্যন্ত আমার প্রাণ তাঁহার দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইল, তখন আমাদেরই দলমধ্যে চারি

বন্ধুতে পরামর্শ করিয়া কোনরূপে সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া ভগবানের দর্শন লাভ করিতে মনস্থ করিলাম এবং একটী উপযুক্ত লোক আমাদের সঙ্গে দিতে পাণ্ডা ঠাকুরকে অনুরোধ করিলাম। তিনি আমাদের আগ্রহ দেখিয়া সৌভাগ্যক্রমে বিনা বাধায় কথিত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বলাবাহুল্য, পাণ্ডার উপদেশ মত মাতা ঠাকুরাণী এই দুর্গম পথে আদিনাথ দর্শন আশা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন, ফলতঃ তাঁহাদিগকে অপরাপর আত্মীয়গণের তত্ত্বাবধানে পাণ্ডার বাটীতে রাখিয়া আমরা কেবল চারি বন্ধুতে আদিনাথ দর্শনের জন্য পর দিবস যথাসময়ে পাণ্ডা প্রদত্ত এক ব্রাহ্মণের সহিত চট্টগ্রাম যাত্রা করিলাম।

আদিনাথ দর্শন যাত্রা

বাসাবাটীতে ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া এখান হইতে সীতাকুণ্ড ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তথায় লোকে লোকারণ্য। এ লাইনে ইণ্টার ক্লাস গাড়ী অতি অল্পই থাকে, আবার দুই-একখানি ফার্ষ্ট ও সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী যাহা থাকে, তাহা সাহেব বিবিতেই পরিপূর্ণ হয়, সুতরাং বাধ্য হইয়া তিন আনায় চিটাগাং ষ্টেশনের টিকিট খরিদ করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় গরীব নীচ জাতীয় মুসলমানদিগের সহিত একত্রে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলাম, কারণ এই সকল লোক ভাতের হাঁড়ি সঙ্গে করিয়া আপন পুত্র-কন্যাদিগকে আমাদের সহিত একত্রে বসিয়া ভাত খাওয়াইতে লাগিল, যদিও আমরা ইহাতে আপত্তি করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কোনরূপ প্রতিকার করিতে পারিলাম না; কেন না এই রেলগাড়ী মধ্যে পোনের আনা যাত্রীই এই প্রকার—তখন আমাদের অনুরোধ কে রক্ষা করিবে? সে যাহা হউক, কিয়ৎকালের পর আদিনাথের কৃপায়

এবং আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ স্থানীয় একটী শিক্ষিত মুসলমান যুবক চট্টগ্রাম যাইবার জন্য আমাদেরই কামরায় উঠিলেন, এবং আমাদের সহিত নানাপ্রকার বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন, তাহারই অনুরোধে ঐ সকল নীচ জাতীয় লোক আমাদের নিকট হইতে কিছু তফাতে বসিল। পথিমধ্যে জগৎপিতা জগদীশ্বর ও রেলকর্ত্তৃপক্ষের অপূর্ব্ব সৃষ্টির নৈপুণ্য নয়নগোচর করিয়া আহ্লাদিত মনে গমন করিবার সময় দেখিলাম, কোন স্থান উচু নীচু পর্ব্বতমালায় শোভিত—নানাপ্রকার পার্ব্বত্যলতাগুল্মে পরিবেষ্টিত, কোথাও বেউতি বাঁশের বৃক্ষশ্রেণী ফলভরে অবনত হইয়া ক্ষুধার্ত্ত জীবগণকে ক্ষুধা নিবারণ করিবার জন্য সানন্দে আহ্বান করিতেছে; স্থানীয় লোকদিগের নিকট অবগত হইলাম, এই বেউতি বাঁশের ফলমধ্যে চাউলের ন্যায় এক প্রকার বীজ উৎপন্ন হয়, ঐ সকল বীজ সিদ্ধ করিলে দেখিতে ঠিক অন্নের ন্যায় দেখায়—অথচ উহা পুষ্টিকর; কোথাও বা পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে ক্ষীণকায় ফলশূন্য কদলী বৃক্ষ সকল নতশিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া ম্যালেরিয়াগ্রস্ত গ্রামবাসীদিগের দুর্দ্দশা প্রকাশ করিতেছে, কোথাও প্রশস্ত শ্যামল ক্ষেত্রভূমি শস্য শূন্য থাকিয়া ধূ ধূ করিতেছে, এবং জীবগণকে কিরূপে আহার যোগাইবে, ইহাই একমাত্র চিন্তা করিতেছে, আবার কোন স্থানে বা শাল, সেগুন প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী গর্ব্বভরে মস্তক উন্নত করিয়া প্রেমময় ভগবানের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছে। কি মনোহর দৃশ্য! প্রত্যেক দৃশ্যগুলিতেই সৃষ্টিকর্ত্তার যেন মহিমা প্রকাশ পাইতেছে, যাঁহারা এই স্থানে এই সকল অপূর্ব্ব মনোমুগ্ধকর লীলাময়ের সৃষ্টি নয়নগোচর না করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহার সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। রেলগাড়ী হইতে আমরা এই সকল চিত্তবিমুগ্ধকর দৃশ্য নয়নগোচর করিতে করিতে যথাসময়ে চিটাগাং নামক ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম।

চিটাগাং

সীতাকুণ্ড হইতে এই চট্টগ্রাম বার ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ষ্টেশনের নিকটেই ১১৫৫ ফুট উচ্চ এক শৈলমালা ঐ স্থানের নৈসর্গিক বেষ্টন প্রাচীরস্বরূপ ঊর্দ্ধ শির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। চিটাগাংএর অপর নাম চট্টগ্রাম, ইহা একটী সমৃদ্ধিশালী নগর। এখানে ব্যবসা উপলক্ষে কত ধরণের কত লোকদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। সহরের মধ্যে যেদিকে দৃষ্টিপাত হয়, সেইদিকেই টুপিওলা মস্তক ভিন্ন খালি মাথা বড়-একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। হাট, বাজার, দোকান, পসারী, হোটেল প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিলাম, সমস্তই মুসলমানদিগের দ্বারা পরিচালিত। বাজার মধ্যে যেখানে যাইবেন, কেবল শুট্‌কী মৎস্যের গন্ধে প্রাণ বাহির হইতে থাকে। বিশ্বস্তচিত্তে অবগত হইলাম, এখানে ধোপা নাপিত হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষিকর্ম্ম পর্য্যন্ত যাবতীয় কাজ-কর্ম্ম বেশীর ভাগ সর্ব্বত্রই মুসলমানদিগের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে; কারণ চট্টগ্রামে চৌদ্দ আনা অধিবাসী মুসলমান, এক আনা হিন্দু, আর এক আনা অবশিষ্ট নানা জাতীয় লোক ব্যবসা উপলক্ষে আসিয়া বসবাস করিতেছেন। চট্টগ্রাম এক প্রকার মুসলমানের দেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে সকল হিন্দু এখানে দেখিতে পাইলাম, তাহারা প্রায়ই বঙ্গদেশীয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে বঙ্গদেশীয় লোক জগতে হরিভক্ত বলিয়া খ্যাত, এখানে সেই সকল লোক দেশাচার গুণে হ্যাটকোট পরিধানপূর্ব্বক অবাধে মুসলমান বন্ধুদিগের সহিত একত্রে বসিয়া আহার করিয়া থাকেন। হরিনাম বা আহ্নিক কাহাকে বলে বোধ হয়, সে বিষয় তাহাদের মধ্যে অনেকে একবারও শিক্ষা লাভ

করেন নাই। এইরূপে সহরের শোভা দর্শন করিতে করিতে ব্রাহ্মণ ঠাকুরের সহিত নগরের প্রান্তভাগে প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া কর্ণফুলি নদীর তীরে এক স্থানে তাঁহারই এক শিষ্যের বাটীতে সেইদিনের জন্য আমাদিগকে লইয়া বিশ্রাম করিলেন। এখানে দুই-একখানি হিন্দু পরিচালিত হালুইকরের দোকান আছে, ঐ দোকান হইতে আবশ্যকীয় খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহপূর্ব্বক কোনরূপে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিলাম, এবং সেই রাত্রি তথায় যাপন করিলাম। পর দিবস প্রত্যূষে এই কর্ণফুলি নদীতে স্নান আহ্নিক সম্পন্ন করিয়া ৺আদিনাথ দর্শন উদ্দেশে এখান হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে চট্টগ্রাম ডকে যাত্রা করিলাম। এই ডকটী সহরের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত, তথায় প্রত্যেকে ১৲ টাকা দিয়া আদিনাথ নামক ষ্টেশনের টিকিট খরিদ করিলাম। বলাবাহুল্য, এই ডক্ হইতেই ষ্টীমারখানি আদিনাথ যাত্রা করে, সুতরাং ষ্টীমারখানি এই ডকের এক স্থানে সংলগ্ন থাকিয়া যাত্রীদিগের জন্য এবং সারেঙ্গের যাত্রা হুকুমের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছিল।

এখানে ডকের টিকিট ঘর হইতে আরম্ভ করিয়া নদীতীর পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য, তথাপি কোন যাত্রী ষ্টীমার কোম্পানীর নিয়মানুসারে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইতেছিলেন না, আবার এখানে যাত্রীদিগের বিশ্রাম করিবারও কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, সুতরাং বাধ্য হইয়া আমরা সকলে নদীতীরে পায়চারি করিতে লাগিলাম। সংবাদ পাইলাম, ষ্টীমারখানি সপ্তাহ মধ্যে এখান হইতে দুইবার আদিনাথ ষ্টেশনে যাত্রা করিয়া থাকে। প্রাতে বেলা নয় ঘটিকার সময় ষ্টীমার হইতে সঙ্কেতসূচক ঘণ্টা ধ্বনি হইল, তখন সকলেই হুড়াহুড়ি করিয়া ষ্টীমারে আরোহণ করিতে লাগিলাম, তৎপরে বংশীধ্বনি হইবামাত্র ষ্টীমারখানি ধীরে ধীরে এই কর্ণফুলি নদীর কতক দূর দক্ষিণ দিকে

প্রবাহিত হইয়া পরে পৃষ্ঠাভিমুখে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই পুনরায় দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া সমুদ্রের উপর পতিত হইল।

এই স্থানকে পার্ক বলে, আর এই সমুদ্রের নামই বঙ্গোপসাগর। ষ্টীমারখানি সমুদ্রে পৌঁছিবামাত্র যেন আছাড়ি পিছাড়ি খাইতে লাগিল, এই স্থানে সারেঙ্গের পুনরায় বংশীধ্বনি হইবামাত্র ইহা এই বিশাল সমুদ্রকে যেন অবজ্ঞাপূর্ব্বক সগর্ব্বে এক মনে বায়ুবেগে চলিতে লাগিল, যখন কর্ণফুলির শান্ত জলের উপর ধীরে ধীরে ষ্টীমার অগ্রসর হইতেছিল, তখন বিনা কম্পনে বেশ আরামে যাইতেছিলাম, ঐ সময় চট্টগ্রাম সহরের দৃশ্যগুলি একে একে দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছিল, আবার তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া যাইতেছিল; সম্মুখে অনন্ত নীলিমাময় অম্বুরাশি দীপ্ত রবির কিরণে স্বুবর্ণকার খেলিয়া খেলিয়া মরকত মণি-খচিত শত সহস্র হেম হার-গ্রথিত করিতেছিল, আবার খণ্ড খণ্ড করিয়া ঐ মালার রাশি খুলিয়া ফেলিতেছিল, রবিকরের সহিত নীলাম্বুর এই আনন্দ খেলা কি সুন্দর! ইহা এক অপূর্ব্ব মনোহর দৃশ্য!! সম্মুখে ও বাম পার্শ্বে কেবল অনন্ত বিস্তার মহা সমুদ্রের শোভা নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল; এখানে সমুদ্রে তরঙ্গের উপর তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে ষ্টীমারখানি হেলিতেছে দুলিতেছে—উঠিতেছে ও নামিতেছে, এখন আর নদীর ন্যায় ধীর, স্থির, শান্ত ভাব নাই, সুতরাং ষ্টীমারখানি বড়ই দুলিতে লাগিল, এই দুলুনি ক্রমেই যাত্রীদিগের অসহ্য বোধ হইতে লাগিল, এমন কি সেই সময় মনে হইতে লাগিল, ষ্টীমারখানি যখন এই তরঙ্গের উপরে উঠিতেছে, সকলকার নাড়ী সেই সঙ্গে বুকের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে, আবার যখন ইহা নীচে নামিতেছে, তৎসঙ্গে সকলকার নাড়ীও নীচের দিকে নামিতেছে, কি ভয়ানক ব্যাপার! চারিদিকে কেবল জল। সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে দক্ষিণে চতুর্দ্দিকে সুনীল আকাশ

নীলতর সিদ্ধি বর্ণের ন্যায় দূরে মহাচক্রে মিশিয়াছে—যে দিকে দৃষ্টি পড়ে, কেবল অনন্ত সাগর; মাথার উপর অচঞ্চল অনন্ত নীলাম্বর, পদতলে সচঞ্চল অনন্ত নীল রত্নাকর—নীলিময়—নীলিময়ে অপূর্ব্ব সম্মিলন, অনন্তে অনন্তে যেন প্রেমালিঙ্গন, কি মহান্! কি সুন্দর! অনন্ত অপরিমেয়, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান জগৎস্রষ্টার সৃষ্টি রহস্যের অনন্তত্ব এই সাগরবক্ষে নীলাকাশের তলে যেমন হৃদয়ঙ্গম হয়, এমন আর কিছুতে হয় কি? নীলাকাশ বিশ্বরূপ অনন্তের মহাভাগ—নীলাম্বুস্বামীর অনন্ত তরঙ্গোচ্ছায়া অনন্তের স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব, সমুদ্রবারির তরঙ্গ ভঙ্গে শা-শা-শা-শা অনন্ত অস্ফুট অব্যক্ত মধুর সঙ্গীতে কি অনন্ত স্মৃতি জাগরিত করিয়া দেয়, ইহা যেন অনন্ত স্বপ্ন রাজ্যের সৃষ্টি বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

কিন্তু হায়! আমাদের সকলকার অদৃষ্টে বিধাতা অধিকক্ষণ এ সৌন্দর্য্যোপভোগ লিখেন নাই; এখানে এই অতল সমুদ্রবক্ষে ষ্টীমারখানি মোচার খোলার মত ভয়ঙ্কর দোলায় সৌন্দর্য্য উপভোগ করা দূরের কথা—তখন মনে হইতে লাগিল, ভালয় ভালয় শুইতে পারিলে বাঁচি। সঙ্গীর মধ্যে কেবল কয়েক ঝাঁক সামুদ্রিক মৎস্য এক স্থান হইতে অপর স্থানে উড্ডীয়মান হইয়া দর্শকবৃন্দকে কৌতুক দে[illegible]ইতেছে, শুটিকত শুশুকৃকেও ভাসিতে দেখিলাম, আর জনপ্রাণীর মধ্যে আমরা এই ষ্টীমারপূর্ণ যাত্রী লোক, তাহাদের মধ্যে অনেকে শুইয়া পড়িয়াছেন, অনেকে বমি করিতেছেন, এই সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া ভয়ে কেবল ভগবান আদিনাথের শ্রীচরণ ধ্যান করিতে লাগিলাম; তখন বিষদভাবে বুঝিলাম, পাণ্ডা ঠাকুর কি নিমিত্ত স্ত্রীপুত্র লইয়া এ তীর্থ স্থানে যাইতে আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন। আমার কিঞ্চিৎ মস্তক ঘূর্ণন ভিন্ন এমন কোনরূপ উল্লেখযোগ্য অসুখ হয় নাই। ষ্টীমারখানি দুই ঘণ্টার

মধ্যে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া প্রথমে শঙ্খ নদী, তৎপরে ভোলা নদী শেষ মহেশখালি নামক নদীতে গিয়া পৌছিল। চট্টগ্রাম ডক্ হইতে এ কাল পর্য্যন্ত দক্ষিণাভিমুখে যত দূর গমন করিলাম, ইহার মধ্যে যতগুলি ষ্টেশনে ষ্টীমারখানি থামিল, দেখিলাম প্রায়ই ইহা নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনের মধ্যস্থলে গভীর জলে গতিরোধ করিয়া থাকে ; ইহাতে যাত্রী-দিগের উঠা-নামার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হয়। ষ্টীমারখানি ষ্টেশনে পৌছিবামাত্র তীর হইতে কত ধরণের কত প্রকার বাঙ্গলা দেশের ডোঙ্গার ন্যায় নৌকা আসিয়া যাত্রীদিগকে লইয়া যথাস্থানে পৌছাইয়া দেয়। ইহার নিমিত্ত প্রত্যেক যাত্রীকে ৴০ আনা হিসাবে পৃথক ভাড়া দিতে হয়। এইরূপে ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া যখন ষ্টীমার-খানি মহেশখালি নদীর মধ্য স্থলে আদিনাথ ষ্টেশনের জেটীতে উপস্থিত হইল, তখন এখানেও তীর হইতে বড় বড় ডোঙ্গার ন্যায় নৌকা সকল আসিয়া যাত্রীদিগকে লইয়া বাঁধা ঘাটে উঠাইয়া দিল। বলাবাহুল্য, এখানকার নিয়ম অনুযায়ী তীরে উঠিবার জন্য আমাদিগকেও পৃথক ৴০ আনা ভাড়া দিতে হইল।

মহেশখালি নদীর এই ঘাট হইতে পশ্চিমতীরে মৈনাক পর্ব্বতোপরি ৺আদিনাথের মন্দির শোভা পাইতেছে। ভগবান আদিনাথের কৃপায় এবং মাহাত্ম্যগুণে এই দ্বীপটী এক্ষণে সহরে পরিণত হইয়াছে। স্থানীয় পাণ্ডার নিকটে অবগত হইলাম, এই দ্বীপটী দৈর্ঘ্যে ২০ মাইল এবং প্রস্থে পাঁচ মাইল পথ অধিকার করিয়া মহেশখালি নাম ধারণ করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এখানে প্রসন্ন বাবু নামে একজন বাঙ্গালী জমীদার আছেন, তিনিই এখানকার রাজা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; বলা-বাহুল্য, তাঁহার কৃপা ব্যতীত কেহ এখানে সুখে থাকিতে পারেন না। এই প্রসন্ন বাবুর মহত্ত্বগুণে সকলেই তাঁহার বশীভূত ; কারণ আপদ-

বিপদে সকলকেই তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত সকলকার নিকটেই তাঁহার যশোগান শুনিলাম। আমরা বাঙ্গালী হইয়া অল্প সময়ের জন্য এখানে আসিয়া বাঙ্গালীর সুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। এই সদাশয় প্রসন্ন বাবুর এখানে একটী কাছারী বাটী আছে। কোন বিদেশী বাঙ্গালী যাত্রী এখানে উপস্থিত হইলে তাঁহার আদেশ মত তিনি অবাধে বিনা ভাড়ায় এই কাছারী বাড়ীর মধ্যে আবশ্যক মত বিশ্রামস্থান পাইয়া থাকেন। সীতাকুণ্ডের ব্রাহ্মণ ঠাকুর আমাদের সঙ্গে থাকায় এই অপরিচিত স্থান, চট্টগ্রাম বা এখানে বাসার নিমিত্ত আমাদিগকে কোনরূপ কষ্টভোগ করিতে হয় নাই। মহেশখালির তীরে পূর্ব্বোক্ত নৌকা হইতে তীরে উঠিবামাত্র স্থানীয় পাণ্ডার গোমস্তারা আমাদিগকে বেষ্টন করিলেন, এবং সীতা-কুণ্ডের পরিচিত ব্রাহ্মণটীকে আমাদের সহিত দেখিতে পাইয়া স্থানীয় একজন পাণ্ডা আমাদের সকলকে সমাদরে তাঁহার বাটীতে লইয়া গিয়া স্থানদান করিলেন। তাঁহার যত্নে আমরা সকলেই মুগ্ধ হইলাম, এবং তাঁহারই নিকটে অবগত হইলাম, যে ষ্টীমারখানিতে আমরা এখানে আসিয়াছি, ঐখানি সে দিবস তথায় অবস্থান করিয়া তৎপর দিবস বেলা দশ ঘটিকার সময় যাত্রী লইয়া এখান হইতে পুনর্ব্বার চট্টগ্রামে প্রত্যা-গমন করিবে, এইরূপ উপদেশ পাইয়া এই সময়ের মধ্যে আমরাও আপন কার্য্য সম্পন্ন করিতে মনস্থ করিলাম।

বাসাবাটীর সন্নিকটেই মৈনাক পর্ব্বত অবস্থিত। পর দিবস প্রত্যূষে পাণ্ডার উপদেশ মত স্নান করিবার সরঞ্জাম সমভিব্যাহারে আপন দল-বলসহ মৈনাক পর্ব্বতের পদপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই পর্ব্বতটী বেশী উচ্চ নয়, অথচ সোপানশ্রেণীতে সজ্জীকৃত। ইহার দুই ধারে দুইটী পুষ্করিণীর ন্যায় কুণ্ড আছে। পাণ্ডার উপদেশ মত আমরা

প্রথমে এক পুষ্করিণী বা কুণ্ডে স্নান করিয়া শুদ্ধকলেবরে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক দেবার্চ্চনার আবশ্যকীয় দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহসহকারে দেবালয়-স্থিত পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম। নিকটে কয়েকখানি পর্ণ-কুটীর, ইহাদের মধ্যে একখানিতে ৺আদিনাথের সম্পত্তির আদায়-তহ-বিলের কর্ম্মচারীগণ থাকেন। যাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্য কয়েকখানি ভগ্ন কুটীরও দৃষ্ট হইল, অবশিষ্ট দুই একখানিতে ভগবান আদিনাথের পূজার ডালার দোকান আছে। স্থানটী অতি নির্জ্জন ও মনোমুগ্ধকর। ইহার দুই দিকে বহু দূরব্যাপী খোলা পতিত জমি, অপর দুইদিকে পর্ব্বতমালায় পরিশোভিত। এই মৈনাক পর্ব্বতের শিখরদেশে উঠিবার সময় প্রাকৃতিক শোভা নয়নগোচর করিয়া আনন্দিত হইলাম, কারণ এই স্থানে কোন পর্ব্বতের গাত্র হইতে, কোন স্থানে লতাকুঞ্জের মধ্য-ভাগে কত প্রকার নানা বিচিত্র রঙ্গে রঞ্জিত পাহাড়ী পক্ষী সকল স্বাধীন-ভাবে আপন শাবকগণসহ আহার অন্বেষণ করিতেছে, কোথাও বা লম্বিত জটাজুটধারী সাধু সন্ন্যাসীগণ আপন আপন সম্মুখভাগে ধুনী প্রজ্জ্বালিত করিয়া মনের আনন্দে গাঁজায় দম দিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া "বম শঙ্কর আদিনাথ কী জয়" শব্দ করিয়া দিক্‌বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করি-তেছে, কোথাও বা ভিক্ষুকগণ একতারা ও খঞ্জনীর সাহায্যে তারকেশ্বর তীর্থ স্থানের ন্যায় ভগবানের মহিমা প্রচার করিয়া যাত্রীদিগের নিকট হইতে পয়সা ভিক্ষা করিতেছে। এইরূপ কত প্রকার কত ছলে কত লোককে এখানে দেখিতে পাইলাম,তাহার ইয়ত্তা নাই। শেষে পর্ব্বতের শিখরদেশে যথায় ৺আদিনাথের মন্দির অবস্থিত, তথায় উপস্থিত হই-লাম। মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবান আদিনাথের পবিত্র লিঙ্গমূর্ত্তি দর্শন স্পর্শন ও পূজার্চ্চনা করিয়া নয়ন এবং জীবন সার্থক করিলাম। এই লিঙ্গরাজ ৭।৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ব্যাসও প্রায় দুই ইঞ্চি পরিমিত হইবে।

লিঙ্গটী একটী গৌরী-পীঠের উপর অবস্থান করিতেছেন। ৺বৈদ্যন
নরলোকে প্রকাশ সম্বন্ধে যেরূপ প্রবাদ আছে, এখানেও পূজারীদিগে
নিকটে ঠিক্ সেইরূপ ৺আদিনাথের নরলোকে প্রকাশ সম্বন্ধে প্রব
শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।

এইরূপে ভক্তিসহকারে এখানে ভগবান স্বয়ম্ভুনাথের অষ্ট মূর্তি
অন্যতম আদিনাথের পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মহাব্রত উদ্যাপন কি
লাম। ভগবান আদিনাথের মন্দিরের পশ্চিম সংলগ্ন এক স্থানে অ
ধাতু নির্ম্মিত এক অষ্টভূজা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ভক্তগণ মানসিব
করিয়া তথায় ছাগ বলি দিয়া থাকেন, ইহার দক্ষিণে ভৈরবনাথ অব
স্থিত। মন্দির হইতে অবতরণপূর্ব্বক প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে একট
ছোট রকম বাজার পাওয়া যায়; যাত্রীরা তথায় আবশ্যক মত প্রয়ো
জনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া থাকেন। দেবস্থানের নিম্নভাগে
"গোরকঘাটা" নামক একটী খালের উপর সেতু পার হইয়া এ
বাজারে আসিতে হয়। বাজারের নিকটবর্ত্তী চতুঃসীমায় অন্যূন ৪০
শত মগজাতির বসতি আছে, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ধনী
এবং বাণিজ্য-প্রিয়, ইহাদের স্ত্রী, পুরুষ সকলেই হৃষ্টপুষ্ট এবং বলবান
মন্দিরের নিম্নভাগে মগদিগের প্রতিষ্ঠিত যে একটী পুষ্করিণী দেখিতে
পাওয়া যায়, ঐ পুষ্করিণীটিতে প্রত্যহ প্রাতে মগরমণীগণ আপন আপন
কাপড় পরিষ্কার করিয়া থাকেন, কিন্তু কোন বিধর্ম্মী লোককে ইহার
ইহার জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে দেয় না। যে সকল মগেরা এখানে বাস
করেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই মৎস্য ব্যবসায়ী। স্থানীয় মগ-জেলেরা
এখানে নদী বা নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে পঞ্চমী হইতে একাদশী তিথি পর্য্যন্ত
মৎস্য ধরিয়া থাকে, অপর সময় এ ব্যবসা বন্ধ রাখে, কারণ এই নির্দ্দিষ্ট
সময় ব্যতীত অপর সময় এখানে কোন মৎস্য জালে ধরা পড়ে না।

বৈদ্যনাথে যেরূপ একটী কর্ম্মনাশা নামে নদী দেখিয়াছেন, এখানেও সেইরূপ মৃতনদী নামে একটী নদী আছে, উহার কিম্বদন্তী ঠিক্ কর্ম্ম-নাশা নদীর উৎপত্তির ন্যায় শুনিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ রাবণ কৈলাস পর্ব্বত হইতে মহেশ্বরকে লঙ্কাপুরে লইয়া যাইবার সময় দেবগণের চক্রান্তে যে প্রস্রাব করিয়াছিলেন, সেই প্রস্রাবেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, এই নিমিত্ত ইহার "মৃতনদী" নাম হইয়াছে। এখানে বাজার, পুষ্করিণী, নদ, নদী ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত স্থান, আরও বাগান সমূহ যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, এই সমস্ত স্থানই জমীদার শ্রীযুক্ত প্রসন্ন-কুমার রায় মহাশয়ের এলাকাভুক্ত। এই স্থানের সন্নিকটেই উক্ত জমী-দার মহাশয়ের সেই পূর্ব্বোল্লিখিত কাছারী বাটী অবস্থিত। বিদেশী হিন্দু যাত্রীরা অবাধে এই স্থানেই বিশ্রাম সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। এই কাছারী বাটীতে তাঁহার যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন, যদিও আমাদের তথায় থাকিবার বা বিশ্রাম করিবার কোন বিশেষ আবশ্যক হয় নাই, তথাপি তাঁহাদের যত্নে মুগ্ধ হইয়া আমরা অল্পক্ষণ এখানে বিশ্রাম করিয়াছিলাম। বলাবাহুল্য, এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাদের আচার-ব্যবহারে আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। এখানে এই সকল কর্ম্মচারীর নিকট সন্ধান পাইলাম যে, এই জমিদারীর বাৎসরিক ২৫০০৲ হাজার টাকা আয় আছে, তন্মধ্যে ৭০০৲ শত টাকা রাজকর দিতে হয়। এইরূপে এখানকার দেবতা, মন্দির ও স্থানীয় বাগান, বাজার প্রভৃতির শোভা দর্শন করিয়া পাণ্ডাকে প্রণামী দিয়া সন্তুষ্টপূর্ব্বক যথাসময়ে ষ্টীমারযোগে স্বজনগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য সীতা-কুণ্ডে পুনর্যাত্রা করিলাম।

দার্জ্জিলিং

বা

ভগবান দুর্জ্জয়লিঙ্গ দর্শন যাত্রা

দেবাদিদেব দুর্জ্জয় নামক শিবলিঙ্গ দর্শনাভিলাষ করিলে এবং সহর কলিকাতা হইতে যাত্রা করিতে হইলে যাত্রীদিগকে প্রথমে শিয়ালদহ ষ্টেশনে ট্রেণে আরোহণপূর্ব্বক দামুকদিয়া-ঘাট নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়, তথায় ষ্টীমারযোগে অকুরান্ত দুরন্ত পদ্মানদী পার হইলে পর, সারা নামক স্থানে আবার ভিন্ন লাইনে ট্রেণে উঠিয়া, উত্তর-বঙ্গ রেলওয়ের সীমান্ত ষ্টেশন "শিলিগুড়ি" যাইতে হয়।

শিলিগুড়ি দার্জ্জিলিং সহরের উপত্যকা-প্রদেশ। এই স্থান হইতে দার্জ্জিলিং সহর পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিত। এই শিলিগুড়ি হইতে পুনরায় ডি, এচ, রেল পথে দার্জ্জিলিং হিমালয় নামক যে রেল লাইন আছে, তথায় ট্রেণে আরোহণ করিলে নির্ব্বিঘ্নে দার্জ্জিলিং নামক প্রধান ষ্টেশনে পৌঁছিতে পারা যায়, অর্থাৎ যে দিবস শিয়ালদহ ষ্টেশনে ট্রেণে আরোহণ করিবেন, যদ্যপি মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে অবতরণ না করেন, তাহা হইলে তাহার পর দিবস স্বচ্ছন্দে অপরাহ্নকালে দার্জ্জিলিং ষ্টেশনে

উপস্থিত হইতে পারিবেন। বলাবাহুল্য, এখানকার প্রসিদ্ধ দেবতা "দুর্জ্জয়লিঙ্গের" নামানুসারে সহরটীর নাম দার্জ্জিলিং হইয়াছে। দার্জ্জিলিং সহরের মহাকাল নামক পাহাড়ের কিছু নিম্নভাগে ভগবান মহেশ্বর "দুর্জ্জয় লিঙ্গ" রূপে বিরাজমান থাকিয়া ভক্তদিগকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন।

দার্জ্জিলিংগামী যাত্রীগণ ইচ্ছা করিলে রেলওয়ে কোম্পানীর নিয়মানুসারে শিলিগুড়ি জংশন ষ্টেশনে এখানকার শোভা দেখিবার জন্য এক দিবস বিশ্রাম করিবার অবসর পাইয়া থাকেন,পর দিবস সেই টিকিটেই আবার দার্জ্জিলিং যাত্রা করিতে পারেন। শিলিগুড়ি ষ্টেশনের সন্নিকটেই চা-ক্ষেত্র আছে। এখানে আমাদের পরিচিত এক বন্ধু কার্য্যোপলক্ষে বাস করিয়া থাকেন. সেই বন্ধুবরের সহিত সাক্ষাৎ এবং চা-বাগানের আবাদ দেখিবার জন্যই আমরা কয়েকজন সহযাত্রীতে পরামর্শ করিয়া ঐ দিবস তথায় অবস্থান করিতে মনস্থ করিলাম। এই ষ্টেশনের পর হইতে রেলপথের উভয় পার্শ্বেই চা-বাগানগুলির আবাদক্ষেত্র নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল।

এখানে ইউরোপীয়দের তত্ত্বাবধানে অনেকগুলি চায়ের আবাদক্ষেত্র আছে। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে প্রথম চা-বাগান অরব্ধ হয়, কোম্পানী ইহাতে বিলক্ষণ লাভবান হওয়াতে ক্রমে সুবিধামত ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ মধ্যে বহু দূর বিস্তৃতপূর্ব্বক এক্ষণে এ স্থানে ১২১টী চা-বাগানের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সকল চা-ক্ষেত্র অন্যূন ২৪০০ শত কুলী কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ কুলীই নেপালী।

হিমালয়ের পাহাড়তলিকে তেরাই বলে। ইহা জঙ্গলময় ও খাল-বিলে পরিপূর্ণ। স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম,

বিদেশী বিশেষতঃ উষ্ণ প্রধান দেশের লোক অল্প সময়ের জন্য অবস্থান করিলেও এখানকার দোষনীয় বায়ুপ্রভাবে এক প্রকার জ্বরাক্রান্ত হন। যিনি উক্ত জ্বরে আক্রান্ত হইবেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাকে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিতে হয়।

শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিঙ্গের পাদদেশ পর্য্যন্ত এই প্রশস্ত পঞ্চাশ মাইল জঙ্গলাময় তেরাইএর মধ্যে রংপুরের অন্তর্গত "রংভাই" নামক স্থানে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রথমে সিংকোণার চাষ আরম্ভ করিয়া এক্ষণে সেই চাষ বহু দূরব্যাপী বিস্তৃত করিয়াছেন। এই সকল তেরাইভূমির মধ্যে আবার স্থানে স্থানে মক্ষিকা বা মধু উৎপাদনের কারবার দেখিতে পাওয়া যায়। চা এবং সিংকোণা—এই উভয় ক্ষেত্রই ট্রেণ হইতে দার্জ্জিলিং যাত্রাকালীন পথিমধ্যে নয়নপথে পতিত হইতে থাকে। বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে, সিংকোণার বাকল হইতে কুইনাইন প্রস্তুত হয়—ডাক্তারগণ যে কুইনাইনের সাহায্যে জ্বর বন্ধ করিয়া থাকেন। এক্ষণে ইংরাজী চিকিৎসা শিক্ষার গুণে কি সহর কি পল্লীগ্রাম সকল স্থানেই ঐ কুইনাইন পরিচিত হইয়াছে।

হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ, ইহা ভারতবর্ষের উত্তর-সীমানায় অবস্থিত। সিন্ধু নদ হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত ৭৫০ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ১০০ শত ক্রোশ প্রস্থ। গঙ্গা ও সিন্ধু নদের নিম্নতল-ভূমি হইতে দক্ষিণ দিকের পাহাড়তলী আরম্ভ হইয়াছে, ইহার উত্তর-সীমানা তিব্বতদেশের অধিত্যকা ভূমি—সমুদ্র হইতে এই স্থান প্রায় দেড় ক্রোশ উচ্চ। এই সকল সমভূমি হইতে উপর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দূরবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী সাদা মেঘমালা বলিয়া ভ্রম হয়, বস্তুতঃ পর্ব্বতগুলিই মেঘের ন্যায় দেখায়, কিম্বা পাহাড়ের চূড়াস্থিত প্রকৃত মেঘমালাই দূর হইতে দৃষ্ট হয়, অনেক সময় উহা স্থির করা কঠিন।

সমভূমি হইতে যত এই স্থানের নিকটে যাওয়া যায়, বৃক্ষতলায় আচ্ছাদিত নিম্নতর পর্ব্বতগুলি ততই যেন বড় দেখায়, কিন্তু এই স্থান হইতে পশ্চাদ্বর্ত্তী উচ্চতর পর্ব্বতমালা দৃষ্টির বাহির হইয়া যায়।

হিমালয়ের পার্ব্বত্যমালার পাদদেশে দশ ক্রোশ প্রস্থ সমভূমি আছে। এই সকল সমভূমিকেই তেরাই বলে, তেরাইএর বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র বিন্ধ্যগিরি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার মধ্যে তিনটী প্রধান খণ্ড আছে, যথা—পশ্চিমে সিন্ধুনদ পরিসর ও এক বৃহৎ মরুভূমি, মধ্যস্থলে ও পূর্ব্বে গঙ্গাদেবীর অববাহিকা এবং উত্তর পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকা। মালব নামক মালভূমি গঙ্গা নদীর বদ্বীপ "ডেলটা।" বলাবাহুল্য, এই গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সংযুক্ত বদ্বীপ এই সকল সমতলক্ষেত্রের অন্তর্গত।

পর্ব্বত চুঁয়াইয়া সর্ব্বদা জল আসাতে ঐ সকল তেরাইভূমি সর্ব্বদা ভিজা থাকে, তাহাতে সূর্য্যের কিরণ পড়াতে অত্যন্ত ঘন জঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমস্ত তেরাইভূমি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এবং বন্য জন্তুতে পরিপূর্ণ। তেরাইভূমির পরই ২০০০ হস্ত উচ্চ এক পর্ব্বতশ্রেণী আছে, উক্ত স্থান শালবনে পরিপূর্ণ। তাহার পরই মধ্যে মধ্যে জলসিক্ত উপত্যকা-ভূমি। এই উপত্যকা-ভূমি "দূন" নামে খ্যাত, দূন প্রকৃত পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানে বিস্তর ধানের চাষ, আবার স্থানে স্থানে চা বাগানও আছে।

উপরোক্ত বিস্তৃত সমতলক্ষেত্রে যে সমস্ত লোক বাস করেন, তাহাদের আকৃতি কৃষ্ণবর্ণ সাঁওতালদিগের ন্যায়। উহারা "কোল বা মুণ্ডা" নামে প্রসিদ্ধ। আপন বুদ্ধিবলে ইহারা উত্তম উত্তম গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বসবাস করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে ধনী ব্যক্তিরা নানা প্রকার স্বর্ণের অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া আপন আপন ধনবলের পরিচয়

দিয়া থাকেন, এবং সুবিধাবোধে সময় মত আপন যোগ্যতা ও সৌন্দর্য দেখাইতে ত্রুটি করেন না। কোল বা মুণ্ডা জাতিরা অন্তরের সহিত গঙ্গাদেবীকে ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া থাকেন, এতদ্ভিন্ন সর্পরাজ অনন্তদেবেরও পূজার্চ্চনা করেন। ইহারা ভূত বা প্রেতযোনীকে অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকেন, তাহাদের প্রতিষ্ঠিত সেই উচ্চ পূজাপাদ গিরি-মন্দির যাহা গঙ্গোত্তরীদেবীর মন্দির নামে খ্যাত; যে মন্দিরটী ভূমি হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ উচ্চে অবস্থিত, যাহার অভ্যন্তরে পতিতপাবনী করুণাময়ী গঙ্গাদেবীর পবিত্র মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। যে মূর্ত্তি দর্শন করিলে পাষাণ প্রাণেও ভক্তির উদয় হয়, ঐ গঙ্গাদেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিতে অবহেলা করিবেন না। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত সেই উচ্চ গিরিস্থিত পবিত্র গঙ্গা মন্দিরের একটী চিত্র প্রদত্ত হইল।

দিলীপ পুত্র ভাগ্যবান্ ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হইয়া যে গঙ্গাদেবী সগর বংশধরদিগকে উদ্ধার করিবার মানসে প্রথমে এই উচ্চ হিমালয়ের অভ্যন্তরে এক চিহ্নিত গোমুখ হইতে কলকলরবে স্রোতস্বিনী হইয়া ভারতের সমতলক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি প্রথমে হরিদ্বারের উভয় তীরবর্ত্তী নগর সমূহের মধ্য ভেদ করিয়া ৭৮০ মাইল পথ অতিক্রমপূর্ব্বক প্রসারিত হইয়া সাগরসঙ্গমে মিলিতা হইয়াছেন। কথিত আছে, সেই প্রশস্ত পথের উভয় তীরস্থ ভূমিই পুণ্য তীর্থ।

সাগর-সঙ্গম বা কপিলাশ্রম—সাংখ্যাচার্য্য কপিলদেব সাগরতীরে তপস্যার্থ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে এই স্থানে অর্থাৎ বামনস্থলী হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে যে জঙ্গলাকৃতি বটবন আছে, তথায় তিনি সাংখ্যতত্ত্ব প্রচার করেন। ভগবান্ কপিলদেবের কিছু বিবরণ এই স্থানে দেওয়া আবশ্যক। ব্রহ্মার মুখ হইতে সৃষ্ট "কর্দ্দম ঋষি" প্রজাপতির নিকট প্রজা সৃষ্টি করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইলে তিনি

গিরিস্থিত গঙ্গোত্তরী দেবীর মন্দিরের দৃশ্য। [১২০ পৃঃ

সরস্বতীতীরে পুণ্যাশ্রমের এক স্থানে বসিয়া বিষ্ণুর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান বিষ্ণু তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া ঋষিকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলে, তিনি তাঁহাকে স্বীয় পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবদিগকে সাংখ্যতত্ত্ব জ্ঞানোপদেশ দিবার প্রার্থনা করিলেন, তৎ-শ্রবণে বিষ্ণু মৃদু হাস্যে বলিলেন, "বৎস! আমি মনুর কন্যার গর্ভে পুত্র-রূপে অবতীর্ণ হইয়া তোমার আশা পূর্ণ করিব।" এইরূপ আশ্বাস-প্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান করিবার কালে তিনি তাঁহাকে আরও বলিলেন যে, মহর্ষি মনু শীঘ্রই তাঁহার কন্যাকে তোমার করে সমর্পণ করিবার জন্য এই আশ্রমে উপস্থিত হইবেন।

এদিকে যথাসময়ে ব্রহ্মার বাহু-সহস্র হইতে সৃষ্ট যে মনু, তিনি দেবহূতি নামক যুবতী কন্যাকে সঙ্গে আনিয়া কর্দ্দমাশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্নেহের পুত্তলি দেবহূতিকে কর্দ্দমের করে সমর্পণ করি-লেন। কর্দ্দম এই নবযৌবনসম্পন্না সুন্দরীর রূপে মুগ্ধ হইয়া যোগসৃষ্ট বিমানে অবস্থানপূর্ব্বক উভয়ে মনের সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাদের অবস্থানকালে বহুকালাবধি রতি-ক্রীড়ার পর সুন্দরী দেবহূতির গর্ভে কতকগুলি কন্যা জন্মিল, তদ্দর্শনে কর্দ্দম দেবহূতিকে পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার তপস্যা করিবার স্থিরসঙ্কল্প করিলেন। তখন দেবহূতি ঋষির মনোভাব অবগত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন, "স্বামিন্! এতকাল আমি আপনার সহিত কেবল সুরত-ক্রীড়ায় রত থাকায় কোনরূপ জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হই নাই, অতএব দাসীর প্রতি সদয় হইয়া কিছু জ্ঞানদান করিয়া তপস্যায় গমন করুন।" দেবহূতির কাতর প্রার্থনায় কর্দ্দমের ভগবান বিষ্ণুর আশ্বাস বাক্য স্মৃতিপথে উদয় হইল, তখন তিনি দেবহূতিকে মধুর বচনে কহি-লেন "প্রিয়ে! দুঃখিত হইও না, এইবার সহবাসে জ্ঞানরূপী বিষ্ণু স্বয়ং

তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন, আমার বরপ্রভাবে তুমি তাঁহার দ্বারা জ্ঞানোপদেশ লাভ করিতে সমর্থ হইবে।" ঋষিবর এইরূপে দেবহূতিকে আশ্বাসপ্রদান করিয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক তপস্যায় রত হইলেন কালের গতি কে রোধ করিতে পারে, পরব্রহ্ম "বিষ্ণু" পূর্ব্ব সত্যপালন এবং জীবদিগকে সাংখ্য জ্ঞানোপদেশ দিবার কারণ যথাসময়ে সাংখ্যাচার্য্য কপিলরূপে দেবহূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন।

ঋষির বরপ্রভাবে কপিল ধরায় অবতীর্ণ হইয়া, প্রথমে গর্ভধারিণী দেবহূতিকে সাংখ্যযোগ উপদেশ দিয়া, সাংখ্য মত প্রচার করিবার অভিলাষে দেশবিদেশ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। সাগরতীরবর্ত্তী (ভাগীরথ-সাগরসঙ্গম) স্থানেই পূর্ব্বোক্ত বামনস্থলীর নিকটবর্ত্তী বট জঙ্গলের এক স্থানে কপিলদেবের একটী নির্দ্দিষ্ট উপদেশাশ্রম ছিল। কথিত আছে, এই আশ্রম স্থানেই তাঁহার শাপে সগরবংশ ভস্মীভূত হয়, শেষ পরম বৈষ্ণব দিলীপ রাজপুত্র "ভগীরথ" মহেশ্বরের উপদেশ মত স্বর্গ হইতে গঙ্গাদেবীকে স্তবে তুষ্টসহকারে এই পুণ্যাশ্রমে আনয়ন করিয়া তাঁহার পিতৃপুরুষদিগকে উদ্ধার করেন। এই নিমিত্ত অদ্যাপিও ভক্তগণ মুক্তি কামনা করিয়া সাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া থাকেন।

এই গঙ্গোত্তরিণী মন্দিরের আরও উর্দ্ধে যথায় একটী [illegible]নিহার মণ্ডিত স্থান আছে, সেই স্থানের নিম্নস্থ পথে বরফের গুহা হইতেই গঙ্গাদেবী-ভাগীরথী নামে খ্যাত হইয়াছেন। ভারত পাঠে জানা যায় সমুদ্র হইতে এই গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি স্থান অন্যূন ৭২০০ [illegible] উর্দ্ধে কিন্তু হরিদ্বার হইতে ৬৮৪ হস্ত উচ্চ, আবার বারাণসীতে ২৩২ হাত উচ্চে অবস্থান করিতেছেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে শিলিগুড়ি হইতে যেরূপে দার্জ্জিলিং সহরে উপস্থিত হইয়াছিলাম, পাঠক সমাজে সেই সমস্ত স্থানের কিছু পরিচয় দিব।

শিলিগুড়ি ষ্টেশনের উপরিভাগে এক স্থানে সাহেবদিগের খানা খাইবার জন্য একটী হোটেল আছে। সাহেব বিবিগণ এবং সাহেব-বেশধারী অনেক বাবু ভায়ারা তথায় বিশ্রাম সুখ অনুভব করিয়া থাকেন, কিন্তু নিষ্ঠাবান্ হিন্দু যাত্রীদিগের জন্য ষ্টেশন হইতে পল্লীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত পাতি পাতি অনুসন্ধান করিয়াও একটী বিশ্রামাগার প্রাপ্ত না হইয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত ও দুঃখিত হইলাম। কারণ ইংরাজ ও বাঙ্গালী উভয় শ্রেণীর লোকই রেল কোম্পানীর যাত্রী, কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই হিন্দু ভারতবাসীদিগকে বিশ্রামাগার অভাবে এবং বিবিধ প্রকারে কষ্টভোগ সহ্য করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, শিলিগুড়িতে অবতরণ করিয়া বিশ্রাম স্থান অভাবে আমরা মহা বিপদ্‌গ্রস্ত হইলাম।

এই ষ্টেশনের পাদদেশে "মহানন্দা" নামে এক স্রোতগামী নদী দেখিতে পাইয়া, তথায় গমন করতঃ প্রথমে ইহাতে অবগাহন করিয়া তৃপ্তিলাভপূর্ব্বক পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধুর সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই নদীদেহের অধিকাংশ স্থানই বালুকাপূর্ণ, ইহার এক পার্শ্ব দিয়া গয়াশীর্ষ ফল্গুনদীর ন্যায় স্বচ্ছ সলিলরাশি ক্ষীণধারায় প্রবাহিত হইতেছে। মহানন্দার উপরিভাগে একটী প্রশস্ত ৭০০ ফিট দৈর্ঘ্য সেতু আছে ঐ সেতুর উপর দিয়া ট্রেণের গতিবিধি হয়। বহু সন্ধানের পর পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী লাহিড়ী মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম সত্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার সাক্ষাৎলাভ হইল না। কারণ জলপাইগুড়ির মেলা উপলক্ষে সে দিবস তিনি ভগবান জলপাইশ্বরের দর্শন করিতে যাত্রা করিয়াছিলেন; উক্ত বাসায় তাহার অধীনস্থ লোক সকল আমাদের পরিচয় পাইয়া, অত্যন্ত যত্নসহকারে সেদিনকার জন্য তথায় বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন,

তাহাদের যত্নে আমরা সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। বলাবাহুল্য, যদ্যপি সেদিন এখানে না আসিতাম, তাহা হইলে বিশ্রাম স্থানাভাবে আমাদের কষ্টের সীমা থাকিত না। এখানকার জেলখানা, পুলিসকোর্ট প্রভৃতি এবং কেরাণী বাবুদিগের যে সকল ঘর বাড়ী দেখিতে পাইলাম, ঐ সমস্তই করুগেট টীনের চালযুক্ত। পল্লীর মধ্যে স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড ইদারা (কূপ) আছে, স্থানীয় অধিবাসীরা ঐ সকল কূপের জল পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। কর্ম্মোপলক্ষে অনেক বাঙ্গালী বাবু এখানে অবস্থান করিতেছেন। এইরূপে শিলিগুড়ি নগরের এবং চা বাগানের সৌন্দর্য্য দেখিয়া পর দিন যথাসময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দার্জ্জিলিং যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

শিলিগুড়ির ডি, এচ, রেল কোম্পানীর গাড়ীগুলি ই, বি, এস, রেল কোম্পানীর গাড়ী অপেক্ষা সাইজে অনেক ছোট। বসিবার বেঞ্চগুলি গাড়ীর কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে অবস্থিত। প্রত্যেক গাড়ীগুলিতে দুইটী করিয়া কামরা আছে, ঐ সকল কামরাগুলিতে দুইখানি করিয়া বেঞ্চ আছে, রেলকর্তৃপক্ষের আদেশানুসারে আটজন আরোহী ইহাতে বসিয়া থাকেন, কিন্তু পূর্ণযাত্রী অর্থাৎ আটজন আরোহী স্ব স্ব স্থান অধিকার করিলে সকলকে অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতে হয়। এখান হইতে গমনকালীন রেল পথের উভয় পার্শ্বেই চা-ক্ষেত্রের শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে এখানকার চা-বাগানের শোভা দেখিতে দেখিতে শুকণা নামক ষ্টেশন অতিক্রম করিলাম, এখানে রেল লাইনটী যেন বক্রভাব ধারণ করিয়া ক্রমে পর্ব্বতোপরি প্রসারিত হইয়াছে। এই রেল পথের উচ্চতংক্রম অধিক উচ্চ হইলেও ট্রেণখানি উপরে উঠিবার সময় কোনরূপ কষ্ট অনুভব হয় না, কিন্তু লাইনের পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই ট্রেণখানি কত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া

যায়। এই শুকনা নামক ষ্টেশন অতিক্রম করিবার পরই সেই যাত্রী-পূর্ণ ট্রেণখানি যেন স্বভাবের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখাইবার জন্য নির্ভয়ে নিবিড় নির্জ্জন বন মধ্যপথ ভেদ করিয়া পর্ব্বতগাত্রে ঘুরিতে ঘুরিতে যে লাইন স্থাপিত আছে, তাহার উপর দিয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। এই ঘূর্ণিত পথের কোন কোন স্থানের দৃশ্য অবলোকন করিলে প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়; কারণ লাইনের অনেক স্থানে পাহাড়ের পার্শ্ব দেশগুলি এরূপ অবস্থায় ঝুঁকিয়া আছে যে, দূর হইতে দেখিলেই মনে হয়—ট্রেণখানি ঐ স্থান অতিক্রম করিবার সময় নিশ্চয় উহাতে আঘাত লাগিবে, এবং চলন্ত ট্রেণখানি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে, পরক্ষণেই দেখিবেন, ট্রেণখানি ঐ ভয়াবহ স্থান অনায়াসে পার হইয়া এরূপ সঙ্কটাপন্ন গিরিগহ্বরের পার্শ্বদেশ দিয়া অতিক্রম করিতে থাকিবে, যদি দৈবাৎ কোনক্রমে তথায় গাড়ীখানি রেলভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই অতলস্পর্শী গহ্বরে পতিত হইয়া ট্রেণসহ যাবতীয় যাত্রীদিগকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে—সন্দেহ নাই। এই সকল ভয়াবহ সঙ্কটাপন্ন স্থান স্বচক্ষে দেখিয়া অতিক্রম করিবার সময় কাহার না প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়? কিন্তু করুণাময় ভগবান দুর্জ্জয়লিঙ্গের অপার কৃপায় এবং রেলওয়ে কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ারদিগের বিদ্যা ও বুদ্ধির কৌশলে, ঐ সমস্ত ভয়াবহ স্থান চক্ষের পলকে নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রমপূর্ব্বক অজস্র অনন্ত প্রস্রবন প্লাবিত স্থান পার হইয়াই, যাত্রীদিগের আনন্দ উৎপাদনের নিমিত্ত মুহূর্ত্ত মধ্যে জগদ্বিখ্যাত পাগলাঝোরা নামক ঝরণার নিকট গিয়া গমন করিতে লাগিল। এই পাগলাঝোরার ভীমকান্ত অদ্ভুত কীর্ত্তি দেখিবামাত্র ইহার পাগলাঝোরা নাম সার্থক বিবেচনা করিতে হয়, কারণ তাহার সেই প্রচণ্ড পাগলামী গতি দর্শন মাত্র ভয়ে হৃদ্‌কম্প হইতে থাকে। ঐ দৃশ্য যিনি একবার দেখিয়াছেন, ইহজন্মে তিনি তাহা

কখনও ভুলিতে পারিবেন না। এ দেশে পাহাড়ীরা ঝরণাকে ঝোরা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

পাগলাঝোরার পরবর্ত্তী স্থান হইতে রেল লাইনটী অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বলিয়া মনে হইতে লাগিল, অধিকন্তু এই সকল স্থানের দৃশ্য মনোমুগ্ধকর ; কেন না—এই পথ একবার পর্ব্বত গাত্রস্থ আঁকা-বাঁকা হইয়া কখন বামে, কখন দক্ষিণে গোলাকৃতির ন্যায় প্রসারিত হইয়াছে, অর্থাৎ এই মাত্র যে স্থান অতি নিম্ন বলিয়া মনে হইল, মুহূর্ত্ত মধ্যে গতিশীল ট্রেণের উপর হইতে সেই স্থান কত উচ্চ অনুমান হইতে থাকিবে ; ইহার প্রধান কারণ এই, যে পথ দিয়া একবার চলিয়া আসিলাম, পরক্ষণেই ঘুরিতে ঘুরিতে আবার সেই পথের পার্শ্বস্থ উন্নত পথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ঠিক্ যেন নাগরদোলায় আরোহণ-পূর্ব্বক দোল খাইতেছি ; পূর্ব্বে বোম্বে যাইবার কালীন এইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলাম। সহর মধ্যে এখানে বোধ হয়, সকলেই উপরে উঠিবার লৌহ নির্ম্মিত গোলাকার সিঁড়ীর অবয়ব দেখিয়া থাকিবেন, এই স্থানের রেল পথটী ঠিক সেইরূপভাবে ক্রমে উচ্চে উঠিয়াছে। সে যাহা হউক, এই দুরারোহণীয় নতোন্নত পথের সন্নিকটে আবার রেলওয়ে কোম্পানীর "ওয়ার্কসপ্" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—কি অদ্ভুত কৌশলে এখানে গাড়ীগুলি প্রস্তুত হইয়া লাইনের উপরে আসে, উহা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। বলাবাহুল্য, এই স্থানে ট্রে দেখিতে যেন মন্দগতিতে গমন করিয়া থাকে।

শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত পথিমধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তার যে অদ্ভুত সৃষ্টিলীলা স্বচক্ষে দেখিলাম, উহাতেই অর্থ ব্যয় সার্থক বিবেচনা করিলাম। এই পঞ্চাশ মাইল পথ অতিক্রম করিবার সময় প্রধান প্রধান ষ্টেশনে সাহেবদিগের বিশ্রামের জন্য কত স্থানে কত প্রকার

১২৭ পৃঃ

দার্জ্জিলিং ষ্টেশন।
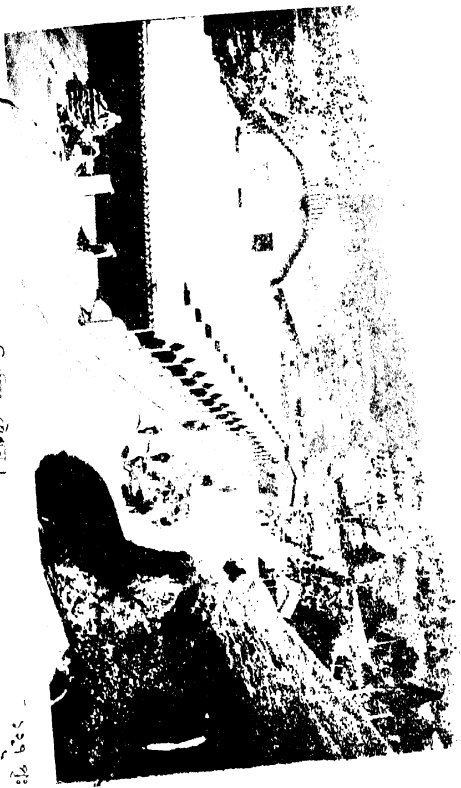
হোটেলও দেখিতে পাইলাম। এইরূপে ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া যখন "টুং" নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম, তখন পার্ব্বতীয় বৃক্ষলতাদি এবং পার্ব্বত্য উপত্যকার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য কুসুমরাশিতে পরিশোভিত, আরও স্বভাবের কত প্রকার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য নয়ন-গোচর করিতে করিতে "ঘুম" নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। যাঁহারা সিঞ্চলের অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহা-দিগকে এই স্থান হইতে সিঞ্চলে যাইতে হইবে। ঘুম নামক ষ্টেশনটী সমতলভূমি অপেক্ষা ৭৪০৭ ফিট উচ্চ, আবার এই স্থানের দৃশ্য— ঠিক্ যেন সমতল পথটী মেঘমালা ভেদ করিয়া স্বর্গোপরে বসিয়া রহি-য়াছে। দার্জ্জিলিং সহরটী ইহার ৩০০ ফিট নিম্ন ভাগে অবস্থিত, এই স্থান হইতে শীতের প্রকোপ অত্যন্ত অধিক সহ্য করিতে হয়; সুতরাং দার্জ্জিলিং যাত্রা করিবার পূর্ব্বে রীতিমত শীত বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া লইবেন।

শীত ঋতুতে এই অত্যুচ্চ স্থানের বিষয় বর্ণনা করা অসাধ্য, হাত পা যেন অসার হইয়া যায়। ঘুম ষ্টেশনের পরই জগদ্বিখ্যাত দার্জ্জিলিং ষ্টেশন গর্ব্বভরে নূতন যাত্রীদিগকে আপন শোভা দেখাইবার জন্য মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই ষ্টেশনটীর শিল্পনৈপুণ্য এমনি মনোমুগ্ধকর যে, দূর হইতে ইহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে যেন একখানি সুশোভিত চিত্র টাঙ্গান রহিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়। এই সকল পথের উভয় পার্শ্বের প্রাকৃতিক শোভা দৃষ্ট হইলে, পথশ্রমের কষ্ট এবং অর্থ ব্যয় সার্থক হইল বলিয়া মনে হইতে থাকিবে, তাই আবার বলি, দেশ বিদেশ পর্য্যটন না করিলে, এবং সৃষ্টি কর্ত্তার সৃষ্টি লীলা সকল স্বচক্ষে দর্শন না করিলে, কেহ কখন জ্ঞানী বা কর্ম্মবীর হইতে পারেন না। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত দার্জ্জিলিং ষ্টেশনের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

দার্জ্জিলিং সহরটী অতি উচ্চে অবস্থিত, এমন কি যে উচ্চ স্থানে

মেঘের উৎপত্তি ও স্থিতি, সেই অত্যুচ্চ অগম্য মেঘ প্রদেশে কি অদ্ভুত কৌশলে উচ্চ পাহাড় সকলকে সমতল করাইয়া সহরটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে বিষয় একবার চিন্তা করিলে আত্মহারা হইতে হয়। এই সহরের উত্তর সীমানা সিকিম রাজ্য, দক্ষিণে পূর্ণিয়া, পূর্ব্বে ভুটান এবং পশ্চিমে স্বাধীন নেপাল রাজ্য বিদ্যমান।

হিমালয়ের সিকিমগিরিশ্রেণীর মধ্যস্থলে দার্জ্জিলিং সহরটী অবস্থিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই স্থানটী তত প্রশস্ত না হইলেও অসংখ্য অট্টালিকায় পরিপূর্ণ, সুতরাং ইহা বসতিপূর্ণ। এই অপূর্ব্ব সহরটীর সৌন্দর্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। দার্জ্জিলিং জেলার নিম্নভূমিতে ধান্য, পাহাড়ে গম, ভুট্টা, গোল আলু, কড়াইশুটী, কপি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পর্ব্বতের যে অংশে সহরটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে অংশ তত উচ্চ নয়।

দার্জ্জিলিং বাঙ্গালা দেশের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র উপবিভাগ। এখানে জলবায়ুর অমোঘ স্বাস্থ্যগুণ থাকায় এক্ষণে ভারতবাসীদিগের নিকটতর পর্ব্বত আবাস হইয়াছে। বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধির গ্রীষ্ম ঋতুর রাজধানী নিবন্ধনহেতু দার্জ্জিলিং সহরটী আরও এক সুবিখ্যাত জনপদ হইয়াছে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে সিকিম ও নেপাল রাজার মধ্যে সীমার পরিমাণ লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, চতুর সিকিমপতি বিনা রক্তপাতে কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে ইহার মীমাংসার নিমিত্ত মধ্যস্থ স্বীকার করেন, তখন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কতিপয় বিশ্বস্ত ও বহুদর্শী বিচক্ষণ উচ্চ পদস্থ প্রতিনিধির দ্বারা এই বিবাদ সহজেই মিটাইয়া আপন মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন। এইরূপে ইংরাজেরা নির্ব্বিবাদে সুস্থ শরীরে কিছুদিন তথায় অবস্থান করিবার পর, এই স্থানের স্বাস্থ্যের পরিচয় পাইয়া, প্রত্যাগমনকালে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক

মহোদয় সমীপে দার্জ্জিলিংএর স্বাস্থ্যগুণের বিষয় যথাযথ বর্ণনা করেন, তৎশ্রবণে তিনি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে দার্জ্জিলিং নামক পার্ব্বত্য প্রদেশটী মূল্য গ্রহণ অথবা অন্য স্থান বিনিময় কিম্বা কর-কার্য্য করিয়া সিকিমপতিকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে অর্পণ করিতে অনুরোধ করেন। সিকিমপতি ইহাতে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বিনা বাক্যব্যয়ে সন্তুষ্টচিত্তে বার্ষিক ৩০০০৲ সহস্র মুদ্রা কর-ধার্য্য করিয়া, এই প্রদেশটী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে সমর্পণ করেন। এইরূপে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্ক মহোদয়ের আমলে ঐ স্বাস্থ্যপ্রদ দার্জ্জিলিং নামক স্থানটী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীনস্থ হয়। তৎপরে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মেজর লয়েড মহোদয়ের উদ্যোগে এবং তাঁহার ঐকান্তিক পরিশ্রমে, এই ক্ষুদ্র স্বাস্থ্যপ্রদ পার্ব্বত্য স্থানটীতে ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি পর্ব্বত সমভূমি করাইয়া সংযুক্তপূর্ব্বক বহু দূরব্যাপী বিস্তৃত হইয়া ঐ নির্জ্জন জনপাদশূন্য পার্ব্বত্য প্রদেশ, এক্ষণে স্বর্গের দ্বিতীয় নন্দনকানন-স্বরূপ শোভা পাইতেছে।

যে দার্জ্জিলিং ভারতবাসী এবং বিদেশবাসীদিগের পর্ব্বত আবাস, যে দার্জ্জিলিংএ অসুস্থ হইলে মানবগণ ডাক্তারদিগের উপদেশ মত স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিয়া থাকেন, যে দার্জ্জিলিং সহরকে স্বর্গের নন্দনকাননের সহিত তুলনা করা হয়, সেই দার্জ্জিলিং সহরে যাইবার পূর্ব্বে সুদক্ষ প্রবীণ ডাক্তারগণের উপদেশ বাক্যগুলি কর্ত্তব্যবোধে পালন করিতে পারিলে, এবং সকল বিষয়ে সতর্ক হইয়া থাকিলে নূতন যাত্রীগণের বিশেষ উপকার হয়। পরহিতৈষী সর্ব্বজনপ্রিয় সুদক্ষ প্রবীণ ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় সাধারণের হিতার্থে সন ১৩১৮ সালের ১১শ বর্ষের ৫ম সংখ্যা, "বসুধা" নাম্নী মাসিক পত্রিকায় অসুস্থ রোগীদিগকে দার্জ্জিলিং যাইবার পূর্ব্বে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম এই স্থানে প্রকাশিত হইল :—

১। ভারতবাসীরা স্বেচ্ছাক্রমে দার্জ্জিলিংএ বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গমন করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রথমে তাঁহাদের জানা আবশ্যক, এখানকার জলে এক প্রকার খনিজ পদার্থ মিশ্রিত থাকায় উক্ত জল পান করিলেই উদরাময় হয়, অতএব কোন নূতন যাত্রী তথায় উপস্থিত হইয়া কর্ত্তব্যবোধে পাষ্টার কৃত ফিল্টারের জল ব্যবহার করিবেন। এইরূপ আবার অপরাহ্ন পাঁচটার পর এখানে কোন তরল পদার্থ পান না করিলেও উদরাময় নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

২। দার্জ্জিলিংএ অবস্থানকালে ত্বকে অধিক পরিমাণে শোণিত সঞ্চারিত হয়, ইহার ফলে ত্বক পরিপুষ্ট হইয়া শরীরে বলাধান হয় সুতরাং অতিরিক্ত শৈত্য সেবনেও দেহের কোনরূপ অপকার করিতে পারে না।

৩। সারাঘাট হইতে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত যাইতে যাইতে প্রায়ই যাত্রীদিগের নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকে, নিদ্রা যাইবার সময় অনাবৃত গায়ে থাকা কোনরূপেই উচিত নয়, কারণ ইহাতে শরীরে ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুস্থ হইবার সম্ভাবনা। তিনধরিয়া নামক ষ্টেশন হইতেই শীত বস্ত্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যাঁহার শরীর সবল, তিনি সোনাদহ ষ্টেশনের পর হইতেই গরম বস্ত্র ব্যবহার করিবেন, অর্থাৎ সাবধান হইবেন, কোনরূপে শরীরে যেন ঠাণ্ডা না লাগে। ইহার ফলে শরীর সুস্থ ও সবল হইবে।

৪। অসুস্থ শরীর লইয়া যাঁহারা দার্জ্জিলিং সহরে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যাত্রা করিবেন, সে সময়টী যদ্যপি শীতকাল হয়, তাহা হইলে তাঁহারা পথিমধ্যে কিছুদিন "খরসান" নামক স্থানে যেন অবস্থান করেন, কেন না একেবারে ৭ হাজার ফিট উচ্চ দার্জ্জিলিং সহরে অবস্থান করিলে কখনই এদেশবাসীরা অত ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারিবেন না।

৫। যে সকল শিশু রোগজীর্ণ ও অত্যন্ত দুর্ব্বল, দার্জ্জিলিংএর ব

ায়ুতে তাহাদের অত্যন্ত উপকার হয়, এমন কি অল্পদিনের মধ্যেই ঐ কল রুগ্ন শিশু হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া জনকজননীর আনন্দ বৰ্দ্ধন রিতে থাকে। বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা দার্জ্জিলিং সহরে অবস্থান করিলে নিশ্চয়ই নষ্ট স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারেন।

৬। অর্দ্রভূমিতে যে সকল রোগ জন্মে, দার্জ্জিলিংএ বাস করিলে সে সকল রোগের আশঙ্কা থাকে না, কিন্তু শীতকালে একটু আধটু সর্দ্দি-কাসি হয় সত্য—সে সর্দ্দি প্রায়ই বুকে বসে না।

৭। দার্জ্জিলিং সহরে উপস্থিত হইয়াই ঈষৎ উষ্ণজলে ভাল করিয়া স্নান করিবেন, ইহাতে শরীর সুস্থ ও মন প্রফুল্ল হয়। এক বিষয়ে সতত সতর্ক থাকিবেন যে, এখানে বেড়াইবার সময় যেরূপ গরম বস্ত্র ব্যবহার করিবেন, মুক্ত স্থানে থাকিবার সময় উহা অপেক্ষা মোটা বা গরম কাপড় ব্যবহার করিলে শরীর সবল ও সুস্থ থাকে।

৮। পরিধেয় বস্ত্রাদি এবং শয্যা শুষ্ক করিবার জন্য একটু বিশেষ যত্ন লইতে পারিলে বর্ষার শৈত্য-স্বাস্থ্যের কোনরূপ হানির সম্ভাবনা থাকে না। নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত এখানে মোটেই বৃষ্টি থাকে না, ঐ সময় দার্জ্জিলিংএ সূর্য্যোদয় দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সুনীল নভোমণ্ডলে নক্ষত্র ও চন্দ্রের জ্যোতিঃ প্রতিভাত হয়, অর্থাৎ এই সময়েই দার্জ্জিলিংএ অবস্থান অধিক স্বাস্থ্যপ্রদ। জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এখানে প্রবলবেগে বারি বর্ষণ হইয়া থাকে, ঐ সময় এখানকার স্বাস্থ্য খুব ভাল। মার্চ্চ ও মে মাসে দার্জ্জিলিংএর জলবায়ু মাঝামাঝি, বাঙ্গালী বাবুরা প্রায়ই এই সময় এখানে বেড়াইতে আসেন।

৯। সমতলবায়ু অবসাদক, পাহাড়ের বায়ু উত্তেজক—সুতরাং রোগীকে দার্জ্জিলিং পাঠাইবার পূর্ব্বে তাহার শারীরিক বল উপযুক্ত ডাক্তার দ্বারা ভালরূপে পরীক্ষা করাইয়া, তাঁহার উপদেশ মত এখানে

নির্ব্বিঘ্নে আসিতে পারেন। যে রোগী অত্যন্ত বলহীন এবং যাঁহার দেহ কঙ্কালসার, তাঁহাকে যেন কেহ কখন এই অত্যুচ্চ পর্ব্বতাবাসে না পাঠান; কারণ এরূপ অবস্থায় রোগীকে তথায় পাঠাইলে কোনরূপ উপকারের পরিবর্ত্তে বরং এরূপ অপকার হইবার সম্ভাবনা যে, তথায় অবস্থানকালে অধিকতর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, এমন কি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে হয় ত তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। ইহার প্রধান কারণ পর্ব্বতাবাসে যে উত্তেজনা জন্মে, রোগীর উহা সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকা একান্ত আবশ্যক।

১০। ম্যালেরিয়ার গ্রাস হইতে এবং মানসিক ও শারীরিক শ্রমের কুফল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ডাক্তারদিগের উপদেশ মত অনেকে এই দার্জ্জিলিং সহরে কিছুদিনের নিমিত্ত অবস্থান করিতে গমন করেন, কিন্তু যাঁহাদের শরীরে ম্যালেরিয়া বিষ একবার প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহারা এখানে আসিলে প্রথম প্রথম দু-চারদিন জ্বরভোগ করিতে পারেন, তাহাতে ভয় পাইয়া পলাইয়া আসিবেন না, সপ্তাহের পর নিশ্চয়ই সুফল পাইবেন। শ্বাস বা কাসরোগে দার্জ্জিলিং বাসে, কাহারও রোগের বৃদ্ধি হয়, আবার কাহারও বা রোগের শান্তি হয়, উহা রোগীর ধাত বিশেষ জানিবেন। স্থূলকায় ব্যক্তি প্রথমতঃ এই উচ্চ পাহাড়ে উঠিলে হৃদ্‌রোগগ্রস্ত হইতে পারেন, কিন্তু কিছুদিন তথায় বাস করিলেই উহা সারিয়া যায়।

১১। আমবাত বা বসন্ত রোগাক্রান্তের পর বা যে কোন কারণে হৃদ্‌পিণ্ডের আকারগত দোষ জন্মিলে কোন পার্ব্বত্যপ্রদেশে যাওয়া উচিত নহে; বৃদ্ধাবস্থায় পুরাতন গ্রহণী বা আমাশয়াদি উদরাময়, যকৃৎ প্লীহার অতি বৃদ্ধিতে পুরাতন কাস, ফুস্‌ফুসের যান্ত্রিক বিকারে দার্জ্জিলিং বাস একেবারে নিষিদ্ধ। যে সকল রোগী জলবায়ু পরিবর্ত্তনের

জন্য এখানে বাস করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা উপরোক্ত উপদেশ বাক্যগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

১২। সমতলক্ষেত্রে বাস করিয়া,—অধিক পরিশ্রম বা জনতাবহুল সহরে বাস করিয়া, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য ঘটিলে, দার্জ্জিলিংএ বায়ু পরিবর্ত্তন্ কর্ত্তব্য বোধ করিবেন। দীর্ঘকালব্যাপী রোগ ভোগের পর, দুর্ব্বল অবস্থায় "ম্যালেরিয়া" বিষে শরীর দূষিত হইলে, শিশুদিগের শরীর পোষণের ব্যাঘাত ঘটিলে অথবা অধিক শ্লেষ্মাযুক্ত কাশ-রোগ এবং যক্ষ্মা-রোগের প্রথম অবস্থায় পর্ব্বতবাসের মত ঔষধ ও পথ্য আর দ্বিতীয় নাই। বহুমূত্র রোগে পর্ব্বতবাস বড়ই উপকারী, কিন্তু শরীর বেশী দুর্ব্বল হইতেছে, ঐরূপ অনুমান করিলে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিবেন। অন্ততঃ ভ্রমণ করিবার সামর্থ থাকা চাই, পাহাড়ে উঠিলে পাঁচ-সাতদিন তাঁহাদের প্রস্রাব বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে ভয় করা উচিত নয়, কারণ ইহা এখানকার স্বাভাবিক অবস্থা।

১৩। পর্ব্বতারোহণে হৃদ্‌পিণ্ডের শোণিতস্রোত দ্রুতবেগে বহিতে থাকে, কি সুস্থ কি অসুস্থ, এখানে অবস্থানকালে তাঁহাদের জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হয়, সে ক্ষুধা কাহারও আগাগোড়া সমান থাকে, আবার কাহারও বা দিনকতক পরেই কমিয়া যায়। পরিপাক শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বল ও মাংস বৃদ্ধি হয়, মাংসপেশী সমূহ এত দূর দৃঢ় হয় যে, লোকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত বোধ করেন না।

১৪। স্বদেশে নিদ্রাদেবীর সহিত যাঁহার প্রণয় নাই, এখানে উপস্থিত হইলে নিদ্রাদেবী তাঁহার সহচরী হইয়া পড়েন। বাঙ্গালা দেশে বায়ুর উত্তাপ ও মানসিক উদ্বেগে নিদ্রার প্রায়ই ব্যাঘাত হয়, কিন্তু দার্জ্জিলিংএর প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া মনে নিশ্চয়ই বিপুল আনন্দ জন্মে, এবং শৈত্য সেবন জন্য মস্তিষ্ক শীতল হয়, এই উভয়

কারণে এখানে ঘুমের দেখা পাওয়া যায়। অনেকের আবার এমন নিদ্রাকর স্থানে আসিলেও ভালরূপ নিদ্রা হয় না, কিন্তু সে কষ্ট বেশী দিন থাকে না।"

দার্জ্জিলিং ষ্টেশনে ট্রেণখানি উপস্থিত হইবামাত্র এখানে যে স্বাস্থ্য-নিবাস আছে, সেই স্বাস্থ্যনিবাসের জমাদার কতিপয় সঙ্গীসহ তীর্থ স্থানের পাণ্ডাদিগের ন্যায় প্রত্যেক রেলগাড়ীর কামরাতে আসিয়া "স্যানি-টেরিয়মে" বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিতে থাকে। যে সকল যাত্রী তাহাদের কথামত তথায় অবস্থান করিতে অভিলাষ করেন, তাহার যত্নের সহিত উক্ত যাত্রীকে স্যানিটেরিয়মে লইয়া যায়। ষ্টেশনের অনতিদূরে কিঞ্চিৎ নিম্নভাগে স্যানিটেরিয়ম নামক এই বিশ্রামাগারটি অবস্থিত। এই অপরিচিত পার্ব্বত্যদেশে বিদেশী যাত্রীগণ ইহাতে সুখ স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারেন, আরও তথায় সহযাত্রীদিগের নিক নানা বিষয় উপদেশ পাইয়া আপন কার্য্যও সাধন করিতে পারেন অনুসন্ধানে জানিলাম, পত্রদ্বারা পূর্ব্ব হইতে এখানে থাকিবার জ সংবাদ পাঠাইলে,ইহার অধ্যক্ষ মহাশয় উক্ত যাত্রীর জন্য কামরা রিজা করিয়া রাখেন, তন্নিমিত্ত কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইতে হয়। ভারত বাসীদিগের সুবিধার জন্য এরূপ একটী স্বাস্থ্যনিবাস এখানে প্রতিষ্ঠি হওয়ায়, বিদেশী যাত্রীদিগের যে কত উপকার হইয়াছে, উহা লেখনী দ্বারা বলা অসাধ্য। এই স্যানিটেরিয়মে অবস্থানকালে যে উদ্দেশ্যে ই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত হইলে তাহা সার্থক হ য়াছে বলিয়া বিবেচনা করিবেন সন্দেহ নাই।

এখানে দুইটী স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একটী ইংরা দিগের—অপরটী ভারতবাসীদিগের। ইংরাজেরা যেটীতে অবস্থ করেন, সেটীর নাম "ইডেন স্যানিটেরিয়ম"। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট বহু অ

ব্যয়সহকারে এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহপূর্ব্বক ইহাকে মনের মত নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্গতুল্য করিয়াছেন। যে স্যানিটেরিয়মটী দেশীয় রাজাদিগের সাহায্যে নির্ম্মিত, কিন্তু সেই স্যানিটেরিয়মে কোন ভারতবাসীর প্রবেশ অধিকার নাই, কারণ সাধারণে ইহাতে প্রবেশ করিলে ইহার সম্মান থাকিবে না। সুতরাং সাধারণ ভারতবাসীদিগের নিমিত্ত ঐরূপ একটী পৃথক্ লজ "জুবিলী স্যানিটেরিয়ম" নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে যে মাসে যখন ভারতেশ্বরী কুইন-ভিক্টোরিয়ার জুবিলি উৎসব হয়, সেই সময় দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট, তাঁহার চিরস্থায়ী একটী স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত করিবার প্রস্তাব করিলে, কুচবিহারের মহারাজ স্বেচ্ছায় তাঁহার দার্জ্জিলিংস্থিত ২৩ বিঘা জমি দান করিয়া উক্ত প্রস্তাবে সাহায্য করেন, তদ্দর্শনে রংপুরাধিপতিও এই শুভ প্রস্তাব সম্পন্ন করিবার জন্য ১০০০০০৲ টাকা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করেন। এইরূপে এই সকল মহাত্মাদিগের অনুকম্পায় এবং স্থানীয় ভূতপূর্ব্ব কমিসনার লাউইস সাহেবের উদ্যোগে ইহা সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মিত হইলে, উক্ত কমিসনার সাহেবের সম্মান রক্ষার্থে সকলে পরামর্শ করিয়া তাঁহারই নামানুসারে এই বিশ্রামাগারটী "লাউইস জুবিলি স্যানিটেরিয়ম" নামে প্রসিদ্ধ করেন।

ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বিভিন্ন জাতি স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার উদ্দেশে, এখানে দৈনিক খরচ দিয়া অনায়াসে অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সুবিধার নিমিত্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যুক্তিপূর্ব্বক ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। একটী সাধারণ বিভাগ, অপরটী নিষ্ঠাবান হিন্দু বিভাগ—উভয় বিভাগই আবার সাধারণের খরচের সুবিধার জন্য তিনটী করিয়া শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট আছে, যিনি যেরূপ ক্ষমতানুসারে ব্যয় করিতে পারিবেন, তিনি সেইরূপ বিভাগে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিয়া থাকেন।

প্রত্যেক বিভাগের দৈনিক ব্যয়ের একটী তালিকা নির্দ্দিষ্ট আছে, অর্থাৎ গ্রাহককে ইহার প্রথম বিভাগে থাকিতে হইলে রোজ প্রতি ৪॥০ টাকা, দ্বিতীয় বিভাগে ৩৲ এবং তৃতীয় বিভাগে ১৲ টাকা খরচ দিতে হয়। বলাবাহুল্য, এই সাধারণ বিভাগে সকল প্রকার খাদ্য-সামগ্রীর একাকার আছে, অর্থাৎ মদ মাংস প্রভৃতি যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ আহার করিয়া থাকেন, কিন্তু নিষ্ঠাবান্ হিন্দু বিভাগে কেবলই শুদ্ধাচার পরিলক্ষিত হয়। এ বিভাগের সুবন্দোবস্ত দেখিলে যেন চক্ষু জুড়ায়। ধন্য সেই মহাত্মাকে যাঁহার আদেশে এইরূপ শুদ্ধাচারের সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে একবার স্বপ্নেও ভাবি নাই, যে এ স্থানে এরূপ শুদ্ধাচারে অবস্থান করিতে পাইব। এই নিষ্ঠাবান হিন্দু বিভাগে সকল বিষয়েই শুদ্ধাভাব, অথচ খরচও অল্প। ইহার প্রথম বিভাগে ৩॥০ টাকা, দ্বিতীয় বিভাগে ২৲ এবং তৃতীয় বিভাগে সাধারণভাবে আহার করিলে প্রতি রোজ, প্রতি গ্রাহককে ১৲ টাকা হিসাবে খরচ দিতে হয়। এইরূপ নিয়মে যাঁহার যেরূপ ক্ষমতা, তিনি সেইরূপ বিভাগে থাকিতে পারেন।

স্যানিটেরিয়মে থাকিতে হইলে ইহার নিয়মানুসারে গ্রাহক যে বিভাগে থাকিবেন, তাঁহাকে সেই বিভাগের এক সপ্তাহের খরচ অগ্রিম জমা দিতে হইবে। বলাবাহুল্য, এক সপ্তাহের টাকা অগ্রিম জমা না দিলে কেহই নাম রেজিষ্টারী বা ইহার মধ্যে থাকিবার অধিকার পান না। প্রথম সপ্তাহের টাকা জমা দিয়া যদি কেহ অধিককাল থাকিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পর সপ্তাহের প্রথমেই আবার তাঁহাকে এক সপ্তাহের অগ্রিম টাকা জমা দিতে হইবে, কিন্তু যদ্যপি তিনি এই দ্বিতীয় সপ্তাহে সমস্ত দিন না থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে স্যানিটেরিয়মের নিয়মানুসারে সেই সপ্তাহের যে কয়দিন বাকি থাকিবে, ঐ কয়দিনের খরচের জমা টাকা ফেরৎ পাইবেন, কিন্তু প্রথম সপ্তাহের

টাকা জমা দিয়া যত্তপি কেহ প্রথম সপ্তাহেই উহা বাকি থাকিতে ত্যাগ করেন, তাহা হইলে কোন টাকাই ফেরৎ পাইবেন না।

যাঁহারা স্বাস্থ্যনিবাসে বাস করিতে ইচ্ছা না করিবেন, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে পৃথক্ বাটী ভাড়া করিয়া থাকিতে পারেন, কিম্বা স্থানে স্থানে যে সকল দক্ষিণ দেশীয় ব্রাহ্মণদিগের পান্থনিবাস আছে, তথায় নির্ব্বিঘ্নে এত নিয়মের বশীভূত না হইয়া থাকিতে পারেন। বলাবাহুল্য, এই সকল পান্থনিবাসে দৈনিক সাধারণভাবে থাকিতে হইলেও ১৲ টাকার কম খরচ পড়ে না, অথচ স্যানিটেরিয়মের ন্যায় এই সকল স্থান এত নিরাপদও নহে; সুতরাং অনেকেই সুবিধাবোধে স্যানিটেরিয়মে বাস করিয়া থাকেন। স্যানিটেরিয়মের অধ্যক্ষ ইহার নিয়মানুসারে প্রতি রোজ প্রতি গ্রাহকের অভিযোগের বিষয় তত্ত্বাবধান লইয়া থাকেন।

দার্জ্জিলিংএ যে সকল পাকা গৃহ নির্ম্মিত আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই এক প্রকার প্রস্তরের ইট, (সীমেণ্ট ও চুন বালীর দ্বারা নির্ম্মিত), কি একতল, কি দ্বিতল সকল গৃহের ছাদগুলি করুগেট টীনের দ্বারা ঢালুভাবে নির্ম্মিত। প্রত্যেক ঘরগুলি পল্লীগ্রামের ঘরের ন্যায় অল্প অল্প দূরে অবস্থিত। কলিকাতা বা পশ্চিমদেশীয় সহরের ন্যায় অট্টালিকা গৃহ এখানে নাই, কারণ সহরটী পর্ব্বতের উপর অবস্থিত বলিয়া যখন তখন ভূমিকম্প হইয়া থাকে, আরও সমতলভূমি এখানে প্রায় দুষ্প্রাপ্য। এই সকল পাহাড়ের স্থানগুলি উচ্চভাবে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম অবস্থায় অবস্থিত। এই নিমিত্ত যিনি যে অবস্থায় যে স্থানে সুবিধা বিবেচনা করিয়াছেন, তিনি আপন পছন্দানুযায়ী সেইখানেই বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। এখানে ভাড়াটিয়া বাটীর কোন অভাব নাই, কিন্তু ভাড়ার হার অত্যন্ত অধিক।

দার্জ্জিলিংএ বৃষ্টিপতনের মাত্রাটা অতিরিক্ত। আসাম ও কুচবিহার

ব্যতীত বাঙ্গালার অপর কোন দেশে এত অধিক বৃষ্টি হয় না। এখান-কার বৃষ্টিপতনের গর পরিমাণ ১২০ ইঞ্চি। কোন কোন বৎসর আবার ১৫০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখানে এত বৃষ্টি হয় সত্য, কিন্তু উহা ধরিয়া গেলেই পথ ঘাট অতি শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া যায়। সকল ঋতুতেই এখানকার বায়ু আর্দ্র—কিন্তু শীত ও বর্ষা ঋতুতে ইহার প্রকোপ কিছু অধিক হইয়া থাকে। এই সময় বৃষ্টির সহিত শিলা ও পতন হয়, সুতরাং ঐ সকল শিলা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অনেকে শার্শীর পরিবর্ত্তে মোটা অভ্রের পাত, দরজা ও জানালায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। দার্জ্জিলিংএ পর্ব্বত গাত্রের স্তরে স্তরে বিবিধাকারের সুন্দর সুগঠিত সৌধমালা দর্শন করিলে আনন্দে অধীর হইতে হয়।

এ সহর পরিভ্রমণকালে যেন স্বর্গের নন্দনকানন বলিয়া ভ্রম হয়, যদিও কোন মানব স্বর্গ কিরূপ, স্বচক্ষে উহা দেখিতে পান না—তথাপি ভারত পাঠে জানিতে পারা যায় যে, যাঁহারা স্বর্গে বাস করেন, তাঁহারা সকলেই সকল বিষয়ে সুখভোগ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত যেখানে অতি সুখভোগ হয়, সেই স্থানই স্বর্গের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। স্বর্গরাজ্যে শচীপতি দেবরাজ ইন্দ্রের রাজসভা, কনকসভা, দেবসভা, নন্দনকানন আরও অপ্সরা সুন্দরীদিগের নৃত্য, গীত ও বিবিধ প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দ্রব্য-সামগ্রী আছে—এইরূপই শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্বচক্ষে কোন কিছুই দর্শন হয় না।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহারাজ ত্রিশঙ্কুরের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সশরীরে ঐ স্বর্গবাসে পাঠাইতে মানস করিলে দেবতারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া কণ্টকস্বরূপ হইয়া তাঁহার কার্য্যে বিঘ্ন ঘটান, তদ্দর্শনে ক্ষত্রিয়-বীর বিশ্বামিত্র তপোবলপ্রভাবে পৃথিবীর উপরিভাগে এক নূতন স্বর্গের

সৃষ্টি করিয়া তপোবনের প্রভাব দেখাইয়া ত্রিমার্গবাদীদিগকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন।

দার্জ্জিলিং সহর—যাহাকে ঐ স্বর্গের সহিত তুলনা করা হইতেছে, তথায় ইংরাজদিগের বিদ্যা ও বুদ্ধির কৌশলে যেন আবার এক নুতন স্বর্গের সৃষ্টি হইয়াছে—তাই এখানেও নানাবিধ মনোমুগ্ধকর উদ্যান, অদ্ভুত ও সুন্দর সুন্দর রাস্তাঘাট, রাজবাটী, অজস্র পাকা ইমারত প্রভৃতিতে সুসজ্জিত, অধিকন্তু এখানে অপ্সরা সুন্দরীদিগের পরিবর্ত্তে থ্যাবরা-নাকি পটলচেরা ভুটানী ও লেপছা যুবতী সুন্দরীদিগের কটাক্ষ-বাণে পতিত হইয়া আত্মহারা হইতে হয়, ইহা চাক্ষুস দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের সেই ইক্‌রী-মিক্‌রী মধুর সম্ভাষণে কর্ণ পরিতৃপ্ত হয়, মৃদুমন্দ হাস্যে প্রাণ পুলকিত হয়, সেই নিটোল অবয়বখানি দেখিলে নয়ন সার্থক হয়। এই সকল কারণ থাকায় দার্জ্জিলিং সহরকে স্বর্গের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

দার্জ্জিলিং সহরে গ্যাসের-আলো, বৈদ্যুতিক-আলো, কলের জল, ডাণ্ডি, ঘোড়া, ঝিংরিক্সা (এক প্রকার ছোট বগী কিন্তু উহা মানুষেই টানে) প্রভৃতির স্থানে স্থানে বিস্তর আড্ডা আছে, সুবিধামত যিনি যাহা পছন্দ করিবেন, আবশ্যক মত তাহাই ভাড়া লইতে পারেন। সহর কলিকাতার ন্যায় ভাড়াটিয়া পাল্কী গাড়ী এখানে নাই। দার্জ্জিলিংএ কুচবিহারের এবং বর্দ্ধমানের রাজার বিস্তর জায়গা-জমী আছে।

এ সহরের ময়লা পরিষ্কার করিবার বন্দোবস্ত দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। দার্জ্জিলিংএর যাবতীয় ময়লা এরূপ সুন্দর প্রণালীতে "রণজিৎ" নামক নদে কি অদ্ভুত কৌশলে বাহির হইয়া যায়, উহা দেখিলে ইঞ্জিনীয়ার-দিগের বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ষ্টেশনের অনতিদূরে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে একটী অপূর্ব্ব বাজার আছে; উক্ত বাজারটী

এখানকার মধ্যে একটী দ্রষ্টব্য স্থান, কারণ ইহা এত পরিষ্কার ও পরি
চ্ছন্ন এবং বিবিধ প্রকার দোকানগুলি এরূপভাবে সজ্জীকৃত আছে যে
ইহার সৌন্দর্য্য দেখিলে কলিকাতার "মিউনিসিপাল মারকেট" হার
মানে। যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী এখানে পাওয়া যায়, কিন্তু মূল্য
কলিকাতা অপেক্ষা অনেক বেশী। বিলাতী শাক-শব্জী যে কত প্রকার
এ বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। সাধারণ ভাবে
চাউল প্রতি মণ ১০৲ টাকা, এখানে সস্তার মধ্যে কেবল তেরাইভূমির
বড় বড় কই মৎস্য, কমলা-নেবু (শান্তলা) কড়াইশুটি ও কপি, গোল
আলু বার মাসই পাওয়া যায়।

প্রতি রবিবার এই সুন্দর বাজার মধ্যে একটী হাট বসে, সেইদিন
তেরাইএর যাবতীয় চাষারা ভারে ভারে নানাবিধ দ্রব্য-সামগ্রী লইয়া
আসিয়া এখানে কেনা-বেচা করিতে থাকে। এই নিমিত্ত উক্ত হাটের
দিন এই স্থান এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়া অতিশয় মনোমুগ্ধকর হয়।
হাটবার ব্যতীত অপর দিন ইহার তত শোভা হয় না। পাহাড়ী,
ভুটিয়া, লেপচা, নেপালী, সিকিমী প্রভৃতি এবং ইংরাজদিগের খান
সামারাই এই হাটের শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। সহরের যাবতীয়
অধিবাসীরা উক্ত হাটের দিন সপ্তাহের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রী
সংগ্রহ করিয়া রাখেন। এই বাজারের উচ্চ স্তরে পুলিস-আফিস,
দাতব্য-চিকিৎসালয়, পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাম আফিস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত
থাকায় ইহার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাজার পথের চতুর্দ্দিক
ইতস্ততঃ পরিভ্রমণের সময় যখন উর্দ্ধে তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী হইতে
নিম্নে উপত্যকাভূমির উপর দৃষ্টি পতিত হয়, তখন প্রাণে এক অনি
র্ব্বচনীয়ভাবের উদয় হইতে থাকে। প্রভাত ও প্রদোষকালে উপত্যকা-
গুলির শেখরসমূহ তিমিরাবৃত থাকে, সেই সময় তথায় সূর্য্যকিরণ পতিত

হইলে যেন স্বর্ণোজ্জলের ন্যায় বলিয়া ভ্রম হয়। আহা! ইহা কি রমণীয় মহান্ দৃশ্য!

কলিকাতা সহরে "মিউনিসিপালিটী" কলের জলের যেরূপ কৃপণতা করিয়া থাকেন, এখানে সেরূপ নাই; দিবারাত্র সমভাবেই জল পাওয়া যায়। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, ঘুম নামক স্থানের ঝরণা হইতে এই জল সংগ্রহ হইয়া রক্‌তিল নামক বোর্ডিং হাউসের সন্নিকটে এক প্রকাণ্ড ট্যাঙ্কে রিজার্ভ করিয়া, তথা হইতে পাইপের দ্বারা সমস্ত সহর মধ্যে ঐ জল সরবরাহ হইয়া থাকে।

দার্জ্জিলিং এর জাগ্রত দেবতা "দুর্জ্জয়লিঙ্গ" অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত। পাহাড়ীরা তাঁহাকে মহাকাল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এই দুর্জ্জয়-লিঙ্গের দর্শনের কাঙ্গাল হইয়াই এখানে আসিয়াছি, সুতরাং আমরা সর্ব্ব-প্রথমেই সেই মহাকাল বা দুর্জ্জয়লিঙ্গের দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইলাম। ভগবান্ দুর্জ্জয়লিঙ্গ যে পর্ব্বতে বিরাজ করিতেছেন, সেই পাহাড়টী তাঁহারই নামানুসারে মহাকাল পাহাড় নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যে দেবের দর্শনের নিমিত্ত কত কষ্ট, কত অর্থ ব্যয় সহ্য করিয়া ভারতের উত্তর-সীমা দার্জ্জিলিং সহরে উপস্থিত হইলাম, এক্ষণে করুণাময় দুর্জ্জয়লিঙ্গের কৃপায় সেই স্থানে নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত হইয়া কোনরূপ প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দর্শন না পাইয়া মর্ম্মাহত হইলাম। কারণ পূর্ব্বে মনে ভাবিয়াছিলাম, এই পার্ব্বত্য প্রদেশে না জানি কত বড়ই লিঙ্গের দর্শন পাইব? এক্ষণে তৎ-পরিবর্ত্তে চুঁচুড়ার ৺ষাণ্ডেশ্বরের ন্যায় কয়েক খণ্ড লম্বাকৃতি উচ্চ প্রস্তর ব্যতীত অপর কোনরূপ মূর্ত্তিই দর্শন পাইলাম না। ইহার এক পার্শ্বে মহেশ্বরের একটী ত্রিশূল বিরাজমান থাকিয়া ভগবানের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। স্থানীয় ভুটিয়ারা বলেন, এই স্থানে গৌরীর সহিত শিবের বিবাহ হইয়াছিল।

দেব স্থানের সন্নিকটে একটী গহ্বর আছে; কথিত আছে, দরজে নামক এক তিব্বতদেশীয় লামা ইহার মধ্যে বসিয়া যোগসাধনপূর্ব্বক সিদ্ধলাভ করেন, এই বিশ্বাসে ভুটিয়া ও পর্ব্বতবাসীরা এই তপস্যা স্থানটীকে এক পুণ্যভূমি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এইরূপে এখানকার প্রসিদ্ধ দেবতা দুর্জ্জয়লিঙ্গের দর্শন ও স্পর্শন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে নয়ন ও জীবন সার্থক বোধে সেদিন অপর কোথাও আর না যাইয়া ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির নিমিত্ত স্যানিটেরিয়মে প্রত্যাগমন করিলাম।

পর দিবস যথাসময়ে জলযোগ সমাপন করিয়া স্যানিটেরিয়মের নিম্নভাগে গভর্ণমেণ্টের জেলখানার অনতিদূরে এক অপূর্ব্ব উদ্যান আছে, এইরূপ সন্ধান পাইয়া উদ্যান মধ্যে তাহার সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য প্রথমেই তথায় যাত্রা করিলাম। এখানে পৃথিবীর সকল দেশের উদ্ভিতগুলি যত্নের সহিত সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার মধ্যস্থলে এক স্থানে একটী কাঁচের ঘরে রক্ষিত নানা জাতীয় অদ্ভুত অদ্ভুত পুষ্প-তরু ও সুশ্রী পার্ব্বত্য তরুলতা কত রং বেরংএর ফুল প্রসব করিয়া আপন আপন সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছে, উহা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। প্রত্যেক পুষ্পগাত্রে একখানি টিকিট দ্বারা উক্ত বৃক্ষের নাম [illegible]কাশ পাইতেছে। এই উদ্যান মধ্যে যাহা কিছু নয়নপথে প[illegible] হইল, উহাতেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, অতএব দার্জ্জিলিংএ আসিয়া এই উদ্যানের শোভা দর্শন করিতে কেহ অবহেলা করিবেন না। কেন না যিনি এই মনোমুগ্ধকর উদ্যানের শোভা দর্শন না করিবেন, তাহার সকল অর্থ ব্যয়ই বৃথা মনে করিতে হইবে।

সন্ধ্যার পর সহর মধ্যে যখন প্রত্যেক গৃহগুলিতে বৈদ্যুতিত আলো প্রজ্বলিত হয়, তখন দূর হইতে ইহার শোভা দর্শন করিলে মনে হয়, যেন আকাশে নক্ষত্র সকল ঝক্‌মক্ করিতেছে। যে পরী-রাজ্যের কথা

শ্রুত হয়—দার্জ্জিলিং সহরে কি সেই সকল পরীদিগের গুপ্ত স্থান? ফল কথা, সন্ধ্যাকালের সেই দৃশ্য অতি নয়নানন্দদায়ক।

দার্জ্জিলিং সহর মধ্যে যে হাঁসপাতাল, ব্যাঙ্ক, এক্সচেঞ্জ, পুলিস, ষ্টেশন, সেনানিবাস, গোরস্থান ও বিবিধ প্রকার পণ্যশালা বিদ্যমান আছে, সে গুলি একে একে বর্ণনা করিলে একখানি পৃথক প্রকাণ্ড পুস্তক প্রস্তুত হয়। এই সহরের প্রধান পথ মল রোড, সেই প্রশস্ত পথটী সহর হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর বিখ্যাত রঞ্জিত নামক নদীর দিকে এক পর্ব্বতগাত্রের পার্শ্বদেশ অতিক্রমপূর্ব্বক ভুটিয়া বস্তির ভিতর দিয়া অপরিচিত নূতন যাত্রীদিগকে তাহার সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্য যেন আহ্বান করিতেছে।

মল রোডের উভয় পার্শ্বে অরণ্য বৃক্ষ সকল স্বভাবের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখাইবার জন্য গর্ব্বভরে মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান আছে। ইহার দক্ষিণদিকে "লিবং" এবং বামভাগে "বার্চ্চহিল" বিরাজমান থাকিয়া আপন শোভা বিস্তারপূর্ব্বক স্থষ্টিকর্ত্তার মহিমা প্রকাশ করিতেছে। এই প্রশস্ত দার্জ্জিলিং সহরের প্রধান রাস্তার অপূর্ব্ব শোভা দেখিবার জন্য কয়েকখানি ঝিংরিক্স (ছোট মানুষটানা বগী গাড়ী) ভাড়া হইল, তৎপরে এই সহর পথের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে বরাবর অগ্রসর হইয়া ভুটিয়া বস্তি পর্য্যন্ত গমন করিলাম। বস্তিটী সহরের সমতলভূমি হইতে অনেক নিম্নে অবস্থিত, ইহার এক স্থানে একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট মন্দির বিরাজ করিতেছে। মন্দিরাভ্যন্তরে এক সুসজ্জিত বেদীর উপর ভুটিয়াদিগের একমাত্র অরাধ্যদেব "ভগবান বুদ্ধদেবের পবিত্র মূর্ত্তি" প্রতিষ্ঠিত। দেবতার সম্মুখভাগে একটী প্রকাণ্ড ঘৃতের প্রদীপ প্রজ্বলিত অবস্থায় বুদ্ধ অবতারের শ্রীমুখের সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্য অবস্থিত। ভুটিয়ারা সকলেই বৌদ্ধ ধর্ম্মা-

বলম্বী—তাহাদের একমাত্র উপাস্য দেবতাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করাইবার জন্য মন্দিরের এক পার্শ্বে যে একটী প্রকাণ্ড ধুনচি আছে, তাহার মধ্যে ভক্তমাত্রেই ধুনামিশ্রিত ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া দেবতাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত উক্ত ধুনচির অগ্নি কখন নির্ব্বাণ হয় না।

সহর হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমেই মল রোডে উপস্থিত হইলাম, তৎপরে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই ইহার সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে চমৎকৃত হইতে লাগিলাম। আহা! সেই প্রশস্ত পথের কি রমণীয় দৃশ্য! ইহার কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই রাস্তার উপরিভাগে উত্তর-দিকে বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধি ছোট লাট বাহাদুরের বিখ্যাত গ্রীষ্মাবাস ভবন শোভা পাইতেছে। অপরাহ্নকালে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সাহেব বিবিগণ ও বিবিধ জাতি বিচিত্র জাতীয় পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া যখন বায়ুসেবনের জন্য এই রমণীয় পথে বিচরণ করিতে থাকেন, তখন এই রাস্তা এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। পথিকদিগের পতন ভয় দূর করিবার জন্য মিউনিসিপাল বোর্ড হইতে পাহাড়ের ঢালুদিকে বরাবর কাষ্ঠনির্ম্মিত রেলিং প্রথিত আছে, আবার মধ্যে মধ্যে ইহার উপর অনেকগুলি বিশ্রাম-মণ্ডপ প্রতিষ্ঠিত থাকায় সকলেই অ[illegible]ধ তথায় বিশ্রাম করিবার সময় সাদায় কালায় পরস্পর পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয়ে কত আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সূর্য্যাস্ত গমনের কিছু পূর্ব্বে মল রোডে যে চৌরাস্তা আছে, সেই চৌরাস্তা এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের অভিনব শ্রী নয়নপথে পতিত হইলে, এবং করুণাময় পরম পিতা জগদীশ্বরের সৃষ্টি মহিমা দর্শন করিলে আত্মহারা হইতে হয়। এই উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশ দার্জ্জিলিং সহরে যাহা কিছু দেখিবেন, উহাতেই মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই। সেই প্রশস্ত প্রধান

রাজপথের উপরিভাগে এক স্থানে টাউন হল আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে, ইহার সন্নিকটেই "শ্রবরি" নামে রাজনিকেতন, তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নভাগে আবার একটী মনোমুগ্ধকর সুন্দর বাগান এবং ছোট লাট বাহাদুরের কাছারী বাটী। এই স্থান হইতে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে "সমাধিক্ষেত্র", মহারাজ কুচবিহারের "হারমিটেজ" নামক কুটী গর্ব্বভরে আপন সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। মল রোডে যে সমস্ত প্রসিদ্ধ স্থান স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি, উহার কোন্‌টী বাদ দিয়া কোন্‌টীর প্রশংসা করিব, এই নিমিত্ত দার্জ্জিলিং সহরকে স্বর্গের সহিত তুলনা করিয়াছি। এই মল রোডের ন্যায় প্রশস্ত সমতলভূমি এবং সুশ্রী রাজপথ সমস্ত দার্জ্জিলিং সহর মধ্যে আর দ্বিতীয় নাই। কলিকাতার ন্যায় এখানে সমতল ময়দান অভাবে এই মল রোডের উপরিভাগে নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঘোড়দৌড় খেলা হইয়া থাকে। বলাবাহুল্য, এই সখের খেলা এখানেও বাদ পড়ে নাই। পাঠক-বর্গের প্রীতির নিমিত্ত সেই মল রোডের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

দার্জ্জিলিং ষ্টেশন হইতে সহরের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত যে সমস্ত কুলী দেখিতে পাইলাম, তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ ভুটিয়া স্ত্রীলোক। ইহা-দের চেহারা অনেকটা আসামীদিগের ন্যায় এবং আকৃতি প্রায় একই রূপ, অর্থাৎ কাকপক্ষীর ন্যায় পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে কোন ভুটিয়ানীর কর্ণে স্বর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডল, কাহারও গলদেশে সোণার আমড়া-আঁটির ন্যায় বড় বড় পলতোলা মালা, আবার কাহারও বা বৃহদাকার স্বর্ণের মাদুলী অলঙ্কারস্বরূপ অঙ্গে শোভা পাইতেছে। তাহাদের সেই সুসজ্জিত বেশ-ভূষা দেখিলে কুলী বলিয়া কিছুতেই অনুমান করিতে পারা যায় না। এই সকল স্ত্রী কুলীরা "নানী", বালক কুলীরা "কেটো", আর যুবা কুলীরা "ডোকোওলা" নামে খ্যাত।

কলিকাতা সহরের ন্যায় এই সমস্ত কুলীরা ঝাঁকা মাথায় করিয়া মোট বহন করে না, পুরীধামে মুটেরা যেরূপ বাঁশের ঝোড়া ব্যবহার করে, ইহারাও সেইরূপ একটী বাঁশের ঝোড়া আপন পৃষ্ঠদেশে রাখে, এবং উক্ত ঝোড়ার বন্ধনিটা আপন কপালে সংলগ্ন করিয়া অতি ভারি মোট হইলেও উহাতে স্থাপন করতঃ অনায়াসে বহন করিয়া লইয়া যায়। ভুটিয়া স্ত্রী, পুরুষ উভয়েই মস্তকে বেণী রাখে, পার্থক্যের মধ্যে এই যে, স্ত্রীলোকেরা দুইটী আর পুরুষেরা একটী করিয়া বেণী বন্ধন করিয়া থাকে, কিন্তু আমরা তাহাদের ইকৃরী-মিকৃরী কোন কথাই বুঝিতে না পারিয়া কেবল ভাবভঙ্গি দেখাইয়া আপন কার্য্যোদ্ধার করিয়াছিলাম।

স্যানিটেরিয়মে অবস্থান করিয়া একটী উপরিলাভ হইয়াছিল, কেন না এখানে অবস্থানকালে সহযাত্রীদিগের নিকট স্থানীয় দ্রষ্টব্য স্থানগুলির অনেক সন্ধান পাইয়া সাধ্যমত সেই গুলির শোভা দর্শন করিয়াছিলাম। পর দিবস বাসা হইতে বহির্গত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে রাজপথে উপস্থিত হইলাম, এবং ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে নিকটস্থ এক স্থানে ভুটিয়া স্কুলের সম্মুখভাগে উপস্থিত হইলাম। এতদ্ভিন্ন এখানে ইংরাজী উচ্চ শিক্ষার বিদ্যালয়ও বর্ত্তমান থাকিয়া ইংরাজরাজের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। এই প্রথমোক্ত স্কুলে ভুটিয়া বালকগণ জাতীয় শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। এই স্কুলবাটী হইতে আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার সময় জলপ্রপাতের গভীর গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম, এবং পরক্ষণেই একটী প্রকাণ্ড ঝরণা দেখিতে পাইয়া স্তম্ভিত হইলাম। এই অত্যুচ্চ অদ্ভুত ঝরণা "কোকঝোরা" নামে খ্যাত।

কোকঝোরা এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য! ঝোরাটী এক অত্যুচ্চ প্রকাণ্ড পাহাড়ের শিখরদেশ হইতে প্রবলবেগে নিঃস্বরণ হইয়া নিম্নে পতিত

DARJEELING. THE MALL LOOKING FROM WOODLANDS

মল রোডের দৃশ্য। [১৪৫ পৃঃ

Sulov Fress, Calcutta.

হইবার সময় স্থানে স্থানে পাহাড় গাত্রে বাধা পাইয়া যেন আছাড় খাইয়া কলকলনাদে আপন মনে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার চতুর্দ্দিকেই গিরি-শৃঙ্গ। নূতন যাত্রীদিগকে তাহার সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্য উচ্চশিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পর্ব্বতের মধ্যভাগে রেলিং ঘেরা একটী অপ্রশস্ত পথ, সেই পথের স্থানে স্থানে এই স্রোতগামী কোকঝোরার মনোহর দৃশ্য দেখিবার নিমিত্ত এবং দর্শকদিগের বসিবার সুবিধার জন্য বিস্তর বেঞ্চ পাতা আছে। ঐ সকল বেঞ্চের উপর বসিয়া আহ্লাদিত মনে সেই কোকঝোরার ফেণপুঞ্জ স্রোতের মনোহর দৃশ্য নয়নগোচর হইলে আনন্দে অধীর হইতে হয়। বোধ হয় লীলাময়—হতাশ রুগ্ন যাত্রী, যাহারা এখানে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য আসেন,—তাঁহাদিগকে রোগ, শোক, তাপ প্রভৃতির কবল হইতে আনন্দোৎপাদনের নিমিত্ত, এই নির্জ্জন স্থানে এরূপ একটী অদ্ভুত ঝরণার সৃষ্টি করিয়াছেন।

কোকঝোরার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এইরূপে নয়নগোচর করিয়া ইহার অনতিদূরে একটী সুন্দর সুসজ্জিত বাটী দেখিতে পাইয়া সেইদিকেই অগ্রসর হইলাম। স্থানীয় লোকদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, এই সুন্দর বাড়ীখানি বর্দ্ধমানাধিপতির। ইহা এক অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হইয়া "রোজব্যাঙ্ক" নামে শোভা পাইতেছে। অবগত হইলাম, মহারাজ অবসর মত সদলবলে এখানে এই বাটীতে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। রাজবাড়ীর আরও কিছু উপরিভাগে ভাগ্যবান লালা বনবিহারী কপূর মহাশয়ের পর্ব্বত-আবাস, তাহার পরই বর্দ্ধমান রাজষ্টেটের কাছারী বাড়ী বিরাজিত। এই কাছারী বাড়ী হইতে আরও কিঞ্চিৎ উপরে আরোহণ করিলেই রেল লাইন দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। এই রেল পথের দক্ষিণদিকে যশ ভাগ্যমান বাঙ্গালীর গৌরব সিভিলিয়ান সার রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের "লাসাভিলা" নামক

বিশ্রামাগারের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইলাম। লাসাভিলার সন্নিকটে কলিকাতা নিবাসী স্বনামখ্যাত এ্যাটর্ণি শ্রীযুক্ত নিমাইচাঁদ বসু মহাশয়ের পর্ব্বতাবাস শোভা পাইতেছে। উপরোক্ত এই সকল ভাগ্যবানদিগের, আরও অপরাপর কতকগুলি বিশ্রামাগারের শোভা দেখিয়া নয়ন চরিতার্থপূর্ব্বক সেদিনকার মত স্যানিটেরিয়মে প্রত্যাগমন করিলাম।

পর দিবস সকালে বন্ধুবান্ধব সকলে মিলিত হইয়া এখানে জলা-পাহাড় নামে যে পর্ব্বত আছে, তাহার সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। এদিন পথিমধ্যে কত থ্যাবরা নাকি ভুটানী ও নেপছা ললনা-দিগের সহিত নূতন বন্ধুদিগের সাহায্যে, নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিয়া তাহাদের আচার-ব্যবহারের বিষয় শুনিতে শুনিতে যথাসময়ে সহর হইতে বহু দূর "জলাপাহাড়ের" পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই গিরিশৃঙ্গের উপরিভাগ প্রায় সমস্ত স্থানই সমতলভূমিতে পরিণত, কারণ এই স্থানে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সৈন্য সকল অবস্থান করিয়া থাকে। এখানে এই সকল শ্বেত সৈন্যদিগের নানা বর্ণের পোষাক এবং বিবিধ বর্ণের শুভ্র ও ঈষৎ ময়লা রংএর তাম্বু সকল খাটান থাকায়, সৈন্যবাসটী যেন এক নূতন সাজে সজ্জিত হইয়া, গিরিশৃঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করি-তেছে। জলাপাহাড়টী দার্জ্জিলিং সহর হইতে ৭৩০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। এই সেনানিবাসের এক পার্শ্ব হইতে অভ্রভেদী জগদ্বিখ্যাত মহাকায় "এভারেষ্ট এবং কাঞ্চন-জঙ্ঘার" অদ্ভুত ক্ষীণ দৃশ্য দর্শন করিয়া জীবন ও নয়ন চরিতার্থ করিলাম। এই স্থানের দক্ষিণদিকের দৃশ্য সেঞ্চালের নিবিড় বনালি যেন তরঙ্গায়িত মহা সমুদ্রের ন্যায় অনন্তে মিশিয়া গিয়াছে—উত্তরদিক্ উন্মুক্ত, কেবলই পর্ব্বতশ্রেণী থরে থরে মেঘের ন্যায় সজ্জাকৃত। এইরূপে সেদিন কেবল জলাপাহাড়ের সৌন্দর্য্য দেখিয়াই বাসাবাটীতে প্রত্যাগমন করিলাম। কারণ এই অত্যুচ্চ আঁকা-বাঁকা

পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম। প্রথমে এই অত্যুন্নত গিরিশৃঙ্গে উঠিবার সময় এখানকার এই বাঁকা পথ অতিক্রম করিতে করিতে মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ভাবিয়াছিলাম যে, যাত্রীদিগকে হায়রাণ করাইবার জন্যই এই পাহাড় পথটী এরূপ অবস্থায় প্রস্তুত করা হইয়াছে, কিন্তু দলস্থ এক বন্ধুর নিকট উপদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ সে ভ্রম অন্তর্হিত হইল। কারণ তাহার নিকট উপদেশ পাইলাম যে, পাহাড়ের উপর পথ প্রস্তুত করিতে হইলে এইরূপ আঁকাবাঁকাভাবেই নির্ম্মিত হইয়া থাকে, ইহার ফলে উপরে আরোহণ করিবার সময় ক্রমে অক্লেশে অগ্রসর হইতে পারা যায়, সুতরাং পর্ব্বত আরোহণের সুবিধার জন্যই এরূপভাবে পথটী প্রস্তুত হইয়া থাকে। কেন না, পর্ব্বত বিভাগের মৃত্তিকা একে স্বভাবতঃ কঠিন, তায় বালুকা ও ছোট বড় কাঁকর মিশ্রিত, ফলতঃ এই সকল স্থান অতিক্রম করিতে যেরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই বুঝিতে পারেন। সে যাহা হউক, এইরূপে এখানকার সেনানিবাসের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া মনে মনে ভগবান দুর্জ্জয়লিঙ্গের শ্রীচরণ ধ্যানপূর্ব্বক দার্জ্জিলিং সহরের মায়া ত্যাগ করিলাম।

সিঞ্চল

দার্জ্জিলিং সহরের স্যানিটেরিয়মে বিশ্রামের পর, পূর্ব্বোক্ত বন্ধু কয়জনের নিকট এবং স্থানীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, তৎপর দিবস সিঞ্চলের শোভা দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এই সিঞ্চল পাহাড়ের শোভা দার্জ্জিলিং হইতে দর্শন করিতে হইলে জলাপাহাড়ের পার্শ্বদেশ দিয়া ঘুরিয়া, ঘুম নামক ষ্টেশনে অবতরণপূর্ব্বক তথা

হইতে সিঙ্কল পাহাড়ে যাইতে হয়, সিঙ্কল দার্জ্জিলিং হইতে অনূ্ান সাত মাইল দূরে অবস্থিত। সহযাত্রী বা বন্ধুদিগের নিকট স্যানিটেরিয়মে উপদেশ পাইয়াছিলাম যে, সিঙ্কলে কাঞ্চন-জঙ্ঘার সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে হইলে প্রাতে ৬॥টা হইতে ১১টার মধ্যে তথায় উপস্থিত হইতে হয়, এই নির্দ্ধারিত সময় অতিবাহিত হইলে পর এখানকার দর্শনীয় সৌন্দর্য্য দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া থাকে। তাহাদের নিকট এইরূপ উপদেশ পাইয়া সাধ্যমত ত্রাস্তভাবে যত শীঘ্র পারিলাম, তত শীঘ্রই তথায় উপস্থিত হইলাম। এইরূপে যথাসময়ে সদলে সিঙ্কলে উপস্থিত হইয়া, ইহার প্রতি স্থিরচিত্তে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র যেন স্বচ্ছ সলিলরাশি গগণ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে অবস্থিত রহিয়াছে, আবার সূর্য্যকিরণে উহার শিখরদেশ ঠিক্ স্বর্ণপাতে আবৃত বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। ভগবানের সৃষ্টির কি মাহাত্ম্য, এই স্থানে সূর্য্যদেব প্রাতে যত ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন, ইহার সৌন্দর্য্য ততই যেন রং বেরংএ চিত্রিত হইয়া সজ্জিত হইতে লাগিল। আহা! এই মহান্ দৃশ্য যিনি একবার দেখিবেন, তিনিই মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই।

সিঙ্কল হিমালয়ের সমভূমি হইতে দশ-বার হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত। এই অত্যুচ্চ স্থানে উপস্থিত হইলে অর্থাৎ নেপাল ও সিকিমের মধ্যবর্ত্তী গিরিশিখরে দণ্ডায়মান হইলে দক্ষিণে অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার "কাঞ্চনজঙ্ঘা", এবং বামে জগদ্বিখ্যাত সর্ব্বোচ্চ গিরি "এভারেষ্টের" ভীমকান্ত মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার পশ্চিমদিকের দৃশ্য বার মাইল দূরবর্ত্তী পাহাড়ে অবস্থিত। এই স্থান হইতে যেখানে রণজিতের স্ফটিক স্বচ্ছসলিল তিস্তাশাখার হরিদ্বর্ণ বারিরাশির সহিত মিশিয়াছে, সেই স্থানের মনোমুগ্ধকর অপূর্ব্ব শোভা নয়নগোচর হইলে মনে হয়, মানবজীবন সার্থক হইল। যিনি সিঙ্কলের প্যারেড
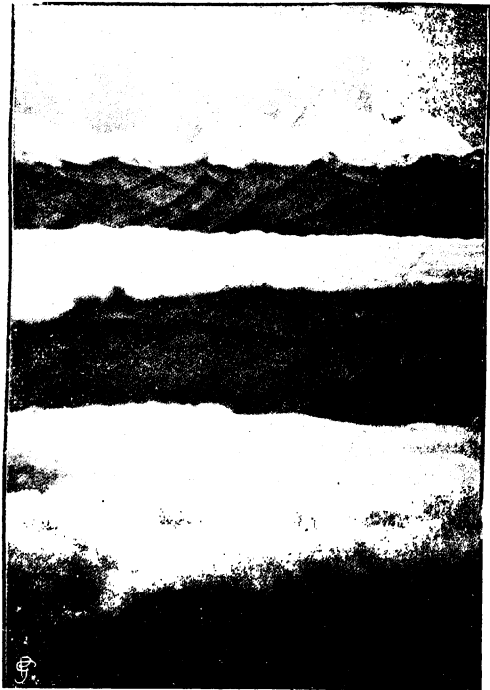
কাঞ্চনজঙ্ঘার মেঘবিরং দৃশ্য। [১৫১ পৃঃ

Sulov Press, Calcutta.

হইতে তুষারাবৃত তুহিন-গিরি দেখিয়াছেন, বোধ হয় তিনি ইহজন্মে কখন এই সৌন্দর্য্য ভুলিতে পারিবেন না। এই গিরিশ্রেণীর উপর ২৮ হাজার ফিট উর্দ্ধে কাঞ্চনজঙ্ঘা আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। পাঠকবর্গের প্রীতির জন্য ঐ বিখ্যাত কাঞ্চনজঙ্ঘার মেঘরীর একটী দৃশ্য প্রদত্ত হইল।

অক্টোবর এবং নভেম্বর মাস ব্যতীত অন্যান্য সময়ে, বিশেষতঃ বর্ষা-কালে এখানকার সৌন্দর্য্য কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ এইমাত্র যে স্থান পরিষ্কার দেখিতে পাইবেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই স্থান আবার মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে, সুতরাং ঐ সময় ইহার সৌন্দর্য্য সতত নষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভা দর্শন করিয়া এখান হইতে রেলযোগে ভগবান পশুপতিনাথের দর্শন আশে নেপাল যাত্রা করিলাম।

পশুপতিনাথ

দার্জ্জিলিং হইতে ভগবান্ পশুপতিনাথ দর্শনেচ্ছুক যাত্রীদিগকে রেলযোগে প্রথমে সিগৌলি, তথা হইতে পৃথক্ ৵০ আনা ট্রেণ ভাড়া দিয়া নেপালের সন্নিকটে রক্‌সোল নামে যে ষ্টেশন আছে, তথায় অবতরণ করিতে হয়।

সিগৌলি পূর্ব্বে নেপালরাজ্যের সীমা মধ্যে ছিল, কিন্তু ১৮১৬ খৃঃ ইংরাজরাজের সহিত নৈপালরাজের যে সন্ধি হয়, তাহাতে ঐ নির্দ্দিষ্ট দিন হইতে নৈনিতাল, মসুরি, সিগৌলি প্রভৃতি রমণীয় প্রদেশ সকল নেপালরাজের হস্তচ্যুত হইয়াছে। রক্‌সোলে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পাহাড়ীদিগকে বাস করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ষ্টেশনের অনতিদূরে বাজার ও যাত্রীদিগের বিশ্রাম করিবার পান্থশালা প্রতিষ্ঠিত থাকায়, এই অপরিচিত স্থানে বিদেশী যাত্রীগণ নানা বিষয়ে বিবিধ প্রকারে সাহায্যপ্রাপ্ত পাইয়া থাকেন। কারণ প্রথমতঃ এই স্থানে অনেক প্রকার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত পাহাড়ীগণ, এবং ব্যবসা উপলক্ষে নানা স্থানের বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বীয় লোকদিগের একত্র অবস্থান থাকাতে, এ

প্রদেশের অনেকটা আচার-ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থানীয় বাজারে আবশ্যক মত খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আপন রুচি অনুসারে আহারপূর্ব্বক পান্থশালায় বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতে পারা যায়।

যে সকল যাত্রা এখান হইতে হাঁটাপথে ভগবান পশুপতিনাথের দর্শন অভিলাষ করিবেন, তাঁহাদিগকে এই স্থান হইতে পার্ব্বত্য ৮০ মাইল দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া নেপালের রাজধানী কাটামুণ্ড বা কাটমোরা সহরের মধ্যপথ দিয়া তীর্থ স্থানে পৌঁছিতে হইবে। রক্‌-সোলের সন্নিকটে বিরিগঞ্জ নামে একটী প্রসিদ্ধ পল্লী আছে, যদ্যপি কোন যাত্রীর মোট পুটলী অধিক থাকে এবং গাণ্ডীওলা (মুটে) আবশ্যক হয়, তাহা হইলে এখানকার নিয়মানুসারে নেপালরাজের যে সকল কাছারী বাড়ী আছে, তথায় উক্ত গাণ্ডীওলার মজুরী চুক্তি করিয়া যাত্রীর নিজের নাম, ধাম কি উদ্দেশে এখানে আসা হইয়াছে, তৎসঙ্গে সেই মুটের নাম ও ঠিকানা রেজেষ্টারী করিয়া লইতে হয়। এই গাণ্ডীওলার নাম রেজেষ্টারী করিবার তাৎপর্য্য এই যে, যদ্যপ কোন বিদেশী যাত্রীর অসাবধানবশতঃ স্থানীয় কোন চতুর গাণ্ডীওলা সুবিধা-বোধে কোনরূপ মালপত্র লোকসান করে বা আপন গন্তব্য স্থানে পলাইয়া যায়, তাহা হইলে রেজেষ্টারী করার ফলে নির্দ্দিষ্ট কাছারী বাড়ীতে রিপোর্ট করিলে রাজকর্ম্মচারীরা বিনা খরচায় ও বিনা আপত্তিতে তাহার সন্ধান করিয়া উক্ত নষ্ট দ্রব্য-সামগ্রী উদ্ধার করিয়া রাজার মহিমা প্রকাশ করিতে থাকেন।

একটী গাণ্ডীওলার নাম রেজেষ্টারী করিতে অভাব পক্ষে সরকারে স্থানীয় ছয় গণ্ডা ঢেপুয়া জমা দিতে হয়। এইরূপ রেজেষ্টারীর পর তিনি উক্ত আফিস হইতে বিনা ব্যয়ে একখানি সহর মধ্যে প্রবেশের জন্য পৃথক্ ছাড়পত্র প্রাপ্ত হইবেন। বলাবাহুল্য, যাত্রী বিদেশী হইলে

যদ্যপি তাহার গাণ্ডীওলা আবশ্যক না ও হয়, তথাপি কি উদ্দেশে তিনি সহর মধ্যে প্রবেশ করিবেন, উহা পত্রদ্বারা যে কোন কাছারী বাড়ীতে আবেদন করিতে হয়, ইহার ফলে তিনিও একখানি সহর প্রবেশের পাস পাইবেন, কিন্তু যদ্যপি কোন বিদেশী যাত্রীর উপর তাহাদের সন্দেহ হয়, অর্থাৎ কুঅভিপ্রায়ে আসিয়াছেন বিবেচনা করেন—তাহা হইলে সেই ব্যক্তির অতর্কিতে স্থানীয় গুপ্তচরেরা তাহার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিয়া তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে থাকেন। বিরিগঞ্জ বা অপর কোন কাছারী বাড়ী হইতে সহর প্রবেশের যে পাস পাওয়া যায়, নেপাল সহরের মধ্যে যাত্রা করিবার সময় রাজকর্ম্মচারী বা পুলিস প্রহরীদিগকে সময় মত উহা দেখাইতে হয়, অতএব এই পাসখানি সাবধানে অতি যত্নের সহিত রাখিতে হইবে।

আমাদের ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের যেরূপ ১৲ টাকায় ষোল গণ্ডা পয়সা পাওয়া যায়, তথায় সেইরূপ ইংরাজ রাজত্বের একটী প্রচলিত টাকা বদল করিলে ত্রিশ গণ্ডা ঢেপুয়া পাওয়া যায়, এইরূপ একখানি ১০৲ টাকার নোট বা একখানি গিনি বদল আবশ্যক হইলে স্থানীয় অধিবাসীরা আগ্রহের সহিত চারি আনা বা পাঁচ আনা বেশী দিয়া থাকেন। সহর কলিকাতায় যেরূপ বিলাতী সিলিং বা ফ্লোরিনের আদর অধিক অর্থাৎ মূল্য বেশী পাওয়া যায়, এখানেও বোধ হয় সেইরূপ এক্সচেঞ্জের দরের নিমিত্ত মূল্য বেশী পাওয়া যায়।

গিরিগঞ্জ হইতে তীর্থ স্থানের পাদদেশ পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রধান প্রধান পান্থনিবাস আছে, ঐ সকল পান্থনিবাসের সন্নিকটেই যাত্রীদিগের সুবিধার্থে এক-একটী গাণ্ডীওলাদের নাম রেজেষ্টারী করিবার ডিপো আছে। রক্‌সোল হইতে নেপাল সহরের রাজধানী কাটামুণ্ড বা কাটমোরা অন্যূন ৭৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এই প্রশস্ত পথে

যতগুলি পান্থনিবাস আছে, তন্মধ্যে সোমরা-বাসা, হেতুয়া, ভীমপেদী এই কয়টীই প্রসিদ্ধ।

প্রতি বৎসর শিবচতুর্দ্দশীর সময় এখানে ভগবান পশুপতিনাথের দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া কত দূরদেশ হইতে কত ভক্তগণের সমাগম হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপে ঐ সময় তীর্থ স্থানে সেই সকল যাত্রী-সমাগমে এক মহা মেলা হইয়া থাকে। এই শিবরাত্রি মেলা উপলক্ষে মাত্র ছয় দিবস ভগবানকে দর্শনের নিমিত্ত সহর প্রবেশের জন্য রাজাজ্ঞায় কাহাকেও পৃথক্ পাস লইতে হয় না, এ নিয়ম বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। কাটামুণ্ড সহর হইতে তীর্থ স্থান অন্যূন তিন মাইল দূরে অবস্থিত। রক্সোল হইতে ভগবান্ পশুপতিনাথের মন্দির ৮০ মাইল, এই দুর্গম প্রশস্ত পথিমধ্যে যে সমস্ত পান্থনিবাস আছে, যাত্রীরা যে স্থানে সুবিধা বিবেচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সেই স্থান হইতেই গাড়ীওলা নিযুক্ত করিতে পারেন, ইহাতে কোন আপত্তি নাই। বলা-বাহুল্য,মেলার সময় ব্যতীত অপর সময় যথানিয়মে যিনি খরচ জমা দিয়া এক স্থানে গাড়ীওলার নাম রেজেষ্টারী করেন, তাঁহাকে আর অপর কোন স্থানে পৃথক্ জমা বা তাঁহাদের নাম লেখাইতে হয় না, এইরূপ রেজেষ্টারীর ফলে সালিআনা সরকারে বিস্তর টাকা জমা হইয়া থাকে। আমরা মেলার সময় যাই নাই, সুতরাং আমাদের সহর প্রবেশের জন্য পৃথক্ পাস লইতে হইয়াছিল।

রক্সোলের সন্নিকটে রোং নামে এক প্রকার পার্ব্বত্য জাতি বাস করিয়া থাকেন, উহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীয় এবং সিকিম পর্ব্বত বিভাগের আদিম নিবাসী বলিয়া খ্যাত। ইহারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ, সরল স্বভাব-সম্পন্ন এবং শান্ত প্রকৃতির লোক, অধিকন্তু বিদেশী লোক পাইলে এ জাতি আগ্রহের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া থাকেন। কলহ বা বিবাদ

কিরূপ—তাহা এ জাতি জানেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা-দের মধ্যে স্ত্রী বা পুরুষ উভয়েই প্রায় একই পরিচ্ছদে অবস্থান করেন, আবার পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় শ্মশ্রুবিহীন অবস্থায় অবস্থান করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহাদের মধ্যে স্ত্রী বা পুরুষ ভেদ করিতে হইলে কেবল তাহাদের বেণী দেখিয়া চিনিয়া লইতে হয়, কারণ স্ত্রী-লোকেরা দুইটী আর পুরুষেরা একটী বেণী রাখিয়া আপন আপন মস্তকের শোভা বিস্তার করিয়া থাকেন। ভূতপ্রেতকে এ জাতিরা অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকেন, ঐ সকল ভয়ঙ্কর অদ্ভুত জীবদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, কেহ লামাদিগের অস্থি, কেহ কেশ, আবার কেহ বা তাঁহাদের নখ যত্নের সহিত মাদুলী মধ্যে কবচের ন্যায় রক্ষা করিয়া আপন আপন হস্তে বা কণ্ঠদেশে ধারণ করিয়া থাকেন। নেপাল সহর মধ্যে গুর্খা, নেওয়ার, মগর, গুরুম, লিম্বু, কিরাটী, ভুটিয়া এবং নেপচাগণকে অধিবাসীরূপে অবস্থান করিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

নেপালে যেমন বিচিত্র জাতির বসবাস আছে, সেইরূপ তাঁহাদের আকৃতি ও বর্ণের বৈচিত্র দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেহ বা উজ্জ্বল গৌরকান্তি, কেহ বা শ্যাম বর্ণ, কেহ বা দীর্ঘাকৃতি আর্য্য সন্তানের ন্যায়; সকলকেই কিন্তু বলিষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

নেপালে দাসত্বপ্রথা পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত। প্রত্যেক ধনী গৃহস্থের বাটীতে ক্রীত দাসদাসীতে পরিপূর্ণ। কাহারও অবস্থা মন্দ হইলে তিনি অবাধে আপন স্ত্রী, পুত্র কিম্বা কন্যাকে মূল্য গ্রহণ করিয়া বিক্রয় করেন, ইহাতে সমাজে তাঁহাকে দোষনীয় হইতে হয় না। দাস অপেক্ষা দাসীর মূল্য অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই দাসী সুরূপা কিম্বা যুবতী হইলে তাহার মূল্য আরও অধিক হয়। বলা-

বাহুল্য, এই সকল দাসীগণ প্রভুর সন্তান গর্ভে ধারণ করিতে পারিলে আপনাদিগকে সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করে, কারণ ইহার ফলে তাহার চিরদিনের মত জীবিকা নির্ব্বাহের সংস্থান হয়, অধিকন্তু ধনী ব্যক্তির বাটীতে অবস্থানের জন্য সমাজে তাহার পদমর্য্যাদাও বৃদ্ধি পায়।

নেপালে যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতি বাস করেন, তন্মধ্যে বেশীর ভাগ ভুটিয়াগণই অতি সহজে আপনাদের সন্তানসন্ততি বিক্রয় করিয়া থাকেন। অনেক গৃহস্থ ঋণদায়ে আপন পুত্র কন্যাকে বন্ধক রাখেন, ঐ ঋণ আবার কোনরূপে পরিশোধ করিতে পারিলেই তাহাদের দাসত্ব মোচন হয়।

নেপালে শিল্প-বাণিজ্যের কোনরূপ আড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে এখানে অত্যন্ত মোটা সুতার এবং মোটা রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। নেপালে এক প্রকার কাগজ উৎপন্ন হয়, উহা সহজে ছেঁড়ে না। পিতল কাঁসার বাসন এবং হাতীর দাঁতের নির্ম্মিত শিল্প বস্তু এখানে বিস্তর প্রস্তুত হইয়া থাকে।

রোংএদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই চাটাই, বংশ এবং বৃক্ষাদির সমষ্টিতে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে যাহারা সমৃদ্ধিশালী, তাহারাই প্রস্তরখণ্ড এবং কাষ্ঠাদি সংযোগে সুন্দর পাকা গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া বসবাস করেন, এইরূপ পাকা গৃহ তাহাদের একতল, দ্বিতল ও ত্রিতল পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন পূজনীয় বা পরিচিত ব্যক্তির সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর সমাদর, সম্মান বা কুশল জ্ঞাপনার্থ সকল দেশেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ সঙ্কেত আছে, কিন্তু এই রোং জাতির সঙ্কেতসূচক প্রণাম, নমস্কার বা সেলাম যাহাই বলুন না কেন, এক কৌতুকাবহ দৃশ্য! ইহাদের পরস্পর পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সেই ব্যক্তিকে সম্মান দেখাইবার জন্য উভয় পক্ষ হইতেই

প্রথমে জিহ্বা ও দন্ত বাহির করিয়া মস্তক স্পন্দন এবং নখাঘাত করিতে থাকেন, এইরূপ করিবার ফলে তাহার যথোচিত অভ্যর্থনা করা হয়।

রকৃসোলে অবস্থানকালে স্থানীয় দোকানীদিগের নিকট সংবাদ পাইলাম, এই দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করিবার জন্য শিবচতুর্দ্দশীর মেলা ব্যতীত অপর সময় কিছুতেই কোনরূপে আবশ্যক মত যান-বাহনাদি ভাড়া পাওয়া যায় না, যদ্যপি কাহারও বিশেষ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে এখান হইতে সহর মধ্যে লোক পাঠাইয়া উহা সংগ্রহ করিতে হয়; তাহাদিগের নিকটে এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়া আমরা অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলাম, কারণ এই অপরিচিত দুর্গম ৮০ মাইল পথ হাঁটাপথে কিরূপে অতিক্রম করিব, ইহাই ভাবনার প্রধান কারণ হইয়াছিল। সে যাহা হউক, এখান হইতে তীর্থতারে সাহস-পূর্ব্বক অগ্রসর হইব—না স্বদেশ প্রত্যাগমন করিব, এইরূপ চিন্তা করি-তেছি এবং এক মনে এক প্রাণে ভগবান পশুপতিনাথের শ্রীচরণ ধ্যান করিতেছি, এমন সময় সহর হইতে দুইজন সমৃদ্ধিশালী উচ্চপদস্থ ব্যক্তি খাটোলীতে আরোহণ করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াই তাহাদের চুক্তি ভাড়া মিটাইয়া দিলেন,তদ্দর্শনে স্থানীয় লোকদিগের উপদেশমত আমরা ঐ দু-খানি খাটোলী ভাড়া করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু খাটোলী-ওলারা তীর্থ স্থান পর্য্যন্ত যাইতে অস্বীকার করিল, অবশেষে নানা প্রকার প্রলোভন ও কুটতর্কের পর তাহারা নীমগিরিপর্ব্বতশ্রেণীর মূল দেশস্থিত ভীমপেদী নামক স্থান পর্য্যন্ত প্রত্যেক খাটোলীর ৭৲ টাকা ভাড়া চুক্তি করিয়া যাইতে স্বীকৃত হইল। রকৃসোল হইতে এই স্থান অনূ্যন চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত। তাহাদের নিকট উপদেশ পাইলাম, ভীমপেদী হইতে আবার পৃথক্ ঝাম্পান বা দাঁড়ীর সাহায্যে তীর্থ স্থানের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইতে পারিব, এইরূপে উৎসাহিত হইয়া

অবশেষে থাটোলীওলাদের প্রস্তাবেই স্বীকৃত হইয়া পশুপতিনাথ দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া শুভ যাত্রা করিলাম। এ দেশীয় একখানি থাটোলী একজন আরোহীকে তিনজনে বহন করিয়া থাকে। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত সেই থাটোলীর একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

এইরূপে উক্ত দুইখানি থাটোলীর সাহায্য পাইয়া তাহাদের সহিত নানাপ্রকার গল্প করিতে করিতে কেহ পদব্রজে, কেহ বা থাটোলীতে আরোহণপূর্ব্বক এখানকার দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান ভীমপেদীর পদপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ভীমপেদী এক পর্ব্বতের উপত্যকার উপর অবস্থিত।

রক্সোল হইতে ভীমপেদী—এই প্রশস্ত দুর্গম পথ কিরূপে অতিক্রম করিয়াছিলাম, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইল। রক্সোলের পান্থনিবাস হইতে অন্যূন এক মাইল পথ অগ্রসর হইয়া বিরিগঞ্জ নামক এক চটীতে উপস্থিত হইলাম। বিরিগঞ্জ একটী ছোট সহর, এখানে যাত্রীগণ এবং গ্রামবাসীদিগের চিকিৎসার সুবিধার্থে নেপাল গভর্ণমেণ্ট হইতে একটী হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত আছে। পথিমধ্যে মহারাজের সুন্দর শীতাবাস দর্শন করিলাম। এই বিরিগঞ্জের পান্থনিবাসে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর যখন এখান হইতে বিশাল প্রান্তরে আসিয়া পড়িলাম, তখন কোথা হইতে প্রাণে ভয় উপস্থিত হইল। কারণ অপরাহ্নকালে বাহকেরা ও আমাদের সঙ্গী কুলীরা যখন আমাদের সকলকে লইয়া এক জঙ্গল পথের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন ভয়ে ও তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল, কুলীরা আমাদের অবস্থা অবলোকন করিয়া বলিল, "বাবু! ভয় করিবেন না, এইরূপ জঙ্গলময় পথ এক্ষণে আমাদিগকে অন্যূন চারি ক্রোশ অতিক্রম করিতে হইবে, তাহার পর বসতিপূর্ণ পল্লীতে উপস্থিত হইব। অগত্যা অহাদের বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া এই দুর্গম জনমানবহীন

জঙ্গল পথ অতিক্রম করিবার সময় চোরের ন্যায় নিঃশব্দে ভগবান পশু-পতিনাথের শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বলাবাহুল্য, এই শ্বাপদসঙ্কুল প্রশস্ত জঙ্গল পথ অতিক্রম করিবার সময় কানামাছি ও মশার দংশনে আরও আমা-দিগকে কাতর করিয়া তুলিল। একটী কথা এখানে বলিবার আছে, এই পার্ব্বত্য জঙ্গল পথ অতিক্রম করিবার সময় পথিকেরা সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়েন, ঐ সকল ক্লান্ত পথিকদিগের শান্তির নিমিত্ত সদাশয় নেপাল রাজমন্ত্রী "মহারাজ দেবশামসেয় স্বীয় স্বর্গীয়া পত্নীর নাম অক্ষয় করিবার অভিলাষে ঐ প্রশস্ত জঙ্গল পথের স্থানে স্থানে জলের কল প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া পরিশ্রান্ত যাত্রীদিগের কত উপকার এবং কত পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রত্যেক জলধারার উপর দেব-নাগরী অক্ষরে তাঁহার পত্নী "কর্ম্মকুমারীর" নাম জাজ্জ্বল্যমান লেখা আছে। আমরা এই সকল প্রতিষ্ঠিত কলের জলপান করিয়া তৃপ্তিলাভ-পূর্ব্বক মহারাজের কীর্ত্তি ও বদান্যতা স্বীকার করিতে লাগিলাম। এইরূপে অতি কষ্টে সন্তর্পণের সহিত বিছাকরি নামক জনপাদপূর্ণ প[illegible]নিবাসে উপস্থিত হইয়া যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইলাম। সে রাত্রি [illegible]থ অবস্থান করিয়া পর দিবস জলযোগের পর যথাসময়ে ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণপূর্ব্বক পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এ পথও অতি ভয়া-নক—কেবল বালুকা ও নুড়ি পাথরাচ্ছন্ন; একটী পার্ব্বত্য জলশূন্য নদী-বক্ষ পথ ভেদ করিয়া কেহ খাটোলীতে, আবার কেহ বা পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এখান হইতে বহু দূরব্যাপী কাটামুণ্ড সহর পর্য্যন্ত এইরূপ ভয়াবহ স্থান অতিক্রম করিতে হয়। ক্রমে এই নদীপথে যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তাহার দুই পার্শ্বে গভীর জঙ্গলাবৃত পর্ব্বত সকল উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে যেন ভগবান পশুপতিনাথের

দর্শন পথ দেখাইতে লাগিল ; চারিদিক্ নিস্তব্ধ। দিবাভাগেই পাহাড়ী ঝিল্লিগণ ঝিঁঝিঁ শব্দ করিতেছে—আবার মাঝে মাঝে পর্ব্বতের গাত্র বহিয়া ঝরঝর করিয়া ঝরণার জল পতিত হইতেছে। এই সকল চারি-দিকের সুন্দর শান্ত সৌন্দর্য্য দর্শনে আমাদের প্রাণ বিস্ময়ে পুলকিত হইতে লাগিল। কোথাও পার্ব্বত্য নদী কলকলরবে অমিত-বিক্রমে গর্জ্জনসহকারে লম্পঝম্ফ করিতে করিতে নীচে অবতরণ করিতেছে, কোথাও বা জনপাদশূন্য, আবার কোথাও বা দু-এক ঘর বসতি উঁকি মারিয়া আমাদিগকে আশ্বাসপ্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমাগত পান্থশালার পর পান্থশালায় বিশ্রাম করিতে করিতে রক্সোল হইতে তৃতীয় দিবসে ভীমপেদীর পান্থনিবাসে উপস্থিত হইলাম। এই পান্থ-নিবাসে একতল ও দ্বিতল বিশ্রামাগার পাওয়া যায়, এবং এখানে সতত বিস্তর যাত্রীর সমাগমও হইয়া থাকে, কিন্তু যাত্রীদিগের জঠরানল নিবৃত্তির উপায়—মহিষের দুগ্ধ, মোটা চিড়া ও মোটা চাউল ভিন্ন আর কিছুই নাই।

এখানে গাণ্ডীওয়ালাদের চুক্তি ভাড়া মিটাইয়া দিয়া উহাদিগকেই সঙ্গে লইয়া ঝাম্পানের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন এক-খানি ঝাম্পানের সংগ্রহ করা দূরের কথা—ইহার সন্ধান পর্য্যন্ত পাইলাম না, তখন হতাশপ্রাণে কিরূপে ঝাম্পান পাইব—এইরূপ চিন্তা করি-তেছি, এমন সময় রক্সোলের ন্যায় এখানকারও অধিবাসীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম যে, পূর্ব্বাহ্নে এখান হইতে সহর মধ্যে পত্র দ্বারা বা লোক পাঠাইতে না পারিলে কোনরূপে উহা সংগ্রহ হইবে না। একে এদেশ আমাদের অপরিচিত, সকলকার কথা বুঝিয়া ওঠা কঠিন, তায় লোকাভাব, সুতরাং ঝাম্পান সংগ্রহ করিতে না পারিয়া বাধ্য হইয়া গাণ্ডীওলাদের সহিত এখান হইতে হাঁটাপথে এই পার্ব্বত্য পথের শোভা

দর্শন করিয়া নেপালের রাজধানী কাটামুণ্ড সহরে যাইতে মনস্থ করিলাম। যে কুলীলোক আমাদের সঙ্গে ছিল, তাহারা আমাদের দুঃখে কাতর হইয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিতে করিতে স্থানীয় চারিখানি কার্পেট সংগ্রহ করিয়া আনিল। ইহাতে আমরা বিশেষ উপকৃত হইলাম, কারণ রক্‌সোল হইতে ভীমপেদী পর্য্যন্ত আসিতে যে কিরূপ কষ্টভোগ করিয়াছিলাম, উহা ভুক্তভোগী না হইলে কেহই অনুমান করিতে পারিবেন না। এই দুর্গম পথ পার হইয়া ভীমপেদীতে উপস্থিত হইলেই আমাদের কষ্টের অবসান হইবে—এইরূপই ভরসা ছিল, কিন্তু তাহাতেও বিঘ্ন ঘটিল দেখিয়া কোন্ প্রাণী না হতাশ হয়?

রক্‌সোলে যেরূপ খাটোলী পাইয়াছিলাম, উহা তিনজন বাহকে বহন করে, কিন্তু এখানকার একখানি কার্পেট চারিজন বাহকে বহন করিয়া থাকে। কার্পেটের আকৃতি অনেকটা আমাদের বাঙ্গলা দেশের দোলার ন্যায় দেখিতে; ইহার তলদেশ একখানি কার্পেটে আবৃত থাকে, এই নিমিত্ত ইহার নাম কার্পেট হইয়াছে। বলাবাহুল্য, ধনী ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণ লোকে এইরূপ কার্পেটে আরোহণ করিতে সক্ষম হন না, কারণ ইহার মজুরী অত্যন্ত বেশী। কার্পেটের মাথার উপর একটী কাটের ঢাক্‌না, তাহার চারিধারে ঝালরের মত পর্দ্দা আছে, এই কার্পেটে শয্যা বিস্তৃত করিয়া স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতে পারা যায়। ভীমপেদীতে আমাদের সঙ্গী কুলীদিগের প্রাণপণ চেষ্টায় এইরূপ চারিখানি কার্পেট পাইয়া চারি বন্ধুতে মনের সুখে কাটামুণ্ড সহরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কেন না, কার্পেট বাহকেরা আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছিল যে, তাঁহারা এখান হইতে এক দিবসের মধ্যেই রাজধানীতে পৌঁছিয়া দিবে।

এই ভীমপেদী হইতে কার্পেটে আরোহণ করিয়া দেখিলাম,

বাহকেরা অল্পক্ষণ মধ্যেই পর্ব্বতের চড়াইএ আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল। এ চড়াই বদরীকাশ্রমের পথকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, যেন সোজা-ভাবে উঁচু হইয়া উঠিয়াছে—কি ভয়ানক ব্যাপার! এই পথ আমরা সাহস করিয়া না জানিয়া পদব্রজে যাইতে বাসনা করিয়াছিলাম? ইহাতে যে কিরূপ কষ্টভোগ করিতে হইত, তাহা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত দুঃসাধ্য। সে যাহা হউক, এখানকার এই চড়াই পথে না আছে গাছ-পালা, না আছে কোন আশ্রয়। বাহকেরা আমাদের স্কন্ধে করিয়া পা বাড়াইবামাত্র নোড়ানুড়ি সকল শরশর করিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল—কি ভয়ানক ব্যাপার! বাহকেরা তখন বল সঞ্চয়ের নিমিত্ত কেবল মুখে "নারায়ণ" "নারায়ণ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি—নেপালী বাহক ভিন্ন অপর কোন জাতি ভার বহন করিয়া এই দুর্গম পথে যাইতে সক্ষম হয় না, কারণ এই খাড়াই যেন সমুদ্রের ন্যায় অফুরান্ত। বাহকদিগের নিকট অবগত হইলাম, ভীমপেদীর উপত্যকা হইতে এবার আমরা অনূ্যন ২৩০০ ফিট উচ্চে আরোহণ করিলাম। এই উচ্চ স্থান হইতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভয়ে প্রাণ শুষ্ক হইয়া উঠিল। এই ভাবে অতি কষ্টে এই চড়াইএর শিখরদেশে উপস্থিত হইয়া "চিসাপাণিগড়ি" নামক স্থানে আমাদিগকে নামাইয়া দিয়া বাহকগণ হাঁপ ছাড়িতে লাগিল, তৎসঙ্গে আমরাও স্ব স্ব কার্পেট হইতে অবতরণ করিয়া বাঁচিলাম।

এই স্থানে নেপালরাজের গড় এবং সৈন্যাবাস আছে, অর্থাৎ শত্রু-পক্ষের আগমন প্রতিরোধ করিবার জন্য নেপাল গভর্ণমেণ্টের সুব্যবস্থা আছে, স্থানটী অতি উচ্চ এবং স্নিগ্ধকর। বাহকেরা এই স্থানে ক্ষণেক অবস্থান করিবার সময় আমাদের যেন যাবতীয় শ্রমের অবসান হইল।

সে যাহা হউক, এই চিসাপাণিগড়ি হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে ভীমপেদীর নিম্নস্থ উপত্যকাটী বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বলা-বাহুল্য, এই অত্যুচ্চ সৈন্যাবাস হইতে নেপালী গোলন্দাজেরা কামান দাগিলে শত্রুপক্ষদিগকে সহজেই সদলে ধ্বংস হইতে হয়। এই স্থানেই আবার আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত পাসখানি দেখাইয়া সহরের ভিতর প্রবেশ করিতে হইল। এবার এই সৈন্যাবাস হইতে ক্রমে নীচে নামিয়া বাহকেরা আমাদিগকে কুলিখানি নামক প্রশস্ত স্থানে নামাইয়া দিল। বলাবাহুল্য, কুলিখানি নামক স্থানটীর দৃশ্য অতি মনোমুগ্ধকর, এবং নিরাপদ। এখানে একটী বাঁধা পুল আছে, বাহকদিগের কথামত আমরা সকলে পদব্রজে ঐ পুলের উপর দিয়া পরপারে উপস্থিত হইয়া আবার স্ব স্ব কার্পেটে আরোহণ করিলাম। যে পুলটী পার হইলাম, উহা একটী পার্ব্বত্য নদীর উপর অবস্থিত। এইরূপে ক্রমাগত পান্থ-নিবাসের পর পান্থনিবাস অতিক্রম করিয়া নেপালরাজের রাজধানী কাটামুণ্ড সহরে উপস্থিত হইলাম।

নেপাল

নেপাল-হিমালয়ের ক্রোড়স্থিত বিস্তীর্ণ প্রদেশ, প্রকৃতির রম্যকানন, বিবিধ নৈসর্গিক শোভা সম্পদ সম্পন্ন। ইহার উত্তরে চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের শিখরমালা, তাহার নিম্নভাগে গভীর শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানী।

নেপাল—একটী সমৃদ্ধিশালী স্বাধীন রাজ্য, দার্জ্জিলিংএর পশ্চিমে বিরাজমান থাকিয়া আপন শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। ইহার উত্তর-সীমানা তিব্বত, দক্ষিণ-সীমানা ব্রিটিশ রাজ্য। এই প্রশস্ত রাজ্যটী দৈর্ঘ্যে ৪৬০ মাইল এবং প্রস্থেও অন্যূন ১৫০ মাইল। পৃথিবী মধ্যে

দেশীয় পর্ব্বতময় যে সকল স্থান আছে, তন্মধ্যে এই নেপাল দেশই সর্ব্বোচ্চ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার উত্তর সীমানা ক্রমে উচ্চ হইয়া এত উর্দ্ধে উঠিয়াছে, যেন চিরনিহার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। কথিত আছে, নেপালের নিম্ন স্থানের উপত্যকাগুলি বঙ্গদেশের সমভূমি অপেক্ষা ৩০০০ হাজার হইতে আবার কোন কোন স্থান ৬০০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ। ইহার পরিধি অন্যূন ৫৪০০০ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা অতি কম পঞ্চাশ লক্ষ। এখানকার অধিবাসীরা তাতর ও চীন জাতীয় নানা শ্রেণীভুক্ত। তাহাদের আকৃতি, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে হিন্দুদিগের সহিত কোনরূপ মিল নাই।

বিধাতা নেপাল রাজ্যটাকে দুর্ভেদ্য প্রাচীরে বেষ্টন করিয়াছেন, তাই—ইহা আজও স্বাধীনভাবে অবস্থান করিয়া আপন গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারত—বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মের জন্ম স্থান, সুতরাং এই উভয় ধর্ম্মই এখানে আশ্রয়লাভ করিয়াছে।

নেপালীরা স্বভাবতঃ কিছু উগ্রস্বভাবাপন্ন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইহারা গুরং কামি, মুর্মি, নিম্ব, মঙ্গোর, নেওয়ার প্রভৃতি নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। তন্মধ্যে গুরং এবং মঙ্গোরগণই এ প্রদেশের শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া গণ্য। এ প্রদেশের স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ পশমী বস্ত্র পরিধান করেন এবং ম্যাকলা (কাঁচলী) ব্যবহার করিয়া থাকেন, অনেকে আবার শিরোচ্ছাদনে একখানি রুমাল বন্ধন করিয়া গর্ব্বভরে আপন সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। বাঙ্গলা দেশের ন্যায় উহাদিগের কোনরূপ অবগুণ্ঠন প্রথা নাই। স্ত্রী স্বাধীনতা উহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বারাঙ্গনাদিগকে ইহারা অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কেন না, এ প্রথা তাহাদের মতে অতি হীন ও লজ্জাজনক, সুতরাং বেশ্যাবৃত্তি এখানে উঠাইবার জন্য

তাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন, এবং উহাদিগের প্রতি কঠিন ভাবে শাসনও করিয়া থাকেন, তথাপি কালের কি বিচিত্র গতি! এত কঠিন শাসনেও উহাদিগকে শাসন করিতে পারেন না। ফলতঃ বলিতে হয়, মানবের নাড়ী আর এই নারী জাতি দুইই সমান—রোগীর নাড়ী যেমন মুহূর্ত্ত মধ্যে চঞ্চল হয়, সেইরূপ নারীর মনও সতত চঞ্চল, কখন কি ভাবে কোন্‌দিকে অগ্রসর হয়, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। এত বাঁধাবাঁধিতেও যখন ইহাদের মন স্থির থাকে না, তখন আদর পেলে কি আর রক্ষা আছে?

মানবের দেহাভ্যন্তরে যে সকল রিপু আছে, তাহার মধ্যে কামই ভীষণতর। ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এ সকল রিপু হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইলেও কামের নিকট নিষ্কৃতি লাভ দুরূহ—প্রমাণ-স্বরূপ দেখুন, দেবাদিদেব মহাদেব মহাযোগী, তিনি মৃত্যুঞ্জয় হইয়াও কাম জয় করিতে পারেন নাই। আবার দেখুন, উন্মাদ যেমন মহা-সাগরের জলকে দুর্গন্ধ করিবার মানসে স্বফেণ তরঙ্গমালাযুক্ত অনন্ত সাগরবক্ষে ঝম্প প্রদান করে, সেইরূপ যৌবন গর্ব্বে মত্ত হইয়া লোকে অনেক সময় অনেক রকম কুকর্ম্ম করিয়া শেষ কৃপাময়ে কৃপা লাভ করিলে, অর্থাৎ দিব্য-জ্ঞান লাভ হইলে তখন তিনি সেই কুকার্য্যের জন্য কেবলই মনস্তাপ করিতে থাকেন।

যে সকল ভুটিয়াবাসী এখানে বাস করিয়া থাকেন, তাহাদের আকৃতি দেখিতে প্রায় একই রূপ। তিব্বতের লামারা তাহাদের গুরু ও পুরোহিত। তিব্বতদেশীয় লামাদিগকে এখানে দেখিলেই সহজে চিনিতে পারা যায়, কারণ আমাদের বাঙ্গালা দেশের লোক যেরূপ ঝুলির মধ্যে হস্তাঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া হরিনামের মালা জপ করেন, তথায় তিব্বতদেশীয় লামারা ঠিক সেইরূপ কুঁড়া জালির মধ্যে হস্ত

প্রবেশ করিয়া মালা জপ করিতে থাকেন, অধিকন্তু ইঁহাদের হস্তে সদাসর্ব্বদা একটী করিয়া জপ-চক্র বর্ত্তমান থাকে।

নেপালে পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী নেওয়ার নামে এক জাতি রাজত্ব করিতেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে গুর্খা বংশীয় মহাবীর পৃথ্বীনারায়ণ নামে জনৈক হিন্দু নরপতি এই নেওয়ার রাজাদিগকে যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া এখানে তাঁহার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি গুর্খাগণ এদেশে সর্ব্বতোভাবে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে মুসলমানদিগের অত্যাচারের সময় এই বীরজাতি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া গোরখালি নামক পার্ব্বত্যপ্রদেশে আসিয়া নিরাপদে বসবাস করিতে থাকেন, এই কারণে ইঁহারা গুর্খা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। নেপাল সহরে গুর্খা অপেক্ষা নেওয়ার অধিবাসীই অধিক, কারণ এই নেওয়ার জাতিই এখানকার আদিম বাসী।

নেপালে বিদেশী লোকেরা অতি অল্পই বাস করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমানকালে গুর্খা বংশীয় মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন বিক্রমসিং এখানে প্রজাপালন করিতেছেন। কথিত আছে, মোগল-শাসন সময়ে এবং মহারাষ্ট্রদিগের রাজত্বকালে অনেক স্থানে মন্ত্রী রাজত্ব প্রচলিত ছিল, সেই পূর্ব্ব প্রথানুসারে অদ্যাপি নেপালরাজ্যে মন্ত্রী রাজত্ব প্রচলিত আছে। বলাবাহুল্য, নেপালের বর্ত্তমান রাজা গুর্খা বংশোদ্ভব, সুতরাং কি সৈনিক বিভাগ কি উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী সকলকেই এই গুর্খাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

গুর্খা এবং নেওয়ার—এই উভয় জাতিই এখানকার উচ্চ বংশোদ্ভব। ইঁহাদের স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই পরিচ্ছদ সুদৃশ্য। বাহ্যিক বেশ-ভূষা দেখিয়া এই উভয় জাতির পার্থক্য কিছু জানিতে পারা যায় না। পা জামা এবং চাপকানের ন্যায় এক প্রকার জামাই ইঁহাদের সাধারণ বেশ-ভূষা,

কিন্তু আবার কাহারও গাত্রে বিলাতী ধরণের ছাঁট, কোটও দেখিতে পাওয়া যায়। এই জামা বা চাপকানের উপর সাদা কাপড়ের কোমর-বন্ধ, মস্তকে একটী কাপড়ের টুপি। অর্দ্ধনগ্ন দেহে এ দেশের রাজপথে কাহাকেও চলিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। অত্যন্ত দীন হইতে পথের ভিখারীদিগকেও রাজাজ্ঞায় এখানে তাহার দেহ বস্ত্রাবৃত করিয়া থাকিতে হয়।

ইহাদের সাধারণ রমণীগণ সচরাচর বিশ-ত্রিশ হস্ত দীর্ঘ বিচিত্র বর্ণের শাড়ী পরিধান করিয়া থাকেন,আবার হিন্দুস্থানী রমণীগণের ন্যায় ইহারা সম্মুখভাগে কোঁচা দিয়া কাপড়ও পরিধান করিয়া থাকেন,তাঁহাদের ঐ কোঁচা ভূমি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া যায়। দেহের উর্দ্ধাঙ্গে জামা এবং আব-রণের নিমিত্ত কেহ কেহ চাদর বা ওড়না ও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

নেপালী রমণীদিগের কেশ-বিন্যাসের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। আমাদের বাঙ্গলা দেশের স্ত্রীলোকেরা যেরূপ সম্মুখদিকে সিতি কাটিয়া পশ্চাদ্ভাগে বেণীর রচনা করেন, তাঁহারা সেইরূপ পশ্চাদ্ভাগে সিতি কাটিয়া কপালের উপর এক বেণী রচনা করিয়া আপন আপন সৌন্দর্য্য দেখা-ইতে থাকেন। কি সধবা—কি বিধবা—সকলেই এইরূপ বেশ ভূষায় ভূষিতা হইয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে সধবা বা বিধবা ভেদ করিতে হইলে তাঁহাদের পরিচ্ছদ এবং মস্তকে লাল রঙ্গের সূতার গুচ্ছ বেণীর সহিত বিনান দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। যাঁহারা ভাগ্যহীনা অর্থাৎ বিধবা, তাঁহাদের মস্তকে এই লাল বর্ণের গুচ্ছটী থাকে না।

রাজবাটী হইতে পথের ভিখারিণী পর্য্যন্ত সকলকার হাতে চুড়ি এবং গলায় পুঁথির মালা—এইরূপ লক্ষণযুক্তা মহিলাদিগকে দেখিলেই ভাগ্যবতী অর্থাৎ সধবা বলিয়া জানা যায়। এ দেশের মহিলাগণ বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেদের ন্যায় বেশী অলঙ্কার পরিধান করেন না।

নেপালীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণদিকের আকৃতির পার্থক্য দেখিলেই সহজেই তাঁহাদিগকে চিনিতে পারা যায়, কারণ ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষাকৃত কৃশ, ক্ষিপ্র এবং আর্য্য-লক্ষণযুক্ত। এখানকার অধিবাসীরা ব্রাহ্মণ এবং গুরুদিগকে অতিশয় ভক্তি করিয়া থাকেন। স্থানীয় গৃহস্থেরা হিন্দু-দিগের ন্যায় বার মাসই—বার ব্রত করেন। পিতামাতা কিম্বা গুরুজনের চরণ মস্তকে ধারণ করিয়া অভিবাদন করেন, কিন্তু ব্রাহ্মণগণের পদরজঃ গ্রহণের ব্যবস্থা আমাদের বাঙ্গালীদিগের চক্ষে যেন কিঞ্চিৎ হাস্যো-দ্দীপক। কারণ ভক্তগণ ধুলিতে মস্তক রাখিয়া পদরজঃ গ্রহণের পূর্ব্বেই তাঁহারা অর্দ্ধ পথে মস্তকে পা তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। যে কোন পুণ্যক্রীয়া করুক না কেন, এখানকার গৃহস্থ লোকদিগকে ব্রাহ্মণকে অগ্রে দানে সন্তুষ্ট করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রত্যেক সংসারী ব্যক্তিকে তাঁহাদের পুরোহিতদিগকে ভক্তিসহকারে প্রচুর পরিমাণে দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। নেপালে দুর্গোৎসব, শ্যামা পূজার সময় আলোকমালা, ইন্দ্রমালা, ভাই পূজা, হোলি, নাগপঞ্চমী, জন্মাষ্টমী, রাখীপূর্ণিমা প্রভৃতি অনেকগুলি ব্রত হিন্দুদিগের ন্যায় বর্ত্তমান আছে।

এ দেশে ব্রাহ্মণ গুরুতর অপরাধ করিলেও তাঁহার প্রাণ দণ্ডের ব্যবস্থা নাই।

সংসারী নেপালীমাত্রেই কৃষক। কি ব্রাহ্মণ. কি শূদ্র সকলেই আপন আপন ক্ষেত্রে কৃষিকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকেন, অর্থাৎ প্রত্যেক গৃহস্থ বৎ-সরের চাউল,তরকারী প্রভৃতি আপন আপন ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন করিয়া লন। মোট কথা, প্রত্যেক গৃহস্থ গৃহে মহিষ কিম্বা গাভী, ক্ষেত্রে চাউল গম, তরকারী প্রভৃতি বার মাসের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখেন।

এখানকার জনসংখ্যার মধ্যে রাজাজ্ঞায় একাংশ ভাগকে সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত হইতে হয়।

যে নেপাল বিস্তীর্ণ উপত্যকার উপর অবস্থিত, তাহার পূর্ব্ব-পশ্চিমের দৈর্ঘ্য অন্যূন বিশ মাইল এবং প্রস্থে উত্তর-দক্ষিণে অতি কম পনের মাইল। এই বিস্তীর্ণ উপত্যকার একাংশে কাটামুণ্ড সহর অবস্থিত।

বিষ্ণুচক্রে বিচ্ছিন্ন সতীর জানুদ্বয় নেপালে পতিত হওয়াতে দেবী মহামায়া ভৈরব কপালী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া পুরী আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। এখানে যথানিয়মে দেবীর প্রত্যহ পূজা ও বেদ-মন্ত্র পাঠ হইয়া থাকে। নেপালে উপস্থিত হইয়া এই মহামায়া দেবীর অর্চ্চনা করিয়া জীবন ও নয়ন সার্থক করিতে অবহেলা করিবেন না। প্রত্যহ অভিষেকের সময় যজুর্ব্বেদী মন্ত্র পাঠ হইয়া থাকে, পূজার সময় দেবী স্থানে "শ্রীসুক্ত" "ভূসুক্ত" পাঠ এবং কর্পূরালোকে আরতির সময় "পুরোহিত" মন্ত্র পাঠ হইয়া থাকে। মন্ত্রপুষ্প প্রদান সময়ে যথানিয়মে "মন্ত্রপুষ্প" পাঠ হয়, এইরূপ সকল দেবীস্থানে হইবার বিধান আছে।

সহরের প্রান্তভাগে এক স্থানে একটী প্রসিদ্ধ গুম্ফা দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ গুম্ফা (গুহা) অত্যন্ত অন্ধকারময়। স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, এক লামা উক্ত গুহার মধ্যে বসিয়া যোগ-সাধন করিয়া সিদ্ধলাভ করেন, তজ্জন্য এদেশবাসীরা উক্ত স্থানটীকে এক পুণ্য তীর্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই অন্ধকার গুম্ফা সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, ইহার মধ্যে একটী সুরঙ্গ আছে, ঐ সুরঙ্গ পথটী বরাবর তিব্বত দেশের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। কারণ যে লামা এখানে যোগসাধন করিতেন, তিনি তিব্বতদেশীয় ছিলেন, আপন সুবিধার্থে যোগবলে তিনি এই দীর্ঘ্য পথটী প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন।

বিদেশী যাত্রীগণ নেপাল সহরে উপস্থিত হইয়া আপন রুচি অনু-সারে খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এখানে নগরের ভিতর খাদ্য

সামগ্রীর মধ্যে ঘৃত, দুগ্ধ, চাউল, ডাইল, মোকায়ের ছাতু ও আটা ময়দা এবং সরকরা, আর ফলের মধ্যে কেবল ইক্ষু ও কমলা নেবু, (শান্তলা) তরকারীর মধ্যে গোল আলু, কপি, কড়াইশুটী ও নানাবিধ শাক— প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

এ প্রদেশে যে সকল ভুটিয়াবাসী বাস করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই রোজা, চিকিৎসক ও গুরুগিরি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। আমাদের বাঙ্গালা দেশে যেরূপ ব্রহ্ম-চারীরা গেরুয়া বসন পরিধান করেন, এখানকার ভুটিয়াবাসী-লামারাও সেইরূপ গেরুয়া পরিচ্ছদে ভূষিত হন, অধিকন্তু ইঁহারা উষ্ণীষ বন্ধন করিয়া আপন মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া বেড়ান, এবং উপাসনাকালে মৃগচর্ম্মোপরি উপবেশনপূর্ব্বক ভল্লুকের চর্ম্ম স্বীয় কপালে বন্ধন করিয়া থাকেন। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন আচার-ব্যবহার এবং পরিচ্ছদ দেখিয়া তিব্বতবাসী ও ভুটিয়াবাসী লামাদিগকে চিনিতে পারা যায়। এদেশ-বাসী সাধারণ লোকদিগের ন্যায় ইহারা মস্তকে বেণী রাখেন না। লামারা বাঙ্গলা দেশের সভ্য বাবুদিগের ন্যায় মস্তকে ছোট ছোট চুল রাখিয়া থাকেন। ধর্ম্মালোচনাই ইহাদের একমাত্র কর্ম্ম। বলাবাহুল্য যে, আমরা যেরূপ দেবতা ও গুরু পুরোহিতগণকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, তথাকার সাধারণ লোকেরা সেইরূপ লামাদিগকে শ্রদ্ধা বা ভক্তি করিয়া থাকেন। যাত্রীগণ যদ্যপি কখন কেহ এই সহরে আসেন, তাহা হইলে এখানকার বিখ্যাত মৃগনাভী অল্প মূল্যে কিছু সংগ্রহ করিতে ভুলিবেন না; কারণ গৃহস্থ লোক ইহার সাহায্যে অনেক সময় বিবিধ প্রকারে উপকার প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই।

নেপালবাসীদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, "নারায়ণ মণিপদ্মেহম" এই পুণ্য শ্লোকটী বারম্বার উচ্চারণ করিতে পারিলে পরকালের গতি হয়।

বিনা কষ্টে এবং বিনা ব্যয়ে পুণ্য সঞ্চয় করিবার অনেক প্রকার ফিকির ইহারা জানেন, প্রমাণস্বরূপ একটী বিষয় উল্লেখ করিতেছি, আমরা এদেশে যেরূপ সদাসর্ব্বদা হরিনাম জপ করিয়া মুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া থাকি, তাহারাও সেইরূপ উপরোক্ত শ্লোকটী বারম্বার উচ্চারণ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন। তাহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস, উক্ত শ্লোকটী যিনি যতবার উচ্চারণ করিতে পারিবেন, তিনি ততই পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিবেন—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে জলস্রোতের মধ্যে একখানি ঘূর্ণিত চক্রের মধ্যে সেই শ্লোকটী স্বহস্তে লিখিয়া স্থাপন-পূর্ব্বক হাত দিয়া বা দড়ীর সাহায্যে ঐ যন্ত্র-চক্রটীর চাকাখানি বারম্বার ঘুরাইবার জন্য সময় মত নির্জ্জন স্থানে বসিয়া নির্ব্বিঘ্নে পুণ্য সঞ্চয় করিতে থাকেন। একদা আমি তাহাদিগকে এইরূপ একটী যন্ত্র ঘুরা-ইতে দেখিয়া কি উদ্দেশে এইরূপ করিতেছেন জিজ্ঞাসা করাতে তাহা-দেব নিকট যে উত্তর পাইলাম, উহাতেই আমাকে স্তম্ভিত হইতে হইল। সে উত্তরটী পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এই স্থানে প্রকাশ করিলাম, "অনেক পুণ্যফলে পূর্ব্ব জন্মের তপস্যার ফলে জীব কর্ম্মফ ভোগ করিয়া দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিতে পারে, কত লক্ষ , কোটি কোটি অনন্ত কোটি যোনী মধ্যে বাস করিয়া প্রাণী সৎকর্ম্মের সাহায্যে যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে, তাহারই ফলে তাহারা মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য সকল জীবের শ্রেষ্ঠ। সেই দুর্লভ শ্রেষ্ঠ মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়া সংসারের নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও তাহাদিগকে যে কি ভয়াবহ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে হয়, উহা মুখে ব্যক্ত করা অসাধ্য, তৎপরে দেহান্ত হইলে যখন সেই পরম পুরুষ এক-মাত্র ঈশ্বরের নিকট জবাব দিতে হয়, তখন মনুষ্যদিগের কি উহাই সতত চিন্তা করা উচিত নয়? বাবু সাহেব! আমরা লামাদিগের নিকট

উপদেশ পাইয়াছি, ঈশ্বর স্থূলরূপে বিরাটাকার ; সে আকার এত বড় যে, পাছে আমরা দেখিলে মূর্চ্ছা যাই, তাই তিনি কৃপা করিয়া কাহাকেও সহজে দর্শন দেন না ; অপর দিকে তিনি সূক্ষ্ম—এত সূক্ষ্ম যে মানবেরা তাঁহাকে চর্ম্ম চক্ষে দর্শন পান না। অনেকে ভুলক্রমে আপাত মধুর পরিণাম বিষ-কার্য্যের জন্যই উন্মাদ, সামান্য অস্থায়ী পদার্থের জন্যই লালায়িত ; যাহা সত্য, নিত্য শুদ্ধ, শান্ত ও চিরস্থায়ী, মনুষ্যদিগের তাঁহারই প্রতি কি দৃষ্টি রাখা উচিত নয় ? প্রমাণস্বরূপ দেখুন, ঈশ্বরের পরীক্ষাভূমি এই মহা সংসারে প্রত্যেক গৃহস্থই গরীব হইলেও কর্ত্তা-রূপে একজন-না-একজন আপন সংসারে অবস্থানপূর্ব্বক রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন, সেই রাজত্বকালে নানা কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া কেবল স্ত্রী, পুত্র, পরিবারাদির মায়ায় মুগ্ধ না থাকিয়া যিনি সতত ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে পারেন, ভগবান্ তাহারই প্রতি সন্তুষ্ট হন। অর্থাৎ ইহার ফলে সেই ব্যক্তি পরজন্মে নানাপ্রকার সুখভোগ করিতে সমর্থ হন। আমাদের পুরোহিত লামাদিগের নিকট এইরূপ উপদেশ পাইয়া সময় মত এক মনে ভক্তিভাবে আপন আপন মুক্তির পথ পরিষ্কারের জন্য এইরূপে সেই সর্ব্বশক্তিবান ঈশ্বরের নাম জপ করিয়া থাকি।"

কাটামুণ্ড

নেপালের রাজধানী কাটামুণ্ড। ইহা সমুদ্রতীর হইতে চারি হাজার ফিট উচ্চ, অনুসন্ধানে অবগত হইলাম—এই কাটামুণ্ডতে অন্যূন প্রায় পঞ্চাশ সহস্র লোক বাস করিতেছেন। এই প্রাচীন স্বাধীন রাজধানীর রাস্তা ঘাট যাহা দৃষ্ট হইল, উহা অত্যন্ত অপ্রশস্ত, এমন কি সমস্ত সহরটী অত্যন্ত অপরিষ্কার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সহরের মধ্যস্থলে নেওয়ারদিগের পুরাতন প্রাসাদটী মস্তক উত্তোলন-পূর্ব্বক আপন শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। এই প্রাসাদটীর কতক অংশ অতি প্রাচীন এবং ভগ্নাবস্থায় অপরিচিত বিদেশী যাত্রী-দিগকে যেন তাহার শোভা দর্শন করাইবার জন্যই গর্ব্বভরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রাসাদটী প্রথমে নয়নগোচর হইলে "বর্ম্মা-পাগদা" বলিয়া ভ্রম হইতে থাকে, অর্থাৎ ইহা এত কারুকার্য্যে পরিপূর্ণ, যেন ঠিক বর্ম্মা দেশের পাগদারের ন্যায় সৌন্দর্য্যযুক্ত। এই সহরের মধ্যে নানা স্থানে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠিত থাকাতে ইহার শোভা আরও বৃদ্ধি করিয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। এই সকল মন্দির-গুলির মধ্যে অধিকাংশই কাষ্ঠনির্ম্মিত। প্রত্যেক মন্দিরের ছাদগুলিতে পিত্তল বা তামার পাতের দ্বারা গিল্টী করা, আবার প্রত্যেক তলার মন্দির কার্ণিসে বহু সংখ্যক ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা থাকায় বায়ুভরে সেগুলি আপনা-আপনি টুংটাং শব্দে বাজিতে থাকে। এই সকল মন্দিরগুলির নির্ম্মাণ কৌশল নয়নগোচর হইলে চক্ষুর সার্থক হয়, আবার ইহার অভ্যন্তরে দৃষ্টি করিলে কেবল বহু মূল্য দ্রব্য সম্ভারের দ্বারা সজ্জীকৃত দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের ভিতরকার প্রাচীর দেওয়াল-গুলি গিল্টীর চিত্র দ্বারা শোভিত আছে। গোম্বুজ স্তম্ভযুক্ত প্রস্তরময় মন্দিরও এখানে বিস্তর আছে; বৌদ্ধ ধর্ম্মই নেপালের প্রধান ধর্ম্ম। দেশনয় এখানে যে সমস্ত মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমস্তগুলির মধ্যে প্রায়ই বৌদ্ধদিগের ভক্তি চিহ্নস্বরূপ নানাবিধ কীর্ত্তি আছে। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত এই সকল মন্দিরের মধ্যে একটী সুন্দর গোম্বুজযুক্ত মন্দিরের চিত্র প্রদত্ত হইল।

রাজবাটীর সন্নিকটে অনুমান দুই শত গজ দূরে একটী সুন্দর সুসজ্জিত অট্টালিকা গর্ব্বভরে আপন শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে;

এই অট্টালিকাটী "কটবাড়ী" নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, ১৮৪৬ খৃঃ উক্ত কটবাড়ীতে দেশের অনেক সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী এমন কি যিনি প্রধান মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, যাঁহার যশ সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইত, যে মহাত্মার অপার দয়ায় সকলেই বশীভূত হইয়া ঈশ্বরের নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতেন, সামান্য দীন প্রজা হইতে রাজ্যেশ্বর পর্য্যন্ত সকলেই যাঁহার প্রভাবে সতত ত্রাশিত হইতেন, সেই সর্ব্বগুণের আধার নেপালের একমাত্র শ্রীবৃদ্ধিকারক প্রধান মন্ত্রীকে পর্য্যন্ত বিদ্রোহীগণ আপন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য একদা নিমন্ত্রণ করিয়া ইহার মধ্যে গুপ্ত ভাবে সামান্য পশুবলির ন্যায় নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিয়াছিল। এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের বিষয় নেপাল রাজেশ্বরীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে, তিনি ঐ সকল মহাত্মাদিগের নিপাতের বিষয় শ্রবণ করিয়া কাতর হইলেন, এবং রাজ্যের পরিণামের বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দুঃখে ও শোকে অধীর হইলেন, তৎপরে ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য স্থির সঙ্কল্প করিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ "জঙ্গ বাহাদুর" তখন রাজ্ঞীর মনোভাব অবগত হইয়া এই দুষ্কর কর্ম্ম সাধন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া তৎস্থানে অঙ্গীকার করিলেন। শোকাতুরা রাজ্ঞী, তাঁহার সাহসে আরও উত্তেজিত হইয়া জঙ্গ বাহাদুরকে গুপ্তভাবে গুটিকত উপদেশ প্রদান করিয়া এই ভয়াবহ কার্য্যোদ্ধারের ভারার্পণ করিলেন। তখন তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে আপন অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং রাজ্ঞীর উপদেশ মত স্থানীয় অবশিষ্ট সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে সানন্দে আহ্বানপূর্ব্বক এক দল সুশিক্ষিত বিশ্বাসী সৈন্য সমভিব্যাহারে বীরবিক্রমে উক্ত কটবাড়ী অবরোধ করিয়া বিদ্রোহীদিগকে তৎক্ষণাৎ সমূলে বিনাশ করিলেন। মহারাণী সৈন্যাধ্যক্ষের এই অসীম সাহস এবং কার্য্যকলাপ দর্শনে তুষ্ট হইয়া তাঁহার অঙ্গীকার পালনের পুরস্কার-

স্বরূপ জঙ্গ বাহাদুরকে ঐ শূন্য প্রধান মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি তিনি মহারাণীর কৃপায় এই দেশ শাসন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আপন ক্ষমতানুসারে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দক্ষতার সহিত প্রজাপালন করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপিত করেন।

কাটামুণ্ড—অর্থাৎ কাষ্ঠময় নিকেতন। নেপালের উপত্যকা হইতে এই সহরতলীতে আগমনকালে চন্দ্রগিরির শিখর দেশ হইতে এখানকার রাজধানীটী একখানি চিত্রপটের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। কাটামুণ্ডের চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালায় অবরুদ্ধ, কেবল পুণ্যতোয়া বাঘমতী নদীর নির্গমস্থলে ইহার এক স্থান পৃথক্ ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কাটামুণ্ডতে যে সকল প্রাচীন কাষ্ঠময় নিকেতন আছে, যাহার নিমিত্ত এই রাজধানী কাটামুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানকালে সেই কাষ্ঠ নির্ম্মিত নিকেতনগুলি কেবল ফকীরদিগের আশ্রমস্থান রূপে অবস্থান করিতেছে। এই রাজধানীর একটী সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে,এখানকার অধিবাসীরা সতত আনন্দ মনে গীত বাদ্যসহকারে সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। রাজধানী মধ্যে রাজাজ্ঞায় কোন নীচ জাতীয় [illegible]র অবস্থান করিবার অধিকার নাই।

পুণ্যতোয়া বাঘমতী নদী এবং ইহার শাখা-প্রশাখা কাটামুণ্ড সহরটীর চতুর্দ্দিক যেন বেষ্টন করিয়া আছে। সহরের ঠিক মধ্যস্থলে এখানকার পূর্ব্ব রাজাদিগের পুরাতন. প্রাসাদমালা "হনুমানঢোকা" (ঢোকা-শব্দে দ্বারস্বরূপ) বর্ত্তমান থাকিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই হনুমানঢোকার সিংহদ্বারের সম্মুখে এক প্রকাণ্ড হনুমানের মূর্ত্তি স্থাপিত থাকায় ইহার নাম হনুমানঢোকা হইয়াছে, হনুমানঢোকা নামক প্রাসাদের দ্বারদেশটী স্বর্ণনির্ম্মিত। এই

চিত্রিত প্রাসাদটী বহির্ভাগ হইতে দেখিলে যেন ইহাকে একটী কারাগৃহ বলিয়া অনুমান হয়। অবগত হইলাম, স্থানীয় কোন নরপতি এই প্রাসাদ মধ্যে অবস্থান করেন না। হনুমানঢোকার সম্মুখে এবং আশে-পাশে নানাবিধ সুদৃশ্য দেবমন্দির, স্তম্ভ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এই স্থানের শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত করিতেছে।

রাজধানীর মধ্যে—স্থানে স্থানে অনেকগুলি ছোট বড় বাজার আছে, তন্মধ্যে "ইন্দ্রচক্" নামক বাজারটীই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ইন্দ্রচকে প্রবেশ করিলে কলিকাতার বড় বাজার বলিয়া ভ্রম হয়,কেন না এই বাজার মধ্যে সহরটী এত পার্ব্বত্য প্রদেশ হইলেও কেবল বিলাতী পণ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ অর্থাৎ প্রত্যেক দোকানগুলিতেই বিলাতী মালে সজ্জীকৃত। যদিও এই সহরের রাজপথগুলি অপ্রশস্ত, তথাপি ইহা প্রস্তর নির্ম্মিত। রাস্তার উভয় পার্শ্বে দ্বিতল গৃহ সকল নির্ম্মিত হইয়া নেপাল অধিবাসীদিগের ধনবলের পরিচয় প্রদান করিতেছে। প্রত্যেক গৃহগুলিতে কাষ্ঠের কারুকার্য্যে শোভিত বারান্দা সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এই সকল বাড়ীর শোভা বিস্তার করিয়া আছে। এতদ্ভিন্ন কাটামুণ্ড সহরে কলিকাতার চৌরঙ্গির রাজপথের ন্যায় বিস্তর অট্টালিকাও দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজধানীর উত্তরদিকে টুন্‌ডিখেল নামে এক প্রশস্ত ময়দান আছে। সেই ময়দানের পশ্চিমদিকে বীর-হাঁসপাতাল ও দরবার-স্কুল বাটী আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। উত্তরে রাণীপুকুর এবং মহারাজ বীর শামসের সাহেবের লালদরবার নামক প্রাসাদ বিরাজিত। এই প্রশস্ত ময়দানের উপর কোন স্থানে জঙ্গ বাহাদুর, কোন স্থানে বীর শামসের আবার কোন স্থানে বা ভীমসেন থাপা মহোদয়ের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ময়দানের পূর্ব্ব-দক্ষিণকোণে বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রীর সিংহ-দরবার নামে এক শ্বেত সৌধমালা বিরাজমান থাকিয়া দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করিতেছে। এই সৌধমালা ব্যতীত এখানে আরও অনেকগুলি খ্যাত-নামা দরবার গৃহের দর্শন পাওয়া যায়।

টুলিখিলির পশ্চিম-দক্ষিণকোণে এক অত্যুচ্চ মনুমেণ্ট, ইহার সন্নিকটে বাঘ-দরবার নামে একটী প্রাসাদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাসাদের দক্ষিণদিকে "মস্কালের মন্দির" দর্শনমাত্র ইহাকে অতি পুরাকালের স্থাপিত বলিয়া অনুমান হয়। অবগত হইলাম, স্বয়ং রাণা মহারাজ এখানকার এই দেবালয়ে প্রত্যহ বিগ্রহ মূর্ত্তি দর্শন না করিয়া জল গ্রহণ করেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই প্রসিদ্ধ বিগ্রহ মূর্ত্তিটীকে স্থানীয় কি হিন্দু কি বৌদ্ধ সকলেই ভক্তিসহকারে পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন। অধিকন্তু এই জাগ্রত দেবতার বিস্তর সম্পত্তিও আছে।

টুলিখিলির চতুঃসীমায় হর্ম্মাবলী দ্বারা সৈন্যাবাস প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে এই স্থান এক অপূর্ব্ব শ্রীতে শোভিত হইয়াছে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে চিরপ্রথানুসারে এখানকার সৈন্যাবাস হইতে রণবাদ্য বাজিয়া রাজ্যের মঙ্গল কামনা করিবার প্রথা আছে। এই মঙ্গলসূচক বাদ্যধ্বনি অতি শ্রবণ মধুর! বলাবাহুল্য, রাজধানী মধ্যে যতগুলি প্রাসাদ বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে এই টুলিখিলির সৈন্যাবাসটী সৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

এই স্থানে একটী কথা বলিবার আছে—আমরা রকসোল হইতে যে গাড়ীওলাদের এখানে আনিয়াছিলাম, তাহারা যে কেবল ভীমপেদীতে কার্পেট সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাদের উপকার করিয়াছিল এরূপ নয়, এই অপরিচিত স্থানে তাহাদের সাহায্যে প্রথমতঃ কার্পেট, যে কার্পেটে—ধনী ব্যক্তি ব্যতীত আরোহণ করিতে সমর্থ হন না,

কাটামুণ্ড নগরের গম্বুজযুক্ত মন্দিরের দৃশ্য। [১৭৮ পৃঃ

দ্বিতীয়তঃ বিশ্রাম স্থান সংগ্রহ এবং এখানকার দেবালয় হইতে আরম্ভ করিয়া সৈন্যাবাস, প্রাসাদ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি কেবল তাহাদেরই সাহায্যে সন্ধান পাইয়াছিলাম।

মহাভারতে যে কৈলাশপুরীর বিষয় বর্ণনা আছে, নেপালের রাজধানীতে পরিভ্রমণকালে ইহাকে সেই কৈলাশপুরী বলিয়াই ভ্রম হয়। কারণ কাটামুণ্ড সহরে যাহা কিছু নয়নগোচর হয়, তাহাতেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এ দৃশ্য যিনিই দর্শন করিবেন, তাঁহাকেই মুগ্ধ হইতে হইবে, সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল, গুর্খা বা নেপালীরা আমাদের চক্ষে তাদৃশ সুশ্রী নয়, কিন্তু সে ধারণা আমায় এখানে আসিয়া পরিবর্ত্তন করিতে হইল। কারণ কাটামুণ্ড সহরে উচ্চ বংশোদ্ভব যে সকল গুর্খাদিগের দর্শনলাভ করিলাম, উহারা যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, বিশেষতঃ এই রাজবংশের মহিলাগণকে দর্শন করিলে যেন স্বর্গের অপ্সরী বা বিদ্যাধরী কিম্বা পরীদিগের সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। অপরাহ্নকালে যখন এই সকল রাজবংশোদ্ভব স্ত্রী পুরুষগণ বিচিত্র বর্ণের পোষাক পরিধান করিয়া বিবিধ যান-বাহনাদিতে আরোহণপূর্ব্বক স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিতে সহর পরিভ্রমণ করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের ভুবনবিজয়ী অপরূপ রূপ দর্শন করিলে আত্মহারা হইতে হয়। এমন কি ঐ সময় তাঁহাদিগের সেই মূর্ত্তি দর্শন করিলে দেবদেবী বলিয়া ভক্তির উদ্রেক হইতে থাকে।

এখানকার রাজপরিবার কিম্বা ধনী উচ্চ পদস্থ গৃহস্থের মহিলাগণ সাধারণ রমণীদিগের ন্যায় কোঁচা দিয়া কাপড় পরিধান করেন না। এই সকল উচ্চ বংশোদ্ভবা মহিলারা—পা জামা জ্যাকেট এবং তদোপরি ওড়না ব্যবহার করিয়া থাকেন। অবগত হইলাম, গুর্খা রাজগণ

উদয়পুরের রাজপুত বংশোদ্ভব বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহার প্রধান কারণ এই যে, মুসলমানদিগের অত্যাচার ভয়ে ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ গোরকথালি নামক স্থানে গিয়া নির্ব্বিঘ্নে বসবাস করেন, তৎপরে তাঁহারাই এই হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশে আসিয়া নেওয়ার রাজগণকে আপন বাহুবলের পরিচয় দিয়া যুদ্ধে পরাস্তপূর্ব্বক রাজ্য স্থাপন করেন। এই নিমিত্ত ইহাদের গুর্খা নাম হইয়াছে।

কাটামুণ্ড সহরের দেবালয় এবং বিবিধ প্রকার শোভা সন্দর্শনপূর্ব্বক যে দেবের দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া এত অর্থ ব্যয় এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এখানে উপস্থিত হইলাম, এইবার সেই দেবের পূজার্চ্চনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

রাজধানী হইতে ভগবান পশুপতিনাথের মন্দির অন্যূন তিন মাইল উত্তর-পূর্ব্বে বাগবতী নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। নেপাল সহরে অন্যূন ২৭৫০০টী দেবমন্দির আছে, তন্মধ্যে পশুপতিনাথের মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান। যে সকল যাত্রী যান-বাহন অভাবে ক্রমাগত এই পার্ব্বত্য দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে করিতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সহর মধ্যে অজস্র ঝোলা-তীর্থ স্থানে যাইবার জন্য ভাড়া পাওয়া যায় দেখিবেন এবং প্রফুল্ল মনে অল্প মূল্যে ঐ সকল ঝোলা ভাড়া করিবেন; তাঁহাদিগকে পয়সা দিয়া এক বিড়ম্বনাভোগ করিতে হয়, কেন না এখানকার এই ঝোলা বাঙ্গলা দেশের একখানি ইজিচেয়ারের মত দেখিতে, এবং পূর্ব্বে খাটোলীর যেরূপ চিত্র দেখিয়াছেন, ইহারও অনেকটা সেইরূপ আকৃতি—কিন্তু উহাতে আরোহণ করিলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্থির-ভাবে শয়ন করিয়া যাইতে হয়, নড়ন-চড়ন করিলেই ভূমে পতিত হইবার সম্ভাবনা। এই ঝোলাও খাটোলীর ন্যায় তিনজন বাহকে বহন করিয়া থাকে, দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিলে যেন বাঙ্গলা দেশে শব বহন

করিয়া লইয়া যাইতেছে বলিয়া ভ্রম হয়। সে যাহা হউক, আমরা রাজধানীর শোভা দর্শন করিতে করিতে তীর্থ স্থানের যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, পশুপতিনাথের পাণ্ডাগণ কি নাম, কোন পদবী কোন জেলায় বাড়ী, পশ্চিম তীর্থ স্থানের ন্যায় এখানেও সেইরূপ প্রশ্ন করিতে করিতে বিব্রত করিতে লাগিলেন। এরূপ পাণ্ডা এখানে অনেক আছেন, পাণ্ডাবৃত্তিই তাঁহাদের একমাত্র জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়। এই সকল পাণ্ডাদিগের মধ্যে উমাকান্ত নামে একজন পাণ্ডার সহিত বাক্যালাপে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেই আমরা এখানকার তীর্থগুরু পদে মান্য করিলাম। বলাবাহুল্য, তিনিও আগ্রহের সহিত আমাদিগকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক পশুপতিনাথের মন্দির নিকটস্থ প্রশস্ত পান্থশালার এক কক্ষমধ্যে বিশ্রাম করিবার স্থানদান করিয়া সুখী করিলেন। এই সুদীর্ঘ সুবৃহৎ পান্থশালাটী পশুপতিনাথের জন্য যাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্যই নেপালরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পান্থশালায় কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর একবার ধূলাপায়ে মন্দির প্রাঙ্গণের বাহির হইতে ভগবানের পঞ্চমুখবিশিষ্ট মূর্ত্তি দর্শন লাভ করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক বোধ করিতে লাগিলাম। বলাবাহুল্য, এই দিবস আমরা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে পাই নাই, কারণ পাণ্ডার নিকট উপদেশ পাইলাম, বাগবতী নদীতে স্নান না করিলে কাহারও মন্দির মধ্যে প্রবেশাধিকার নাই। পর দিবস যথানিয়মে যথাসময়ে নিকটস্থ স্রোতগামী পুণ্যতোয়া বাগবতী নদীতে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান, তর্পণ সমাপনান্তে ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া মহাব্রত উদ্যাপন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

এই নদীর পরপারে গুহ্যেশ্বরীদেবীর দেবালয় শোভা পাইতেছে। তথায় জগজ্জননীর অর্চ্চনাসহকারে নয়ন ও জীবন সার্থক বিবেচনা করিতে লাগিলাম। এখানে যথানিয়মে বেদ পাঠ হইয়া থাকে, এই

বেদ মন্ত্র পাঠ কি শ্রবণ মধুর! বেদ পাঠের সময় ব্রাহ্মণেরা দুই সারিতে বিভক্ত হইয়া উপবেশন করিয়া থাকেন। এক দল এক চরণ আবৃত্তি হইলে অপর দল দ্বিতীয় চরণ আবৃত্তি করেন, সুতরাং বেদ পাঠকারীরা শ্বাস লইতে সময় পাইয়া দুই হইতে চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত অনায়াসে বেদ-গান করিয়াও ক্লান্ত হইয়া পড়েন না। দশটী বৈদিক একত্রে বেদ-গান করিতে থাকিলে পাঁচ শত ফিট অন্তর হইতে উক্ত বেদপাঠ ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের বাঙ্গলা দেশে বেদ পাঠের প্রথা অতি অল্পই দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায়। বিবাহাদি কর্ম্মে যে সকল বৈদিক মন্ত্র ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাও প্রকৃতপক্ষে এরূপ মধুরভাবে উচ্চারিত হয় না। এপ্রদেশের অর্চ্চকেরা ভালরূপে সংস্কৃত না জানিলেও পূজার বৈদিক মন্ত্র ও অর্চ্চনার সময় মন্ত্র-পুষ্পাদি অতি মধুর স্বরে পরিষ্কাররূপে পাঠ করিয়া থাকেন। বেদের চর্চ্চা যাহা কিছু এই সকল প্রদেশেই আছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এইরূপে গুহ্যেশ্বরীদেবীর শ্রীচরণে ভক্তিদান করিয়া পাণ্ডার উপদেশ মত এখান হইতে মূল মন্দিরে যাত্রা করিলাম। গুহ্যেশ্বরীর মন্দিরে একটী স্বর্ণময় আবরণযুক্ত উৎস দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ আবরণটী খুলিলে উৎসের জল হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে পারা যায়।

এখানকার পাণ্ডারা বেশ হিন্দী ভাষায় কথা কহিয়া এবং তীর্থ সম্বন্ধে যাত্রীদিগকে নানা বিষয় উপদেশ প্রদান করিয়া আনন্দোৎপাদন করিয়া থাকেন। এ তীর্থে অনেক ঘর দক্ষিণ দেশস্থ ব্রাহ্মণ, যাঁহারা "দছনী ব্রাহ্মণ" নামে খ্যাত, তাঁহারাই পশুপতিনাথের পাণ্ডাবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

সহর হইতে যতই তীর্থ স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, বাগানের বেড়ার মত প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের পর মন্দির সকল দর্শন করিয়া

স্তম্ভিত হইলাম। এই মন্দিরারণ্যের ভিতর এক স্থানে যে একটী উচ্চ পান্থশালা মস্তক উন্নত করিয়া পরিশ্রান্ত যাত্রীদিগকে আহ্বান করিতেছে। পাণ্ডা আমাদিগকে সেই পান্থশালাটীতেই বিশ্রাম করিতে দিয়াছিলেন, এই পান্থশালার সন্নিকটেই মূলমন্দিরটী শোভা পাইতেছে। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত পশুপতিনাথের দর্শন পথে মন্দিরারণ্যের একটী দৃশ্য প্রদত্ত হইল।

পশুপতিনাথের মন্দিরের গঠন ও আকৃতি ইতিপূর্ব্বে কাটামুণ্ড মধ্যস্থিত যে মন্দির চিত্র দেখিয়াছেন, ইহা ঠিক সেইরূপ প্রস্তর ও কাষ্ঠ সংযোগে নির্ম্মিত। মন্দিরের সম্মুখভাবে পুরীর সিংহদ্বারের ন্যায় একটী উচ্চ স্তম্ভ শোভা পাইতেছে, ইহার এক পার্শ্বে মহাবীর হনুমানজী করজোড়ে ভগবানের স্তব করিতেছেন। এই মূর্ত্তিটী নয়নগোচর হইলে এক অনির্ব্বচনীয়ভাবের উদয় হয়; পুরীর সিংহদ্বারের সম্মুখস্থ প্রশস্ত রাস্তার ন্যায় এখানেও একটী রাস্তা আছে, ঐ প্রশস্ত রাস্তার উপর চিত্রকরেরা বসিয়া জগন্নাথদেবের পটের ন্যায় ভগবান পশুপতিনাথের মন্দিরসহ চিত্র সকল দুই পয়সা হইতে সাইজ এবং পটের শিল্প নৈপুণ্যানুসারে দুই টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহার পার্শ্বস্থ চতুর্দ্দিকে দেব স্থানে পূজা দিবার জন্য ডালার দোকান এবং দেবার্চ্চনার জন্য নানাবিধ পুষ্পাদির দোকান সকল সজ্জিত আছে, ভক্তগণ সাধ্যমত উহা সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

এখানে দেবস্থানে পূজা দিবার কোনরূপ বাঁধা নিয়ম নাই, ভক্তগণ আপন সাধ্যমত পূজার ডালা দিয়া থাকেন। আতপ তণ্ডুল, রক্ত চন্দন, সিদ্ধি, গাঁজা, দুগ্ধ, বিল্বপত্র, পুষ্পমালা এই কয়টী দ্রব্য অর্চ্চনার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সকল নিরূপিত দ্রব্য ব্যতীত ভক্তগণ ইচ্ছা করিলে কেহ রৌপ্য বা স্বর্ণনির্ম্মিত ধুধুড়া ফুল, বিল্বপত্র প্রভৃতি স্বদেশ

হইতে সংগ্রহপূর্ব্বক দেবস্থানে উপহার প্রদান করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন।

পাণ্ডাগিরি ব্যবসা এক স্বতন্ত্র ব্যাপার। কারণ এখানে পূজা দিবার কোন বাঁধা নিয়ম নাই, তথাপি পাণ্ডাজীরা লোক বিশেষ পূজা দিবার জন্য কাহারও নিকট ৷৷৵০, কাহারও নিকট ১৷০, আবার কাহারও নিকট আপন পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত আদায় করিয়া থাকেন। ঐ টাকার মধ্যে সামান্য মূল্যে ডালা খরিদ করিয়া অবশিষ্ট দক্ষিণাস্বরূপ নিজে আত্মসাৎ করেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ ভোজনের ছলে যাহা আদায় হয়, তাহা হইতে ব্রাহ্মণদিগকে কিছু দিয়া অবশিষ্ট মূল্য নিজে লইয়া থাকেন।

পশুপতিনাথের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিবার চারিদিকে চারিটী দ্বার আছে, তন্মধ্যে একটী দ্বার সদাসর্ব্বদা বন্ধ থাকে, অবশিষ্ট তিনটী দ্বারের মধ্যপথ দিয়া ভক্তগণ ভিতরে গমনাগমন করিয়া থাকেন। বলাবাহুল্য, মেলার সময় যাত্রীসমাগম অধিক হইলে তাঁহাদের গমনাগমনের সুবিধার নিমিত্ত এই চারিদিকের চারিটী দ্বারই খোলা হইয়া থাকে। মন্দিরা-ভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই স্থান মাহাত্ম্যগুণে প্রাণে এক স্বর্গীয় ভাবের উদয় হইয়া থাকে, ইহার মধ্যভাগটী এরূপভাবে বহু মূল্য শিল্কের চাঁদয়া ও নানা রং-বেরং এর ঝাড় লণ্ঠনের দ্বারা সজ্জীকৃত আছে যে, যেন এই মন্দির মধ্য স্থানটীই যথার্থ কৈলাশেশ্বরের পুরী বলিয়া অনুমান হয়।

এখানে কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গণের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিস্তর ছোট বড় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, এই সকল শিবলিঙ্গ দর্শনের পর মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবান পশুপতিনাথকে মনের সাধে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া মহাব্রত উদ্‌যাপন করিলাম।

এই মন্দির প্রাঙ্গণে সতত সাধু সন্ন্যাসীতে পরিপূর্ণ, কোথাও শাস্ত্র

পাঠ হইতেছে, কোথাও ভজনগীত হইতেছে, কোথাও ঘণ্টাধ্বনি, কেহ বা কপালে টীকা লইবার জন্য ব্যস্ত, কেহ বা মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছেন। ইহা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য !

ভগবানের সন্ধ্যা-আরতি হইবার পর প্রথমেই বেদ পাঠ হইয়া থাকে। তৎপরে বৈদিক ব্রাহ্মণ দ্বারা পশুপতিনাথের "বিশ্বরূপ ঘন" নামে স্তোত্রগান হইয়া থাকে। এই মধুর স্তোত্র পাঠ শব্দ যাহার কর্ণে প্রবেশ করিবে, তাহারই মন মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয়ভাবের উদয় হইয়া ভগবচ্চরণে ভক্তিদান করিতে ইচ্ছা হইবে ? ধন্য প্রভু পশুপতিনাথ, ধন্য তোমার মাহাত্ম্য !!

আমরা বাঙ্গালা দেশে সচরাচর যেরূপ শিবলিঙ্গ দর্শন পাইয়া থাকি, ভগবান পশুপতিনাথের লিঙ্গ মূর্ত্তিটীর আকৃতি সেরূপ দর্শন পাইলাম না। সেতুবন্ধ তীর্থে ভগবান রামেশ্বরজীউর যেরূপ ডেক ঢাকা সর্প-ফণাবিশিষ্ট পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন পাওয়া যায়, এখানকার এই জাগ্রত লিঙ্গ-রাজের মূর্ত্তিটী অনেকটা সেইরূপ ভাবের আকৃতি ; কিন্তু এখানে এই আদিলিঙ্গ মূর্ত্তির উপরিভাগে সদাসর্ব্বদা একটী পঞ্চমুখবিশিষ্ট মূর্ত্তি ডেক ঢাকা থাকে। সেই মূর্ত্তিটী এক গৌরীপট্ট ভেদ করিয়া হস্ত প্রমাণ উঠিয়া জাগিয়া আছেন, তদোপরি স্বর্ণনির্ম্মিত পঞ্চানন পঞ্চমুখ বিস্তার করিয়া হরিগুণ গানে বিভোর হইয়া ভক্তগণকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন। এই পবিত্র মূর্ত্তি যিনি ভাগ্যক্রমে একবার দর্শন করিয়াছেন, ইহজন্মে তিনি কখন কোনরূপে বিস্মরণ হইতে পারিবেন না। জন্মজন্মান্তরে বহু পুণ্য সঞ্চয় না থাকিলে কখন কাহারও ভাগ্যে সহজে এই মূর্ত্তির দর্শন লাভ হয় না। সুতরাং বলিতে হইবে, পশুপতিনাথের কৃপা ব্যতীত কখন কেহ এত কষ্ট সহ্য করিয়া এই দুর্গম পার্ব্বত্যপ্রদেশে আসিতে সাহসও করিতে পারিবেন না।

শ্রীমন্দিরের অদূরে মৃগস্থলী নামক পর্ব্বতের শিখরদেশে এক রমণীয় জঙ্গল স্থান আছে, তথায় পুষ্কর তীর্থের ন্যায় বিস্তর বানরকুলকে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এই স্থানে নুড়ির ন্যায় বিস্তর শালগ্রামশিলার দর্শন পাওয়া যায়।

ভক্তগণ এ তীর্থে পূজার দক্ষিণাস্বরূপ যাহা দান করেন, উহা পূজারী পাণ্ডারা পান, বাবার মস্তকে বা পৃথক্ ভোগের নিমিত্ত যাহা দান করেন, তাহা দেবসম্পত্তিতে জমা হইয়া থাকে। এই টাকা সংগ্রহ করিয়া হিসাব রাখিবার নিমিত্ত মন্দির মধ্যে সতত একটী লোক হাজির থাকেন আবার এইরূপ এখানে অষ্টোত্তর শত নামার্চ্চনার মূল্য ।/০ আনা, কেহ গৃহস্থের মঙ্গলকামনা করিয়া সহস্র নামার্চ্চনা করাইলে তাহাকে ১৲ টাকা পৃথক্ দিতে হয়। কর্পূরালোকে দেব দর্শনের দক্ষিণা /০ নির্দ্দিষ্ট আছে। নামার্চ্চনার মূল্য যাহা সংগ্রহ হয়, উহা বেদ পাঠকারী ব্রাহ্মণগণের লভ্য।

মূলমন্দির প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে যে সকল স্মার্ত্ত বৈদিক পণ্ডিতগণ অবস্থান করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যজুর্ব্বেদীয় আপস্তম্ভ গৃহ্যসূত্র মতাবলম্বীয়। ইহারা সকলেই বেদ ও উপনিষদ উত্তমরূপে আবৃত্তি করিতে পারেন, তাহাদের মুখে সেই মধুর বেদ পাঠ শ্রবণ করিলে কর্ণ পরিতৃপ্ত হয়। এ তীর্থে ব্রাহ্মণ ভোজনের দিন আমরা তাঁহাদিগকে পান্থনিবাসে আমন্ত্রণ করিয়া বেদ পাঠ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহারা "অশ্বমেধ প্রকরণ ও আশীষ মন্ত্র" সমস্বরে আবৃত্তিপূর্ব্বক আমাদের বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সকল বৈদিক ব্রাহ্মণেরা অতি অল্প দানেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

শিবচতুর্দ্দশীর রাত্রিতে জাগরণপূর্ব্বক এখানে পশুপতিনাথের বিধি অনুসারে ব্রতপালন এবং ভক্তিসহকারে অর্চ্চনা করিয়া পর দিন, সূর্য্যো-

দয় হইলে স্থানীয় পুণ্যতোয়া বাগবতী নদীতে যথানিয়মে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান এবং পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদানপূর্ব্বক দক্ষিণাসহ দ্বিজগণকে ভোজন করাইয়া এবং যথাসাধ্য তীর্থতীরে ভূমি, গো, তিল, রজত, কাঞ্চন দান করিলে হর-হরির কৃপায় সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। অতএব যে কোন ভক্ত এই সময় এই তীর্থে আসিবেন, তিনি যেন কর্ত্তব্যবোধে উপরোক্ত নিয়মগুলি পালন করেন। এইরূপ আবার মহোদয় ও অর্দ্ধোদয়যোগে এই নদীতে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিলে তাহাকে আর ভবযন্ত্রণা বা নরকাদি ক্লেশভোগ করিতে হয় না, এমন কি সাযুজ্য মুক্তিলাভ হয়। তৎকালে পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে তাঁহারা চন্দ্র সূর্য্য স্থিতিকাল পর্য্যন্ত তৃপ্ত থাকেন, নরকস্থ পিতৃগণ পাপ বিমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। অতএব সেই সময়ে এদেশবাসীদিগের মধ্যে যদি কখন কেহ তথায় উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে যথানিয়মে স্নান ও পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজন সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য বোধ করিবেন। পৌষ কিম্বা মাঘ মাসের অমাবস্যা তিথি, রবিবার, ব্যতীপাতযোগ এবং শ্রবণা নক্ষত্রের সহিত মিলিত হইলে অর্দ্ধোদয় যোগ হয়, ইহার কিঞ্চিৎ ন্যূন হইলে মহোদয় যোগ নামে খ্যাত হইয়া থাকে। এই যোগ সময় বাগবতী নদীতে স্নান করিলে বহু পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে, এই নদীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটী প্রাচীন গল্প প্রকাশিত হইল।

পুরাকালে একটী শৃগাল ও একটী বানর জাতিস্মর ছিল, শৃগালটী পূর্ব্বজন্মে এক বেদবিদ ব্রাহ্মণ ছিলেন। "কোন ব্রাহ্মণকে এক আঢ়ক ধান্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া উহা প্রদান করেন নাই। সেই পাপে দেহান্তে নরকভোগ করিয়া শৃগালত্ব প্রাপ্ত হন।" "এইরূপ ঐ বানরও পূর্ব্বজন্মে দেবনাথ নামে এক বিপ্র ছিলেন, তিনি ব্রহ্মণত্ব

হরণ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই পাপে দেহান্তে নরকভোগ করিয়া প্লবঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" তাঁহারা উভয়েই সেই পাপের প্রতিফল ভোগ করিবার সময় একদা উভয়ের মিলনে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন, তখন দুঃখিত মনে উক্ত পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য "সিন্ধুদ্বীপ" নামে এক মুনির নিকট স্ব স্ব পাপ শান্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, মুনিবর ধ্যানাবলম্বনে তাহাদের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, এবং স্মৃত্যুক্ত প্রায়শ্চিত্তবিধান না দেখিয়া তিনি অর্দ্ধোদয় যোগ সময় এই পুণ্যতোয়া বাগবতী নদীতে ভক্তিপূর্ব্বক স্নানসহকারে ভগবান পশুপতিনাথের অর্চনা করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। মুনির নিকট এইরূপ উপদেশ পাইয়া তাহারা উভয়েই হৃষ্টচিত্তে যথাসময়ে এই তীর্থতীরে উপস্থিত হইয়া স্নানপূর্ব্বক ভগবানের দর্শন করিলেন, ইহার ফলে উক্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন।

পশুপতিনাথের মূলমন্দিরের সম্মুখস্থ প্রশস্ত রাস্তার চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত পসারীদিগের দোকান সুসজ্জিত আছে, এদেশের চিহ্নস্বরূপ স্বদেশে আত্মীয়স্বজনগণকে উপহার দিবার জন্য সাধ্যমত সেই সকল দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করিবেন। এদেশের শিল্প একটী উপহার দিবার সামগ্রী। প্রত্যাগমনকালে এখানে পশুপতিনাথের মন্দিরসহ প্রতিমূর্ত্তির পট খরিদ করিবেন।

মহেশ্বর প্রতিষ্ঠিত অবিমুক্তক্ষেত্র যেরূপ গঙ্গাবক্ষে বহু দূরব্যাপী অজস্র বাঁধা ঘাট সকল নির্ম্মিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে শোভা পাইতেছে, এখানেও সেইরূপ শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে বাঁঘমতী নদীর উভয় পার্শ্বে প্রস্তর নির্ম্মিত কত সোপান, কত ঘাট প্রস্তুত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে শোভা পাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কাশীতে যেরূপ বিশ্বেশ্বর ঘাট, দশাশ্বমেধ ঘাট, কেদারঘাট প্রভৃতি ঘাটগুলি প্রসিদ্ধ—এখানেও সেই-

রূপ পশুপতিনাথের ঘাট, গৌরীঘাট, আর্য্যঘাট প্রভৃতি বিস্তর বাঁধা-ঘাট সকল বিখ্যাত।

পশুপতি নামক তীর্থ ঘাটের উপরিভাগ হইতে বাঘমতী নদীর দৃশ্য অতি নয়নানন্দদায়ক। এই স্থানের উভয় পার্শ্বস্থিত অত্যুচ্চ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া চট্টগ্রামের অন্তর্গত সীতাকুণ্ডের মন্দাকিনী যেরূপ পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে নীচে নামিয়া সহস্রধারা হইয়া দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করিতে থাকে—এখানেও সেইরূপ পুণ্যতোয়া বাঘমতী নদী এক উচ্চ পর্ব্বতগাত্র বহিয়া কুলকুলরবে আঁকিয়া-বাঁকিয়া নীচে নামিতেছে, এই মহান্ দৃশ্য যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই মোহিত হইবেন—সন্দেহ নাই। সচরাচর এই নদীর জল অল্প থাকে, অবগত হইলাম—বর্ষাকালে ইহা এক প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে।

বারাণসী যেমন হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ এবং মুক্তিপ্রদ, নেপালীদিগের নিকট পশুপতিনাথও তেমনি মুক্তিপ্রদ। স্থানীয় অধিবাসীরা অন্তিম সময়ে ভগবান পশুপতিনাথের শ্রীচরণে স্থান পাইলে সৌভাগ্য বোধ করিয়া থাকেন। পশুপতিনাথের ঘাটের নির্দ্দিষ্ট এক স্থানে দুইখানি প্রশস্ত শিলা এরূপভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে যে, অন্তিম সময়ে তাহার উপর যাহাকে শয়ন করান যায়, সেই ব্যক্তির পা দুখানি এই ত্রাণকারিণী পুণ্যতোয়া বাঘমতী নদীর জল স্পর্শ করে। এই শিলা দুখানির মধ্যে একখানি রাজপরিবারবর্গের, অপরখানি মন্ত্রী পরিবারদিগের নিমিত্ত স্থাপিত হইয়াছে। বলাবাহুল্য, সাধারণ বা গৃহস্থগণ এই শিলা মধ্যে স্থান পান না। সাধারণ লোকে কেবল এই শ্মশানতীরে বাঘমতীর পবিত্র বারি স্পর্শ এবং মুখে ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

পশুপতিনাথের দর্শন পথ যদিও কষ্টদায়ক, কিন্তু এখানকার কীর্ত্তি-

কলাপ বা ভগবানের ঐশ্বর্য্য এবং মাহাত্ম্য দর্শন করিলে সকল দুঃখের অবসান হইয়া পরিশ্রমের সার্থক বিবেচনা হয়। যে দেব প্রাচীনকাল হইতে এখানে অবস্থিত, মানবগণ সেই দেবের দর্শনে মুক্তিলাভ করিবেন—ইহা আর বিচিত্র কি ?

ভগবান পশুপতিনাথ নরলোকে প্রকাশ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এইরূপ ;—

পশুপতিনাথ—এই পার্ব্বত্যপ্রদেশে চারিযুগেই অবস্থান করিতেছেন। নেপাল ইতিহাস পাঠে জানা যায়, পুরাকালে এই উপত্যকায় বিশাল নাগবাস নামে একটী প্রসিদ্ধ হ্রদ ছিল। কথিত আছে, সত্যযুগে মহাত্মা "বিপাশ্ব বুদ্ধ" বন্দুমতি এখানকার ঐ নাগবাস হ্রদের পশ্চিমে নাগার্জ্জুন নামক উপত্যকায় শিষ্যগণসহ বাস করিতেন, তৎকালে তিনি আশ্রমের অনতিদূরে ঐ বারিপূর্ণ হ্রদমধ্যে একটী পদ্মের মূল রোপণ করেন, ইহার কিছুকাল পর তিনি আপন শিষ্যগণকে তথায় অবস্থান করিতে আদেশ প্রদানপূর্ব্বক আপন গন্তব্য স্থানে গমন করেন। সত্যযুগেই তাঁহার রোপিত সেই পদ্মমূল হইতে শতদল বিকশিত হইল, তন্মধ্যে স্বয়ম্ভুনাথও আবির্ভূত হইলেন।

ত্রেতাযুগে মহাত্মা "বিপাশ্ববুদ্ধ" অনুপম হইতে মর্ত্ত ধাম পর্য্যটন সময় এখানে এই শতদল মধ্যে স্বয়ম্ভুনাথের জ্যোতি দর্শন করিলে তিনি ভক্তিপূর্ব্বক লক্ষ বিল্বপত্র দ্বারা ঐ জ্যোতি উদ্দেশে অঞ্জলি প্রদান করতঃ আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই নিদর্শন এখানে বর্ত্তমান থাকিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইহার কিছুদিন পর "মঞ্জুশ্রী বুদ্ধ" চীনদেশ হইতে এই

পার্ব্বত্যপ্রদেশে আসিলে স্থানীয় শতদল মধ্যে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি দর্শন করেন এবং দিব্যজ্ঞানে এখানে ভগবান স্বয়ম্ভুনাথের অবস্থান বিষয় জানিতে পারিয়া ফাটওয়ার নামক স্থানে স্বীয় করস্থিত মূল অস্ত্র দ্বারা ছিন্ন করিয়া ঐ হ্রদের সমস্ত জল বাহির করিয়া দেন, তৎকালে সেই স্রোতের সহিত হ্রদস্থিত যাবতীয় নাগগণ বাহির হইলে "নাগরাজ" মহাত্মা মাঞ্জুশ্রীর নিকট যুক্তকরে তাঁহাদের অবস্থানের স্থান নির্দ্দেশ করিতে অনুরোধ করেন, তখন মহাত্মা মাঞ্জুশ্রী সদয় হইয়া তাঁহাকে টাউদা নামক জলাশয়ে আশ্রয় লইতে আদেশ করিলেন। এইরূপে হ্রদস্থিত সমস্ত জল নিঃশেষ হইলে মাঞ্জুশ্রী এই স্থানে বিস্তর ধনসম্পত্তি দেখিতে পাইলেন, তখন তিনিই ঐ সকল অতুল ধনরত্নের অধীশ্বর হইলেন। একদা তিনি এখানে বিশ্বরূপের মধ্যে স্বয়ম্ভূজ্যোতি তাহার ভিতর গুহ্যেশ্বরীকে পর্য্যন্ত দর্শন করিয়া ভক্তিসহকারে ঐ পদ্মস্থিত জ্যোতিমূর্ত্তিকে পূজার্চ্চনা করিলেন।

মহাত্মা মাঞ্জুশ্রী এই উপত্যকার হ্রদমধ্যে যে সমস্ত ধনসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ঐ সমস্ত সম্পত্তির সাহায্যে এখানে মনুষ্যগণের বাসোপযুক্ত নিজের নামানুসারে মঞ্জুপাটন নামক এক সহর স্থাপিত করেন, এতদ্ভিন্ন ঐ সহরের স্থানে স্থানে বৌদ্ধ-ভিক্ষুদিগেরও বিহার স্থান নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। এইরূপে তিনি মনের সুখে তথায় কিছুদিন অবস্থানপূর্ব্বক একদা ধর্ম্মকর নামক এক শিষ্যকে এই নবপ্রতিষ্ঠিত সহরের রাজারূপে অভিষেক করিয়া তিনি আপন গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মকর গুরুর কৃপায় এই সহরের রাজা হইয়া অপরাপর ভিক্ষুদিগের সহিত যুক্তিপূর্ব্বক জ্যোতিরূপী স্বয়ম্ভুনাথের নির্দ্দিষ্ট স্থানের সন্নিকটে ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে মঞ্জুশ্রীর এক পবিত্র মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক যথানিয়মে গুরুজীউর পূজার্চ্চনার বন্দোবস্ত

করিলেন। নেপালে মাঞ্জুশ্রীর এরূপ অনেক মন্দির বর্ত্তমান থাকিয়া সেই মহাত্মার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। অনেক স্থলে বিপাশ্ব বুদ্ধ বন্দুমতির এবং মাঞ্জুশ্রীর মন্দিরে তাঁহাদের চরণ-চিহ্ন অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই উভয় বুদ্ধের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে পার্থক্যের মধ্যে মহাত্মা বিপাশ্ব বুদ্ধের চরণে চক্র ও মাঞ্জুশ্রীর চরণে চক্ষু চিহ্ন দর্শন পাওয়া যায়। এই নেপাল সহরে অদ্যাপি যেরূপ অসংখ্য বৌদ্ধ কীর্ত্তি আছে, বর্ত্তমান-কালে ভারতের অপর কোন স্থানে সেরূপ আছে বলিয়া ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না।

কথিত আছে, ত্রেতাযুগে "বুদ্ধ করকচাঁদ" এই পার্ব্বত্যপ্রদেশে স্বয়ম্ভুজ্যোতির মধ্যে জগজ্জননী গুহ্যেশ্বরীদেবীর দর্শন পান, তখন তিনি আনন্দিত মনে এই সহরে অন্যূন ৭০০ ব্রাহ্মণ জাতীয় ব্যক্তিদিগকে ভিক্ষুব্রতে দীক্ষা প্রদান করেন। এই সকল ভিক্ষু ব্রাহ্মণদিগের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তিনি স্থানীয় প্রশস্ত উপত্যকাভূমির নানা স্থান পাতি পাতি পরিভ্রমণ করিয়াও কুত্রাপি জলের সন্ধান করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া গিরিস্থিত এক পর্ব্বতগাত্রে হস্ত স্পর্শ করিবা-মাত্র ঐ মহাত্মার মানসে এক ক্ষীণকায় নদীর সৃষ্টি হইয়া স্রোতস্বিনী হইয়া প্রবাহিতা হইতে লাগিল, যে নদীর সৃষ্টি হইল—তিনিই বাঘমতী নামে জনসমাজে প্রসিদ্ধ হইলেন। তদ্দর্শনে করকচাঁদ বুদ্ধ তাঁহার অধীনস্থ ৭০০ শত ব্রাহ্মণ ভিক্ষুদিগের যাবতীয় কেশরাশি সংগ্রহপূর্ব্বক শূন্যমার্গে ছড়াইয়া দিলেন, ইহার ফলে এখানে কেশমতী নামে আবার একটী নদী সৃষ্ট হইল। এইরূপে উভয় নদীর সৃষ্টি করিয়া তিনি তপস্যায় রত হইলেন।

ভারত পাঠে জানা যায়—দ্বাপরযুগে মহামুনি কনক এই উপত্যকা-ভূমে উপস্থিত হইয়া মনের সুখে স্বয়ম্ভু ও গুহ্যেশ্বরীদেবীর পূজার্চ্চনা

করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করেন, এই ঘটনার কিছুকাল পর "কাশ্যপ-বুদ্ধ" বারাণসী হইতে এই পার্ব্বত্যপ্রদেশে আগমন করিয়া স্বয়ম্ভুজ্যোতি ও গুহেশ্বরীর প্রতি ভক্ত্য করেন। তৎপরে এই কাশ্যপই একদা গৌড় নগরে পদার্পণপূর্ব্বক তৎকালীন স্থানীয় প্রচণ্ডদেব নামক নরপতিকে স্বয়ম্ভু ও গুহেশ্বরীদেবীর অবস্থানের বিষয় জ্ঞাপন করেন, এবং তাঁহাকে এই উভয় দেবদেবীর পূজার্চ্চনা করিতে উপদেশ দেন। মহাত্মা প্রচণ্ডদেব কাশ্যপের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া "শান্তশ্রীনাথ" নাম ধারণ করতঃ এই পার্ব্বত্যপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক এখানে স্বয়ম্ভুজ্যোতি মধ্যে এই উভয় দেবদেবীর সন্ধান করিলেন, এবং মনের সুখে তাঁহাদের পূজার্চ্চনাসহকারে কাশ্যপের আদেশ পালন করিলেন। ইহাতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ভগবান এখানে অতীত তিনযুগই স্বয়ম্ভুজ্যোতিরূপে গুহেশ্বরীদেবীসহ অবস্থান করিয়া ভক্তদিগের পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন, শেষ কলিযুগ সন্নিকট জানিয়া মহাত্মা শান্তশ্রীনাথ এই স্বয়ম্ভুজ্যোতিটীকে আচ্ছাদন করিয়া তদুপরি এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন, কালে ঐ স্বয়ম্ভু মন্দিরটী সংস্কার অভাবে ধূলিসাৎ হয়, তৎসঙ্গে এই জ্যোতিও সেই ভগ্নাবশেষ মন্দিরের ভিতর প্রোথিত হয়।

কলির প্রারম্ভে এখানে এক আহিরীর একটী সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা গাভী নিত্য একই সময়ে এই ভগ্ন মন্দির স্থানে আসিয়া মনের সাধে দুই পা প্রসারণ করিয়া তাহার দুগ্ধধারা সেচন করিত। গোপালক তাহার গাভীটী নিত্য একই সময় গোয়াল ঘর হইতে বহির্গত হইয়া কোথায় যায়, এই রহস্য ভেদ করিবার মানসে পর দিবস নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া গাভীর পশ্চাদ্গামী হইলে যাহা দর্শন করিল, তাহাতেই তাহাকে চমৎকৃত হইতে হইল। তখন সে কৌতূহল পরবশ হইয়া

মায়ামমের ইচ্ছায় ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থান খনন করিতে আরম্ভ করিলে সহসা স্বয়ম্ভুজ্যোতি ধরায় প্রকাশিত হইল। সেই জ্যোতি প্রভাবে গোপালক তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইল। এই গোপালকের এক পুত্র ব্যতীত ইহ-সংসারে আর কেহই আপনার বলিতে ছিল না।

নীমুনি নামে এক মহাত্মা এই সময় এখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি এই ভস্মীভূত গোপালকের পুত্রের সন্ধান পাইয়া আপন প্রতিভাবলে তাহাকেই এখানকার রাজা করিলেন। এই গোপালকের পুত্র এখানে যে রাজ্য স্থাপন করিলেন, সেই রাজ্য মহাত্মা নীমুনির নামানুসারে নেপাল নামে প্রসিদ্ধ হইল। নেপাল—অর্থাৎ দেবতার আশ্রিত প্রদেশ; কথিত আছে, এই আহীর পুত্রের রাজত্বকালে মহাত্মা নীমুনির উপদেশ মত ঐ ভগ্ন স্তূপাকৃতি মন্দিরটীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, তদবধি এই স্বয়ম্ভুজ্যোতি এখানে পশুপতিনাথ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

বৌদ্ধ সম্রাট অশোক নেপালের পরিচয় পাইয়া সপরিবারে এখানে আগমন করেন, তাঁহার অবস্থানকালে নেপাল সহরে ললিতপাটন আদিবুদ্ধ প্রভৃতি নামে অনেকগুলি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সকল প্রাচীন দেবালয়গুলি অদ্যাপি বর্ত্তমান রাজধানী কাটামুণ্ড সহরে সগর্ব্বে অবস্থান করিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কথিত আছে, ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে মহাত্মা শঙ্করা-চার্য্যের আবির্ভাব হয়। সেই মহাত্মার প্রভাবে এখানে এই বৌদ্ধ ধর্ম্মকে লুপ্তপ্রায় করিলেন, তৎসঙ্গে বৌদ্ধ স্মৃতিও অন্তর্হিত হইয়াছিল। এই মহা সঙ্কটময় সময় ঐ সকল বৌদ্ধ দেবালয়গুলি অধিকাংশই হিন্দু-দিগের দ্বারা মহাদেবের মন্দিরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

নেপাল সহরে পুরাকাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত যতগুলি নর-পতি রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই ভগবান পশুপতি-

নাথের নামে উৎসর্গ করিয়া দেবস্থানের কিছু-না-কিছু শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। প্রমাণস্বরূপ দেখুন, নেপালরাজ "সদাশিবদেব" তাঁহার রাজত্বকালে এই পশুপতিনাথের মন্দিরের ছাদটী স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপিত করেন সুপ্রসিদ্ধ রাজমন্ত্রী ভীমসেন থাপা এই মন্দির প্রাঙ্গণে একটী প্রকাণ্ড স্বর্ণমণ্ডিত নন্দী মূর্ত্তি (বৃষ) স্থাপিত করেন। কেহ বা ধর্ম্মশালাটী নির্ম্মাণ করেন। এইরূপ এখানকার রাজবংশের মধ্যে সকলেই এই দেবস্থানে একটী-না-একটী ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ চিহ্ন স্থাপিত করেন। এইরূপে এই প্রাচীন বিখ্যাত দেবালয়ে যে কত স্বর্ণময় বৃষ এবং শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহা গণনা করা অসাধ্য। পূর্ব্বে কাশী কিম্বা ভুবনেশ্বরে যেরূপ শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়াছিলাম, এই পার্ব্বত্য নেপালপ্রদেশেও তদাপেক্ষা বেশী লিঙ্গমূর্ত্তি দর্শন করিয়া এই স্থানকেই যথার্থ কৈলাশপুরী বলিয়া অনুমান করিলাম।

ভগবান পশুপতিনাথের মন্দিরে যেরূপ স্বর্ণ বা রৌপ্যের প্রাচুর্য্য দর্শন পাওয়া যায়, ভারতবর্ষ মধ্যে অন্য কোন হিন্দু তীর্থ স্থানে আর এরূপ নয়নগোচর হয় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ভারতবর্ষ মধ্যে যেখানে যত হিন্দু তীর্থ স্থান আছে, ঐ সকল প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থানে মুসলমানদিগের অত্যাচারে হতশ্রী হইয়াছে, কেন না ঐ সকল দেবসম্পত্তি যবনদিগের দ্বারা বারম্বার অপহৃত হওয়াতে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে ; কিন্তু পশুপতিনাথের এমনি মাহাত্ম্য যে, দিগ্বিজয়ী বিধর্ম্মী যবনগণ বারম্বার নেপালপ্রদেশে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াও ভগবানের মাহাত্ম্যগুণে কোনরূপে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং পশুপতিনাথের প্রভূত ঐশ্বর্য্য এইরূপে সহস্র সহস্র বৎসর হইতে পুঞ্জীকৃত হওয়াতেই স্বর্ণ রৌপ্যের প্রাচুর্য্য হইয়াছে। এই লিঙ্গরাজের মূলদেশ স্ফটিক নির্ম্মাণ, মধ্যভাগ নহালান, উর্দ্ধদেশ মাণিক্যাভ

সুদৃশ্যরূপে দর্শন পাওয়া যায়। কথিত আছে, হর হরি সতত একাত্মা হইয়া এখানে অবস্থান করিতেছেন; যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক এই লিঙ্গ-রূপী সাক্ষাৎ শঙ্কর মূর্ত্তির দর্শন, স্পর্শন বা অর্চ্চনা করিবেন, অন্তে তিনি অব্যর্থ নিষ্পাপ হৃদয়ে বৈকুণ্ঠে বা গোলকে স্থানপ্রাপ্ত হইবেন।

এ তীর্থে সুফলের ব্যবস্থা আছে। সুখের বিষয় এখানে কোন পাণ্ডা কোন যাত্রীর নিকট জুলুম করিয়া টাকা আদায় করেন না। যাত্রীরা তীর্থগুরু পাণ্ডাদের যত্নে সন্তুষ্ট হইয়া সুফলের প্রণামীস্বরূপ যাহা প্রদান করেন, তাঁহারা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। বলা-বাহুল্য, ১৲ টাকার কমে সুফলের প্রণামী নাই। এইরূপে নেপাল-সহরের শোভা এবং দেবতাদিগের দর্শন, স্পর্শন ও মন্দির সৌন্দর্য্য নয়নগোচর করিয়া মনের সুখে এবার সহর হইতে একখানি ঝাম্পান ৮৷৷৹ টাকা ভাড়া ধার্য্য করিয়া নীমগিরি পর্ব্বতশ্রেণীর মূল দেশস্থিত ভীমপেদী নামক স্থানে নির্ব্বিঘ্নে সুস্থ শরীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তথা হইতে যে খাটোলীর বন্দোবস্ত ছিল, তাহারই সাহায্যে রক্সোলে আসিয়া রেলযোগে বহুদিনের পর স্বদেশে স্বজনগণের সহিত মিলিত হইয়া ভগবান পশুপতিনাথের কৃপায় সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলাম।

প্রভাস তীর্থ

সহর কলিকাতা হইতে প্রভাস তীর্থ দর্শনেচ্ছুক যাত্রীদিগকে রেল-যোগে প্রথমে বোম্বে, তথা হইতে বোম্বাই-বরদা-মধ্যভারত রেলের কোলাবা-মো'রন লাইন—চর্চ্চগেট অথবা গ্রাণ্ড রোড নামক ষ্টেশনে রেলগাড়ীতে আরোহণ করিতে হয়। এই লাইনে যাত্রীদিগকে বরাবর গুজরাট প্রদেশের বিরম-জামনগর নামক ভিন্ন ছোট রেলের সাহায্যে কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের উধাওয়াল, জটলেশ্বর জংশন হইয়া ভেরোয়াল বন্দরে পৌছিতে হয়। এই ভেলোর হইতে প্রভাস-মাত্র তিন মাইল দূরে অবস্থিত। বোম্বাই হইতে জটলেশ্বর ৫৩৭ মাইল, জটলেশ্বর হইতে ভেলোর অনূ্ন ৬৭ মাইল, আবার ভেলোর হইতে পবিত্র স্থান "প্রভাস-ক্ষেত্র" তিন মাইল দূরে অবস্থিত। অর্থাৎ কলিকাতা হইতে বোম্বে ১২২৩ মাইল, তথা হইতে ৬০৭ মাইল দূরে এই তীর্থ স্থানটীর দর্শন পাওয়া যায়।

যে সকল যাত্রী প্রভাস তীর্থের সেবা করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে বোম্বাইএর চর্চ্চগেট অথবা গ্রাণ্ড রোড নামক ষ্টেশন হইতে একেবারে ভেলোরের টিকিট খরিদ করাই শ্রেয়ঃ, মধ্যে কেবল

দুইবার ট্রেণ বদল করিতে হয়, নতুবা পৃথক্ পৃথক্ ষ্টেসনে টিকিট খরিদ এক বিড়ম্বনাভোগ মাত্র।

শারদীয় অবকাশে বন্ধুবান্ধব সকলে এক স্থানে একত্রিত হইয়া এবার কোন্ তীর্থের সেবা করিতে অগ্রসর হইব, এইরূপ পরামর্শ হইতেছে, এমন সময় আর একজন অবসর প্রাপ্ত প্রাচীন বন্ধু আমাদের দলে মিলিত হইলেন। তিনি কর্ম্মোপলক্ষে বহু কালাবধি বোম্বে সহরে অবস্থান করিয়া ঐ অঞ্চলের অনেক তীর্থ স্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন। এই নবাগত বন্ধু আমাদিগকে তীর্থ যাত্রায় প্রস্তুত দেখিয়া এবং আমাদিগের মধ্যে কাহারও প্রভাস তীর্থ দর্শন হয় নাই অবগত হইয়া, এবার এই প্রভাস তীর্থের সেবা করিতে অনুরোধ করিলেন, অধিকন্তু তিনিও আমাদের সহযাত্রী হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। এতাবৎকাল সঙ্গী অভাবে আমাদের এই অপরিচিত দুর্গম প্রভাস তীর্থ স্থান দর্শন হয় নাই, সুতরাং ভগবানের কৃপায় সুযোগ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলাম।

দশমীর সম্মীলনের পর ত্রয়োদশীর শুভলগ্নে তীর্থ যাত্রার দিন স্থির হইল। প্রভাস পথে প্রথমে জব্বলপুরে নর্ম্মদায় স্নান, তর্পণ সমাপনান্তে যাহাতে তথায় উপস্থিত হওয়া যায়, তাহারই ব্যবস্থা হইল। আমরা সকলে ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনের অপরাহ্নকালে সংসার-মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক যথানিয়মে ঘট স্থাপন এবং গুরুজনবর্গের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করতঃ, ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া, শুভলগ্নে গ্র্যাণ্ডকর্ড লাইন দিয়া যে মেল যায়, তাহারই উদ্দেশে শুভযাত্রা করিলাম।

হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর উপদেশ মত জব্বলপুরের টিকিট খরিদ করিলাম, কারণ পুণ্যতোয়া নর্ম্মদার জলপ্রপাত, মর্ম্মরপর্ব্বত শোভা এবং পিতৃগণের উদ্দেশে ইহাতে স্নান, তর্পণ করিতে

হইলে যাত্রীদিগকে প্রথমে জব্বলপুরে যাইতে হয়, তথা হইতে টাঙ্গার সাহায্যে অন্যূন সাত ক্রোশ পথ অতিক্রমপূর্ব্বক নর্ম্মদার তীরে পৌঁছিতে হয়।

আমরা সদলে ট্রেণে আরোহণ করিলে যথাসময়ে ষ্টেশনে ঘণ্টা বাজিল, গার্ড সাহেবের নীল লণ্ঠন দুলিল, তৎসঙ্গে এঞ্জিন হইতে বংশী-ধ্বনি হইয়া ধূমোদ্গিরণ করিতে করিতে ট্রেণখানি ধীরে ধীরে প্লাটফরম হইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। বলাবাহুল্য, আমরা ঐ সঙ্গে মনে মনে সেই দুর্গতিহারিণী জগজ্জননী ত্রিশক্তিরূপিণী দুর্গার নাম জপ করিতে করিতে, আপনাপন স্থানে শয্যা পাতিয়া শয়ন করিলাম। সমস্ত রাত্রি ট্রেণখানি দ্রুত গমন করিয়া যখন পর দিন প্রাতে মোগলসরাই নামক প্রধান ষ্টেশনে যাত্রীদিগের টিকিট চেক্ হইতেছিল, তখন আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। এই স্থানে ট্রেণে বসিয়াই মনে মনে পুণ্যময়ী বারাণসীক্ষেত্রের বিশ্বেশ্বর, বিষ্ণু ও অন্নপূর্ণাদেবীর শ্রীচরণ ধ্যানপূর্ব্বক প্রণিপাত করিলাম। তৎপরে চুনার নামক ষ্টেশনে ট্রেণখানি উপস্থিত হইবামাত্র সঙ্গী বন্ধুটী বলিলেন, "ভাই সকল—একবার শৃঙ্গবের রাজ্য স্থান দেখিয়া লও, কারণ এই স্থানই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মিত্র সেই গুহক চণ্ডালের আবাসপুরী।" বন্ধুর বাক্যে আমার রামায়ণের পুণ্য কথা মনে হইল যে, পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীরামরূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়া লোকহিতার্থে পিতৃসত্যপালন করিবার সময়, অনুজ লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী-সহ এই স্থানে গঙ্গাপার হইয়া প্রয়াগ তীর্থে গমনপূর্ব্বক ভরদ্বাজাশ্রমে প্রয়াণ এবং তথা হইতে দণ্ডকারণ্যাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, ক্রমে চলন্ত ট্রেণখানি বিন্ধ্যাচল পার হইল, তখন ষ্টেশনের উপর গাড়ীতে বসিয়াই ইহার অনতিদূরে বিন্ধ্যা পর্ব্বতোপরি ঠগীদিগের প্রতিষ্ঠিত, যোগমায়ার মন্দির দর্শনান্তে দেবী উদ্দেশে প্রণিপাত করি-

লাম। তাহার পর চৌক নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে বন্ধুবর আবার বলিলেন, "ভায়া! এই স্থানটী স্মরণ রাখিবেন, বর্ত্তমানকালে গ্রাণ্ড কর্ড লাইন প্রস্তুত হওয়াতে যাত্রীদিগের কত সুবিধা হইয়াছে, নচেৎ পূর্ব্বে বোম্বাই মেল এলাহাবাদ ষ্টেশনের ভিতর দিয়া নইনি নামক স্থানের মধ্য ভেদ করিয়া জব্বলপুরাভিমুখে যাইত, ইহাতে কত সময় নষ্ট হইত একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি—এক্ষণে এই চৌকি নামক স্থান হইতেই জব্বলপুর লাইনের সূত্রপাত হইয়াছে।"

ট্রেণখানি এইরূপে ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পার হইয়া যখন সুতনা নামক ষ্টেশনে পৌঁছিল, তখন সঙ্গী বন্ধুটী আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি চিত্রকূট পর্ব্বতের শোভা দর্শন করিতে অভিলাষ করেন? তাহা হইলে আমায় বলুন, এই ষ্টেশন হইতে ঐ পবিত্র স্থান অল্পমাত্র দূরে অবস্থিত। যে চিত্রকূট পর্ব্বতে মহর্ষি ভরদ্বাজাশ্রমে পরব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে সদলে অবস্থান করিয়াছিলেন, যথায় রাম অনুগত "শ্রীভরত" পিতৃরাজ্যে পদার্পণ করিয়া পূজনীয় শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস বিষয় শ্রবণে মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনাপূর্ব্বক ভ্রাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠতা দেখাইয়া জগৎবাসীকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, যে আশ্রমে অল্পদিনের জন্য চারি ভ্রাতায় একত্রে শুভ মিলন হইয়াছিল, যথায় ঋষির কৃপায় সকলেই আনন্দস্রোতে নিমগ্ন ছিলেন, যে চিত্রকূটে শ্রীভরত তাঁহার অনুরোধ ব্যর্থ হইল দেখিয়া মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞা শিরোধার্য্যপূর্ব্বক কেবল তাঁহার পাদুকা লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ ঐ পাদুকা স্থাপন এবং ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া সন্তাপিত হৃদয়কে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, আপনাদের মধ্যে যদি কাহারও ঐ পবিত্র স্থান দর্শন করিতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে এই ষ্টেশনে অবতরণ করুন।" তাঁহার সেই উত্তেজিত বাক্যে আমার ঐ

স্থান দর্শনের একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু অপরাপর বন্ধু সকলের মত না হওয়াতে অগত্যা বাধ্য হইয়া এ আশা পরিত্যাগ করিতে হইল।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, এই সুতনা হইতে কাটান সীমা পর্য্যন্ত মধ্যভারত নামে প্রসিদ্ধ। মধ্যভারতে এই সুতনা নামক রেল লাইনের পার্শ্ববর্ত্তী উভয় ধারেই পাথর, চুণের কল ও নানাবিধ কারখানা স্থাপিত আছে। যতগুলি কারখানা এখানে আছে, তন্মধ্যে কলিকাতার প্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্টর মিঃ বারণ কোম্পানীর কারখানাটীই বিখ্যাত।

এখানে বিভিন্ন কৃষিক্ষেত্রে যে সকল আবাদ আছে, তাহাতে গাজোর, ছোলা, লঙ্কা, বাজুরা, গম, পেঁয়াজ, অরহর প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ট্রেণ হইতে লাইনের আশে-পাশে যে সকল উদ্যান দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাতে কদলি, আতা, আম্র ও পেয়ারা বৃক্ষই অধিক পরিমাণে নয়ন পথে পতিত হয়। এইরূপে ক্রমাগত ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পার হইয়া যথাসময়ে ট্রেণখানা জব্বলপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে, আমরা সদলে সাবধানের সাহত তথায় অবতরণ করিলাম।

জব্বলপুর একটী বিখ্যাত সহর। হাওড়া হইতে গ্রাণ্ড কর্ড লাইন দিয়া এই বিখ্যাত ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইতে ৭৩৩ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হয়। ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া এখানে কোথায় কিরূপ বাসা সংগ্রহ করিব এরূপ আন্দোলন করিতেছি, এমন সময়ে সঙ্গী বন্ধুটী বলিলেন, "সে বিষয় আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, কারণ আমি পূর্ব্বাহ্ণে এখানকার একটী বন্ধুকে আমাদের আগমনের বিষয় পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিয়াছি, এখান হইতে আমাদিগকে প্রথমে তাঁহারই বাঙ্গালাতে যাইতে হইবে।" আমাদিগকে তিনি এইরূপে আশ্বাসিত করিয়া ষ্টেশনের বাহিরে দুইখানি টাঙ্গা গাড়ী সিবিল অঞ্চলে যাইবার জন্য ভাড়া করিলেন।

জব্বলপুর সহরটী বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন, এখানকার রাস্তা-ঘাটে ধূলা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পথের দুই পার্শ্বে সারি সারি বৃক্ষ সকল দণ্ডায়মান থাকিয়া পরিশ্রান্ত পথিকদিগকে রৌদ্রের তাপ হইতে রক্ষা করিতেছে। সঙ্গী বন্ধুর নিকট উপদেশ পাইলাম, এখানে তার বিভাগের বড় আফিস, সদর কাছারী, কমিশনার, ডেপুটী কমিশনার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইঞ্জিনীয়ার-আফিস প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকায় সহরটী সরগরম অবস্থায় আছে; এতদ্ভিন্ন ইহা ইংরাজ সেনার একটী প্রধান আড্ডা, সুতরাং অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্য এখানে বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। জব্বলপুরের লোক সংখ্যা অন্যূন নব্বুই হাজার।

সহর কালিকাতায় যেরূপ টম্‌টম্, ফেটিং, পাল্কী গাড়ী প্রভৃতি ভাড়া পাওয়া যায়, এখানে তাহার পরিবর্ত্তে কেবল টাঙ্গা গাড়ী দেখিলাম। এই সকল টাঙ্গা গাড়ীগুলিতে ছত্রী আছে, দেখিতেও সুদৃশ্য; গাড়ীর মধ্যে বসিবার জন্য গদী পাতা থাকে। প্রত্যেক টাঙ্গায় স্থানীয় নিয়মানুসারে তিনজন আরোহী গমনাগমন করিতে পারেন, টাঙ্গাগুলির পরিচয় দিতে হইলে পশ্চিমদেশীয় একার সহিত তুলনা করিতে হয়। এইরূপ দুইখানি টাঙ্গায় আরোহণ করিয়া এই সহরের বিষয় নানারূপ গল্প করিতে করিতে সকলে রাজপথের উপর দিয়া নির্দ্দিষ্ট বাঙ্গালায় উপস্থিত হইবার সময়, পথিমধ্যে বিস্তর উদ্যানবাটী দেখিলাম। এই সকল উদ্যানবাটীগুলি কাহাদের জিজ্ঞাসা করাতে বন্ধু উত্তর করিলেন, এই যে সকল উদ্যানবাটী আপনারা দেখিতেছেন, এগুলি এক-একটী বাঙ্গালা নামে খ্যাত। প্রত্যেক বাঙ্গালাতে স্থানীয় এক-একজন উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী অবস্থান করেন, আর এই স্থানটীই সিভিল অঞ্চল নামে প্রসিদ্ধ। আমাদিগকেও এখানে অবস্থান করিবার জন্য এইরূপ

একটী বাঙ্গালাতে থাকিতে হইবে।" পথিমধ্যে একখানি সুন্দর বাটী নির্দ্দেশ করিয়া তিনি আবার বলিলেন—সম্মুখে যে সুন্দর সুদৃশ্য বাটী দেখিতেছেন, উহাতে মধ্যভারতের দেশীয় রাজসন্তানগণ পাঠাভ্যাস করেন, কিন্তু সাধারণ ছাত্রদিগের বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত এখানে দুইটী স্কুলও প্রতিষ্ঠিত আছে। এইরূপে সহরের শোভা দর্শন করিতে করিতে যথানিয়মে নির্দ্দিষ্ট বাঙ্গালাতে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে একটী কথা বলিবার আছে, সহর কলিকাতায় যে সকল গাড়োয়ান ভাড়াটিয়া গাড়ী চালায়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের স্বভাব উদ্ধত। এখানকার গাড়োয়ানগুলি যদিও নীচ জাতীয়, তথাপি তাহাদের ব্যবহার দেখিলে শান্ত প্রকৃতির লোক বলিয়া অনুমান হয়; কারণ আমরা ষ্টেশন হইতে সিভিল অঞ্চলে যাইবার জন্য যে টাঙ্গা ভাড়া করিয়াছিলাম, তাহাতে কোথায় কোন্ স্থানে যাইব—তাহার কোন স্থিরতা ছিল না, কেবল সিভিল অঞ্চলে যাইবার ভাড়া হইয়াছিল মাত্র, কিন্তু টাঙ্গা চালকেরা এই অঞ্চলে আসিয়া পাতি পাতি সন্ধান করিয়া আমাদের নির্দ্দিষ্ট বাসায় পৌঁছিয়া দিয়া যে কত উপকার করিয়াছিল, উহা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, ইহার নিমিত্ত তাহারা কোনরূপ বক্‌সিস বা বেশী ভাড়া জন্য দাবী করিল না, এই কারণে তাহাদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া উহাদিগকে শান্ত প্রকৃতির লোক বলিয়া উল্লেখ করিলাম।

পূর্ব্বে এখানে কেবল টাঙ্গা গাড়ী দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল যে, এ সহরে ল্যাণ্ডো বা অপর কোনরূপ গাড়ী নাই, কিন্তু পথিমধ্যে যাত্রাকালীন বিস্তর নানা ধরণের কুটিয়াল গাড়ী দেখিতে পাইয়া সে ধারণা পরিবর্ত্তন করিতে হইল। সে যাহা হউক, এবার বন্ধুর সহিত যে বাঙ্গালাতে উপস্থিত হইলাম, তথায় কথিত বন্ধু আমাদিগকে পাইয়া

যেন গুরুর ন্যায় যত্ন করিতে লাগিলেন। লোকটী স্থানীয় সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী। আমরা অপরিচিত হইলেও তিনি আমাদের সহিত যেরূপভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহাকে সদালাপি ও অমায়িক বলিয়া জানিতে পারিলাম। বলাবাহুল্য, এখানে অবস্থান-কালে তাঁহার যত্নে আমরা সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

পর দিবস প্রাতে বাসাবাটীতে পুণ্যসলিলা নর্ম্মদার তীরে স্নান, তর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম; তদ্দর্শনে স্থানীয় আশ্রয়দাতা আমাদিগকে উপদেশ দিলেন, আগামী কল্য যে স্থানে আপনারা যাই-বেন, তথা হইতে যদ্যপি স্থানীয় দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন করিয়া প্রত্যা-বর্ত্তন করেন, তাহা হইলে আপনাদের বাসায় প্রত্যাগমন করিতে অপরাহ্নকাল উপস্থিত হইবে। অতএব সাধ্যমত এ সহর হইতে কিছু আহারীয় সামগ্রী মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য সংগ্রহ করিয়া লইবেন, কারণ তীর্থতীরে বা নিকটবর্ত্তী স্থানে যে সকল খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যায়, উহা আপনাদের খাইতে রুচি হইবে না; তাঁহার নিকট এইরূপ উপদেশ পাইয়া, আমরা অবসর মত একবার সদলে সহরের শো সৌন্দর্য্য দর্শন, এবং কিছু আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিবার অভিলাষে বাজারের দিকে অগ্রসর হইলাম। বাজারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ফলের মধ্যে আতা, পেয়ারা, কদলী ভিন্ন অপর কোন কিছু নাই, কিন্তু এই সকল ফলগুলি তাজা এবং বৃহদাকার, মূল্যও সুলভ। বলাবাহুল্য, এই সকল ফলগুলি দেখিয়া এখানকার উর্ব্বরাশক্তির পরিচয় পাইলাম, এবং এ স্থানটী যে স্বাস্থ্যকর, উহা আমাদের বুঝিতে বাকি রহিল না। তৎপরে ফলের বাজার হইতে বহির্গত হইয়া মিষ্টান্নের দোকানের দিকে অগ্রসর হইলাম। তথায় উপস্থিত হইয়াই সকলকে গোলকধাঁধায় পড়িতে হইল; কেন না এখানে যে সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় হয়, তাহার অধিকাংশই

কাঁচি ওজন। এই কাঁচি ওজন আবার নানা প্রকারে পরিণত, অর্থাৎ কোন দ্রব্য ৪০ তোলা ওজনের সের, কোন দ্রব্য ২৭ তোলা ওজনের সের, আবার কোন কোন দ্রব্যের ৮০ তোলা সেরেও খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে। এই সকল বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া দ্রব্য সামগ্রী কিরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিয়া উহা খরিদ করিতে হয়; সে যাহা হউক, এই সকল দোকান হইতে কিছু কিছু আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া বাসাবাটী "বাঙ্গালা"তে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, নর্ম্মদাতীরে যাতায়াত এবং স্থানীয় দ্রষ্টব্য স্থানগুলির শোভা দেখিবার জন্য আশ্রয়দাতা আমাদেরই নিমিত্ত কষ্ট স্বীকার করিয়া দুইখানি টাঙ্গা ৪৷৷০ টাকা হিসাবে ভাড়া চুক্তি করিলেন।

পর দিবস প্রত্যুষে আবশ্যকীয় দ্রব্য সমভিব্যাহারে সদলে উক্ত দুইখানি টোঙ্গায় আরোহণ করিয়া মনের সুখে নর্ম্মদার দিকে যাত্রা করিলাম। এই বাঙ্গালা হইতে বহির্গত হইয়া বহু দূরে পল্লীর প্রান্তভাগে একটী প্রশস্ত ময়দান পাইলাম, ঐ ময়দানে গোলন্দাজ গোরা সৈনিকেরা কিরূপে গোলা ছোড়া অভ্যাস করে, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া লইলাম। ক্রমে টাঙ্গা এই মাঠ পার হইয়া এমন এক পথে উপস্থিত হইল, যথায় পথটী সরলভাবে প্রসারিত হইয়াছে, উহার উভয় পার্শ্বে বিস্তর অশ্বত্থ, ঝাউ আম্র ও সেগুন বৃক্ষগুলি দণ্ডায়মান থাকিয়া যেন আমাদিগকে নর্ম্মদা যাইবার জন্য পথ দেখাইতেছে। এই প্রশস্ত পথের ধারে ধারে কতকগুলি জলাশয়, ঐ সকল জলাশয়ে গরীব পল্লীবাসীরা দলে দলে অবতরণ করিয়া মনের আনন্দে পাণিফল সংগ্রহ করিতেছে। এই স্থানের সন্নিকটে আবার অনন্ত ছোট বড় পর্ব্বতমালা আপন আপন শোভা বিস্তার করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা প্রকাশ করিতেছে। এই পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া টাঙ্গা দুইখানি এবার এরূপ এক কাঁচা

পথে উপস্থিত হইল, তথায় কেবল ছোট ছোট মৃত্তিকা স্তূপে পরিপূর্ণ, ঐ সকল স্তূপ হইতে আবার কোন কোনটী যেন পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ। সেই উচ্চ স্তূপ বহু কষ্টে ও বহু ব্যয়সহকারে সরকার হইতে কাটান হইয়া, যাত্রীদিগের গমনাগমনের সুবিধার নিমিত্ত পথ প্রস্তুত হইয়াছে। টাঙ্গা-ওলারা ঐ বিভক্ত পথের উপর দিয়া আমাদিগকে লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। স্থানটী অতি নির্জ্জন অর্থাৎ এই বিভক্ত পথের উপরিভাগে নানা জাতীয় লতাগুল্মাদি বর্ত্তমান থাকিয়া স্থানে স্থানে আবার জঙ্গলা-কীর্ণ অবস্থায় শোভা পাইতেছে ; ঐ সকল জঙ্গলের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় পাহাড়ী পক্ষী সকল আপন মনে মধুর স্বরে গান করিয়া আমাদের ন্যায় ভয়ার্ত্ত যাত্রীদিগের প্রাণে সাহস প্রদান করিতে থাকে, এ কারণে এখানকার এই ভয়াবহ স্থানটীর দৃশ্য অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। সে যাহা হউক, এই পার্ব্বত্য মধ্য পথ অতিক্রম করিয়া ক্রমে টাঙ্গা চালকেরা ভেরা-ঘাট নামক স্থানে উপস্থিত হইল। এই ভেরাঘাটে গাড়োয়ানেরা আমাদিগকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া তাহাদের গাড়ীর ঘোড়াগুলি খুলিয়া দিয়া বিশ্রাম করিতে দিল। এবার আমরা পদব্রজে পথের যত নিম্নে যাইতে লাগিলাম, ততই ইহার মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চমৎকৃত হইতে লাগিলাম ; কেন না, এই নিম্ন পথটীতে স্তরে স্তরে গগণচুম্বী পর্ব্বতমালা শোভা পাইতেছে, তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র কায়া নর্ম্মদা নদী প্রবাহিতা। সৃষ্টিকর্ত্তার ইহা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। জগৎস্রষ্টার এই সকল সৃষ্টিনৈপুণ্য দর্শন করিতে করিতে বরাবর যথায় একটী ক্ষুদ্র স্রোত-স্বিনীর ধারা সম্মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানে উপস্থিত হইলে সঙ্গী বন্ধুটী বলিলেন, "আপনারা সম্মুখে যে সঙ্গম স্থান দেখিতেছেন, উহার একটী বাণগঙ্গা, অপরটী নর্ম্মদা নামে খ্যাত। স্থানীয় অধিবাসীরা সঙ্গম স্থানটীকে ভেড়া-ঘাট বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আমরা এই ভেড়া-ঘাটে

উপস্থিত হইবামাত্র নর্ম্মদায় তীর্থ কার্য্য সম্পন্ন করাইবার নিমিত্ত পাণ্ডা উপস্থিত হইলেন ; বলাবাহুল্য, নর্ম্মদা তীর্থের পাণ্ডা এই ভেড়া-ঘাটের উপরিভাগে অবস্থান করিয়া থাকেন, বন্ধুর উপদেশ মত তাঁহাকেই তীর্থগুরু পদে মান্য করিলাম। এইরূপে এখানে তীর্থগুরু প্রাপ্ত হইয়া ভেড়া-ঘাটের এক পার্শ্বে যে একখানি ডোঙ্গা বাঁধা ছিল, পাণ্ডার উপদেশ মত ঐ ডোঙ্গার সাহায্যে একে একে সকলেই যথাসময়ে পরপারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—কেবল পার্ব্বত্য পথ, কোথাও নামিয়াছে কোথাও বা উচ্চ হইয়া আছে। সেই উচু নীচু পথের উপর দিয়া পাণ্ডা ঠাকুর আমাদিগকে পথ দেখাইতে দেখাইতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথের বামদিকে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা, দক্ষিণ পার্শ্বে এই পথেরই নিম্নভাগে হুঙ্কারকারিণী ভীষণ নর্ম্মদা স্রোত প্রবাহিতা। এইরূপে এই পথ অন্যূন এক পোয়া অতিক্রম করিবার পর, আমরা লোকালয়ের মধ্যস্থিত পল্লীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। যে সকল অধিবাসীদিগকে এখানে দেখিতে পাইলাম, তাহাদিগের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত গরীব বলিয়া অনুমান হয়। এই পল্লীর মধ্যে হাট বাজার কোন কিছু না থাকায় তাহাদের অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিতে হয় সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, এই গ্রাম্য পথের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম। পাণ্ডা ঠাকুর বলিলেন, "এই ধর্ম্মশালাটী সদাশয় ইংরেজ বাহাদুর তীর্থ যাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্য নির্ম্মাণ করাইয়া সাধারণের কত উপকার করিয়াছেন, উহা লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করা অসাধ্য ; কারণ এখানে এই ধর্ম্মশালা ব্যতীত যাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্য অপর কোনরূপ আশ্রয় স্থান নাই। ধর্ম্মশালায় একবার সদলে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ইহা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিয়া যেন আমাদের ন্যায় পরিশ্রান্ত তীর্থ যাত্রী-

দিগকে ইহাতে শান্তিসুখ অনুভব করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছে, এবং তৎসঙ্গে ইংরেজরাজের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। ইহার মধ্যে দরদালানযুক্ত গুটিকত কক্ষ, তাহার এক পার্শ্বে একটি রন্ধনশালা, অপর পার্শ্বে একটী পায়খানা শোভা পাইতেছে, আবার ইহার পশ্চাদ্ভাগে নর্ম্মদা নদীগর্ভ পর্য্যন্ত প্রস্তরময় সোপানশ্রেণীতে সজ্জীকৃত।

তীর্থগুরু পাণ্ডার উপদেশানুসারে আমরা সকলে এই ধর্ম্মশালায় এক নির্দ্দিষ্ট কক্ষে দ্রব্য সম্ভার স্থাপিতপূর্ব্বক মনের আনন্দে তীর্থতীরে গমন করিলাম। এইরূপে পুণ্যসলিলা নর্ম্মদার তীরে উপস্থিত হইবামাত্র মনোমধ্যে মহাভারতের কথা জাগিতে লাগিল যে, যুগে যুগে কত দেব, কত ঋষি, কত তপস্বী নর্ম্মদার এই পুণ্যসলিলে অবগাহনপূর্ব্বক দেহ পবিত্র করিয়াছেন, আবার ইহার তীরে বসিয়া নির্জ্জন বনস্থলীতে কত যতি অনন্ত অনাদিদেবের তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। পূর্ব্ব জন্মের বহু পুণ্যফলে এবং গুরুজনের আশীর্ব্বাদে আজ ভাগ্যক্রমে আমরাও সেই পবিত্র সলিলে অবগাহন করিতে সক্ষম হইতেছি—মানবের ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর অধিক কি হইতে পারে?

এ তীর্থে সঙ্কল্প এবং স্নান তর্পণের সময় থালা, গেলাস, সাড়ি, পুষ্প পত্র প্রভৃতি যাবতীয় আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি পাণ্ডা ঠাকুর নিজ হইতেই দিয়াছিলেন, আমরা কেবল তাহার মূল্য দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। এই স্থানে একটী কথা বলিব, এতাবৎকাল ভারতের কত দেশ, কত তীর্থ স্থান পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, এক উৎকলে বিন্দু সরোবর আর এই নর্ম্মদা ভিন্ন অপর কোন তীর্থে পুরুষ লোকদিগকে পিতৃমাতৃকুল ব্যতীত শ্বশুরকুলকে মন্ত্রের সময় আবশ্যক হয় নাই, এবং এরূপ শুদ্ধ ভাবে মন্ত্র উচ্চারণ ও শ্রবণ করিতে পাই নাই। সে যাহা হউক, এখানে

সঙ্কল্পের পর স্নানের সময় পাণ্ডা ঠাকুর যখন আমাদেরই মঙ্গল কামনা করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, তখন মনোমধ্যে এক নবভাবের উদয় হইতে লাগিল। এইরূপে এখানকার তীর্থক্রিয়া সমাপনান্তে ধর্ম্মশালায় প্রত্যাগমন করিয়া জব্বলপুর সহর হইতে যে সকল আহার্য্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহারই সাহায্যে সকলে জঠরানল নিবৃত্তি করিয়া সুস্থ হইলাম।

অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর পাণ্ডার সহিত স্থানীয় দর্শনীয় স্থানগুলি দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইলাম। তৎপরে এই ধর্ম্মশালায় যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী স্থাপনপূর্ব্বক পাণ্ডাকে অগ্রগামী করাইয়া প্রথমে নর্ম্মদার জগদ্বিখ্যাত জলপ্রপাতের শোভা দর্শন করিতে যাত্রা করিলাম। ধর্ম্মশালা হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমাগত উচু নীচু পথ অতিক্রম করিতে করিতে এক শস্যক্ষেত্রের উপর আল-পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলাম.এই সময় মধ্যে মধ্যে জল পতনের গভীর গর্জ্জনও শুনিতে লাগিলাম; ক্রমে এই পথটী যে স্থানে নিম্নাভিমুখে প্রসারিত হইয়াছে, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া যাহা দর্শন করিলাম, উহাতেই সকলকে চমৎকৃত হইতে হইল। কারণ এখানে নদী গর্ভের উভয়তীরে মর্ম্মরপর্ব্বত, তাহার উপর দিয়া চট্টগ্রামের অন্তর্গত সীতাকুণ্ডের সহস্রধারার ন্যায় নর্ম্মদার সফেন সলিলরাশি ঐ সকল পর্ব্বতের এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গে বাধা পাইয়া দার্জ্জিলিং সহরের পাগলাঝোরার ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে ইতস্ততঃ আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। কি মনোহর দৃশ্য! এ দৃশ্য যিনি একবার দেখিয়াছেন,ইহজন্মে তিনি তাহা কখন ভুলিতে পারিবেন না। তৎপরে এখানকার এই মর্ম্মরগিরির এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গে অবতরণ করিবার সময় অদূরে এই অত্যুচ্চ গিরিগাত্র বহিয়া নর্ম্মদার জলপ্রপাত যে নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে চক্রাকারে সগর্জ্জনে আবর্ত্তনপূর্ব্বক নিঃস্মরণ হই-

তেছে, সেই স্থানটী স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। পাণ্ডা ঠাকুর বলিলেন, এই স্থানে চক্রাকার আবর্ত্তন বর্ত্তমান থাকার জন্য ইহা জনসমাজে ধুয়াধার নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কাপুরে রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া সদলে এই ধুয়াধার পার হইয়া অযোধ্যা নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রমাণস্বরূপ পাণ্ডা ঠাকুর আমাদিগকে দেখাইলেন, কোমলাঙ্গী সীতাদেবী এই স্থান পার হইবার সময় শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে গিরিরাজ কোমলভাব ধারণ করিয়াছিলেন, তাই এখানকার পাথর সকল অদ্যাপি নরম অবস্থায় অবস্থান করিয়া দেবীর আগমনের বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আমরা সকলে এই ধুয়াধারের তীরবর্ত্তী কতকগুলি ছোট ছোট নরম পাথর সংগ্রহ করিয়া লইলাম।

ইহার পরপারের তটোপরি একটী উচ্চ কলের কারখানা, তাহার এক পার্শ্বে একটী মর্ম্মর প্রস্তরের নির্ম্মিত কূপ আছে, ঐ কূপে জল যতই থাকুক না কেন, ইহা মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত বলিয়া তাহার তলদেশ পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এই কূপ-স্থান হইতে বহু দূর অগ্রসর হইয়া পাণ্ডাজী আমাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া এক দুর্গম পর্ব্বত-পথে আরোহণ করিতে লাগিলেন। এখানকার এই গিরিপথে যে দিক্ দিয়া আমরা যাইতেছিলাম, সেই সঙ্কীর্ণ পথের উভয় পার্শ্বে অসংখ্য কাঁটা বন ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সে যাহা হউক, অতি কষ্টে আমরা ইহার শিখরদেশে আরোহণ করিলে সেই সমতল স্থানে একটী প্রকাণ্ড ভগ্ন মন্দির দেখিতে পাইলাম। এই মন্দির প্রাচীর গাত্রে ছাদের নিম্নভাগে বিস্তর প্রস্তর মূর্ত্তি ও নানা ধরণের স্তম্ভ সকল শোভা পাইতেছে। অবগত হইলাম, এই সকল প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তিগুলি চৌষট্টি যোগিনী নামে খ্যাত। স্থানীয় মূর্ত্তিগুলির মধ্যে কোনটীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিছুই নাই, কোনটী অর্দ্ধাঙ্গ অবস্থায় অবস্থান করিতেছে, আবার মন্দির ছাদের

কোন অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা প্রাচীর স্থান খসিয়া পড়িয়াছে, সেই প্রাচীরবেষ্টিত সমতল স্থানের মধ্যস্থলে গৌরীশঙ্করের মন্দির নামে একটী সুন্দর মন্দির শোভা পাইতেছে। অনুসন্ধানে জানিলাম, সম্রাট আকবরের প্রধান সেনাপতি সসৈন্যে গড়মণ্ডল আক্রমণ করিলে রাণী দুর্গাবতীর অসীম সাহসের পরিচয় পাইয়া "আসফ খাঁ" বিষণ্ণ মনে এই পর্ব্বতশিখরে উপস্থিত হইয়া, হিন্দুর প্রতিষ্ঠিত ঐ সকল মূর্ত্তিগুলির উপর এইরূপ অত্যাচারপূর্ব্বক, তাঁহার আগমনবার্ত্তা এবং তৎসঙ্গে সেনাপতি আপন জয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়াছেন। সে যাহা হউক, আমরা এখানে ভগবান গৌরীশঙ্করের পবিত্র মূর্ত্তি দর্শনপূর্ব্বক সকল পরিশ্রমের অবসান করিলাম। পাণ্ডার নিকট এখানে আরও উপদেশ পাইলাম, প্রতি বৎসর কার্ত্তিক পূর্ণিমায় এই স্থানে এক মেলা হয়, ঐ মেলা তিন চারিদিন বর্ত্তমান থাকায়, যাত্রীগণ ভগবান গৌরীশঙ্করের মহিমা প্রকাশ করিতে অবসর পাইয়া থাকেন। এইরূপে চৌষট্টি যোগিনী এবং গৌরীশঙ্করের পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া এখান হইতে পুনরায় নর্ম্মদা তীরে উপস্থিত হইলাম।

পথিমধ্যে এক স্থানে পঞ্চবটী নামে একটী বাঁধান ঘাট, তাহার উপরিভাগে একটী প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির শোভা পাইতেছে; শিবমন্দির হইতে নর্ম্মদা তীর্থতীর পর্য্যন্ত প্রস্তর সোপান সজ্জীকৃত। এই ঘাটের উপর হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে সৃষ্টিকর্ত্তার অপূর্ব্ব লীলা সকল দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। কথিত আছে, পাণ্ডবেরা বনবাসকালে এই পঞ্চবটী ঘাটে বসিয়া পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত অনেক যাত্রী এই ঘাটে বসিয়া স্নান ও তর্পণ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। পঞ্চবটী ঘাটের সন্নিকটে "ডাক বাঙ্গলা" একখানি সুশোভিত চিত্রের ন্যায় আপন শোভা বিস্তার করিয়া

আছে। ডাক বাঙ্গলার উপর হইতে নিম্নভাগে স্রোতস্বিনী নর্ম্মদার মনোহর দৃশ্য স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানটী অতি নির্জ্জন এবং স্বাস্থ্যপ্রদ, আমরা ক্ষণেকের জন্য এই স্থানে অবস্থানকালে স্থান মাহাত্ম্যগুণে যেন কোথা হইতে মনোমধ্যে ভক্তিপ্রেমের উদয় হইতে লাগিল। ইহার পার্শ্বে নদীতীরে রেলিং ঘেরা এক স্থানে একটী তুলসী-মঞ্চ শোভা পাইতেছে। পাণ্ডার নিকট উপদেশ পাইলাম, ঐ নির্দ্দিষ্ট মঞ্চস্থানটী পুরাকালে মহাযোগী ভৃগু ঋষির আশ্রম ছিল। এই সময় মহাভারতের পুণ্য কথা স্মরণ হইল, স্বয়ং নারায়ণ যে ঋষির পদচিহ্ন ভক্তিভাবে আপন বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ মহাবীর্য্য-শালী কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বিনাশ করিবার জন্য যে পূর্ণব্রহ্ম এই ভৃগুপত্নী রেণুকার গর্ভে পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া জগৎকে পিতৃভক্তি শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। যিনি পরশুসহ জন্ম গ্রহণ করাতে ধরায় পরশুরাম নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। একবার ভাবিলাম, সত্যসত্যই কি আমরা পিতামাতার আশীর্ব্বাদে সেই পবিত্র স্থান "ভৃগু আশ্রমে" উপস্থিত হইলাম, তখন আর বুঝিতে বাকি রহিল না, কেন এই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র হৃদয়ে ভক্তিভাবের উদয় হইতেছিল। সে যাহা হউক. এই আশ্রম স্থানটী নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত এখানে লাল বর্ণে একটী নিশান বায়ুভরে দুলিতে দুলিতে সেই মহাযোগীর মহিমা প্রকাশ করি-তেছে। আমরা সকলে এই পুণ্য আশ্রমের পরিচয় পাইয়া স্থানীয় কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা কপালে লেপনপূর্ব্বক আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিতে লাগিলাম। এইরূপে একে একে এখানকার আরও পুণ্যভূমি সকলদর্শন শেষ করিয়া যথাসময়ে ধর্ম্মশালায় প্রত্যাগমন করিলাম।

ধর্ম্মশালা হইতে প্রত্যাগমনকালে সঙ্গী বন্ধুর উপদেশ মত পূর্ব্বোক্ত টাঙ্গা গাড়ীর সাহায্যে "মদনমহল" নামক দুর্গের শোভা দর্শন করিতে

যাত্রা করিলাম। কথিত আছে, আর্য্যগন্দ জাতিরা এই বিখ্যাত দুর্গটী নির্ম্মাণ করেন। স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট অবগত হইলাম, এই প্রাচীন দুর্গ একটী পর্ব্বত খোদিত হইয়া নির্ম্মিত, তাই ইহার সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য সকলেই অভিলাষ করেন। দুর্গটীর স্থাপত্যনৈপুণ্য দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়, কেন না এখানে সারি সারি উচ্চ খিলানের উপর এই দুর্গের গৃহ ও অঙ্গনগুলি প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সেই প্রাচীন শিল্পকারীদিগের গৌরব প্রকাশ করিতেছে।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, রাণী দুর্গাবতী বৈধব্য অবস্থায় তাঁহার নাবালক পুত্র, বীরনারায়ণের নামে যখন রাজ্য শাসন করেন, সেই সময়ে মোগল সম্রাট আকবরের প্রধান সেনাপতি "আসফ খাঁ" গড়-মণ্ডল আক্রমণ করেন। এই দীর্ঘকাল প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের সময় স্বয়ং রাণী দুর্গাবতী সদলে এই দুর্গে অবস্থানপূর্ব্বক যবনদিগকে তাঁহার বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়া শ্বশুরকুলের মান রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত অদ্যাপিও এ অঞ্চলে স্বর্গীয়া দুর্গাবতী সাধারণের নিকট বীরা-ঙ্গনার যোগ্য পূজা পাইয়া থাকেন।

এই মদনমহল নামক জগদ্বিখ্যাত দুর্গের সন্নিকটে অপর একটী পর্ব্বতের শিখরদেশে প্রতিষ্ঠিত এক শিবমন্দির দর্শন করিয়া এখান হইতে জব্বলপুরের বাসাবাটীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কথিত আছে, রাণী দুর্গাবতীর আহারের জন্য যে রমণী গম পিষিয়া দিত, তিনি তাঁহার নিকট যে বেতন পাইতেন, ঐ নির্দ্ধারিত বেতনের অর্থ সাধ্য-মত সঞ্চয় করিয়া এই শিবমন্দিরটী স্থাপনাপূর্ব্বক সাধারণকে অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। বন্ধুর কৃপায় এইরূপে এখানকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন করিয়া অপরাহ্নকালে টাঙ্গায় আরোহণপূর্ব্বক গড়মণ্ডল হইতে সেনা বারিকের মধ্য পথ ভেদ করিয়া মাঠপথে উপ-

নীত হইলাম। এখানকার এই পার্ব্বত্য রাস্তায় টাঙ্গাগুলি কখন উপরে কখন খাদে পড়াতে, সেই হেঁচকানীর চোটে আমাদের শরীর আরষ্ট হইয়া উঠিল, সুতরাং বন্ধুর উপরোধ সত্ত্বেও আমরা আর কোন স্থানের শোভা দর্শন না করিয়া বরাবর জব্বলপুরের নির্দ্দিষ্ট বাঙ্গালায় উপস্থিত. হইলাম।

পর দিবস বাসাবাটী হইতে প্রভাস তীর্থ দর্শনার্থ বোম্বে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

বোম্বে পথ

বাঙ্গালায় আশ্রয়দাতার নিকট সকলে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক যথাসময়ে স্থানীয় ষ্টেশনে উপস্থিত হইবামাত্র কলিকাতা হইতে গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনে যে বোম্বে মেল যায়, সদলে ঐ মেলট্রেণে আরোহণ করিয়া আমি যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইলাম। আমার অবস্থা দেখিয়া সঙ্গী বন্ধুটী আমাকেই নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ভায়া! গাড়ীতে গাড়ীতে পরিভ্রমণ করিয়া তুমি এত কষ্টবোধ করিতেছ, আর ত্রেতাযুগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ভূভারহরণার্থে পিতৃসত্যপালন সময় অনুজ লক্ষ্মণ ও জনকনন্দিনী কোমলাঙ্গী সীতাদেবী সমভিব্যাহারে এই সকল শ্বাপদসঙ্কুল দুর্দ্দান্ত রাক্ষস এবং হিংস্র জন্তুপূর্ণ গভীর বন, উপবন, দুর্গম গিরি, নদ ও নদী সকল অক্লেশে অতিক্রমপূর্ব্বক মানবদিগকে কষ্ট স্বীকার করিতে শিক্ষা দিবার জন্যই ভরদ্বাজাশ্রম হইতে বহু দূর—দণ্ডকারণ্যে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কষ্টের সহিত তোমার কষ্টের তুলনা অতি সামান্য।" এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি আমাকে সান্ত্বনা করিলেন। সে যাহা হউক, এই দ্রুতগামী ট্রেণখানি ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া

যখন থান্দোয়া ষ্টেশনে পৌঁছিল; তখন তিনি আবার আমাদিগকে বলিলেন, "তোমরা সকলে একবার এই স্থানটীর প্রতি লক্ষ্য কর। এই স্থানই সেই ভারত প্রসিদ্ধ খাণ্ডব বন—নরনারায়ণরূপী তৃতীয় পাণ্ডব মহা ধনুর্দ্ধর "অর্জ্জুন" এই স্থানেই খাণ্ডব বন দাহ করিয়া ক্ষুধাতুর অগ্নিদেবের ক্ষুধানল শান্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট এই সকল ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমরা সকলে মনের সুখে গাড়ীতে বসিয়া গল্প করিতে করিতে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলাম।

দ্রুতগামী ট্রেণখানি এইরূপে যখন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ইগাতপুরী নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইল,তখন ট্রেণের যাবতীয় কামরাগুলিতে আলো প্রজ্জ্বলিত হইল, তদ্দর্শনে যাত্রীদিগের মধ্যে অনেকেই বলাবলি করিতে লাগিলেন, "রেল কোম্পানীর অগাধ পয়সা, লাভও বিস্তর—তাই বাজে খরচের দিকে কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি রাখেন না। সন্ধ্যা হইতে এখন কত বিলম্ব আছে, তথাপি প্রত্যেক কামরাতে আলো প্রজ্জ্বালিত করিয়া কর্ম্মচারীরা আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন করিলেন।" এই সময় আমাদের সঙ্গী বন্ধুটী বলিলেন,"রেল কোম্পানীর পয়সা নানা দিকে নানারূপ অপব্যয় হয়,এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, কিন্তু এ স্থলে আপনারা যেরূপ স্থির করিয়াছেন, ইহা তাহা নয়; কারণ এবার এই দ্রুতগামী ট্রেণখানি থালঘাট নামক পর্ব্বতের উপর দিয়া অনেকগুলি "টনেল" পার হইবে, সেই সকল টনেল পার হইবার সময় ইহাকে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ধকার পথের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, ঐ সময় চুরি চামারি বা অন্য কোনরূপ আপদ বিপদ হইতে যাত্রীদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রেলকর্ত্তৃপক্ষের আদেশে এখানে দিনমানেই আলো দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।"

ইগাতপুরী ষ্টেশনের পর হইতেই রেল লাইনটী আঁকিয়া-বাঁকিয়া

ঘুরিয়া-ফিরিয়া নানা পার্ব্বত্য নদ, নদী, উপত্যকাভূমি অতিক্রমপূর্ব্বক থালঘাট নামক পর্ব্বতের উপর দিয়া প্রসারিত হইয়াছে। স্থানটী দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলপথের অনুরূপ। এই ভয়ানক স্থানে ট্রেণ-খানিকে অন্যূন দুই হাজার ফিট উচ্চে আরোহণ করিয়া তৎপরে কতকগুলি টনেল অতিক্রমপূর্ব্বক রিভার্সিং নামক ষ্টেশনে পৌঁছিতে হয়। একদিকে ট্রেণখানি যেমন উচ্চে আরোহণ করিবে, অপরদিকে সেইরূপ ক্রমশঃ তত নীচে নামিবে। আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, থালঘাট পর্ব্বতের শিখরদেশটী সমুদ্র পথ হইতে দুই হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত। বন্ধুর কথিত মত ট্রেণখানি নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলে আমরা গাড়ীর ভিতর হইতে দেখিতে পাইলাম, এই পথটী যথার্থই আঁকা-বাঁকা, লাইনের উভয় ধারেই গাছপালায় পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে আবার পাহাড়ের গায়ে ঐ সকল জঙ্গলাকীর্ণ ঝোপের পার্শ্বে কত ময়ূর ময়ূরী সগর্ব্বে মনের আনন্দে তালে তালে নৃত্য এবং কেওয়া-কেওয়া রব করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা প্রকাশ করিতেছে। স্থানটী একদিকে যেমন নির্জ্জন, অপরদিকে সেইরূপ নয়নানন্দদায়ক। এখানকার এই নিভৃত স্থানে ট্রেণখানি যখন পিপীলিকার সারিবৎ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন সেই দৃশ্য অতি মনোমুগ্ধকর—কোথাও পর্ব্বতের উপরিভাগে সূর্য্যকিরণ ঝক্‌মক্‌ করিতেছে, অথচ নীচে ছায়ার মত গিরিগাত্রে আবৃত, কোথাও বা পাহাড়ের মাথার উপর খণ্ড খণ্ড সাদা ভাসা মেঘ সকল বায়ুভরে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। কি মনোহর দৃশ্য! ইহা স্বভাবের এক রমণীয় ভাব!

ইগাতপুরী ষ্টেশন হইতে থালঘাট পর্য্যন্ত যে কয়টা টনেল পার হইলাম, তন্মধ্যে একটী টনেল অতি দীর্ঘ। আমরা ঘড়ি ধরিয়া দেখিয়াছি, এই দীর্ঘ টনেলটী অতিক্রম করিতে চারি মিনিট সময় লাগিয়া-

ছিল, কিন্তু এই অল্প সময়েরই মধ্যে প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। সে যাহা হউক, এখানে ট্রেণখানি কখন নিম্নে, কখন উর্দ্ধে, যেন নৃত্য করিতে করিতে কতকগুলি পার্ব্বত্য নদীর উপর বিবিধ প্রকার পুল সকল অতিক্রম করিয়া নির্ব্বিঘ্নে রিভার্সিং নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। এখানেও গিরিগাত্রের বহু নিম্নে ঐ সকল নদীর উপর লৌহ নির্ম্মিত পুলগুলি কি অদ্ভুত কৌশলে স্থাপিত হইয়াছে, উহা একবার ভাবিলে ইংরেজ ভাস্করদিগের বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। রিভার্সিং ষ্টেশনে উপস্থিত হইবামাত্র ট্রেণখানির অগ্র পশ্চাৎ দুইদিকে দুইখানি ইঞ্জিন সংযুক্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ট্রেণখানি যে মুখে আসে, তাহার উল্টাদিকেও ইঞ্জিন লাগান হয়, সুতরাং স্থানীয় ষ্টেশনটী রিভার্সিং নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই স্থানে আবার ট্রেণখানি গমনাগমনের সময় পর্ব্বত উপরের স্থাপিত রেললাইন, ষ্টেশন, টনেল প্রভৃতির দৃশ্য-গুলি বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

ইতিপূর্ব্বে দ্বারকাপুরী দর্শন করিতে এই লাইন দিয়াই যখন যাত্রা করিয়াছিলাম, তখন এই সকল দ্রষ্টব্য স্থান, কাহার কি নাম, কোথায় কিরূপভাবে লাইনটী প্রসারিত হইয়াছে, তাহার সন্ধান করিতে না পারায় পাঠক সমাজে কিছুই জানাইতে পারি নাই, এবার বন্ধুর সাহায্যে এ পথের যে সমস্ত তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, সাধ্যমত উহাই প্রকাশিত হইল।

রিভার্সিং ষ্টেশন হইতে ট্রেণখানি ক্রমে পুলের উপর দিয়া সমুদ্রের এক বিস্তীর্ণ খাঁড়ি পার হইয়া ঠানা নামক স্থানে পৌঁছিল। এই ঠানা হইতে বোম্বে সহর অনূন একুশ মাইল দূরে অবস্থিত। তাহার পর সালসেট নামক দ্বীপে উপস্থিত হইলাম। পথিমধ্যে ট্রেণে বসিয়াই এই খাঁড়ির উপর কত দেশীয় নৌকা পালভরে যাতায়াত করিতেছে, ঐ

সকল নৌকার গতিবিধি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। ঠানা হইতে আন্দাজ দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিবার পর ভন্দোপ নামক ষ্টেশন পাইলাম। সঙ্গী বন্ধুটী বলিলেন, এই স্থান হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে বেহার ও তুলসী নামে দুইটী বিখ্যাত প্রশস্ত হ্রদ আছে, ঐ দুই হ্রদ হইতে সমস্ত বোম্বাই সহরে জল সরবরাহ হইয়া থাকে। ভন্দোপ ষ্টেশনের পর হইতে যাহা কিছু দ্রষ্টব্য স্থান নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল, বন্ধুর নিকট ঐ সকল স্থানের কিছু কিছু পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা ঠানা ষ্টেশন হইতে খাঁড়ি পার হইয়া সালসেট নামক দ্বীপে পৌঁছিয়া তথা হইতে আবার কারলা নামক ষ্টেশনের নিকটস্থ সমুদ্রের খাঁড়ি পার হইয়া বরাবর খাস বোম্বাই দ্বীপে গমন করিয়াছিলাম। এই খাঁড়ির সেতু পার হইয়া বোম্বাই দ্বীপের প্রথম রেল ষ্টেশন "সায়ন" দেখিতে পাওয়া যায়, তথা হইতে তিন মাইল দূরে বাইকুলা ষ্টেশন। প্রকৃতপক্ষে এই বাইকুলা নামক স্থান হইতেই বোম্বাই সহর আরম্ভ হইয়াছে।

বোম্বে

বোম্বে সহরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—কেন না ইতিপূর্ব্বে এই সহরের বিষয় উল্লেখ হইয়াছে। বোম্বাই সহরের অলিগলিতে ট্রাম গাড়ী চলিতেছে, এ ট্রাম গাড়ী কলিকাতা সহরের ন্যায় নহে—কলিকাতায় চৌরিঙ্গী বা শিয়ালদহ ষ্টেশন যাইতে যেরূপ প্রথম শ্রেণীর ট্রাম গাড়ীতে দুই ভাগে বিভক্ত আসন দেখিতে পাওয়া যায়,এখানকার ট্রামগুলি ঠিক সেইরূপ। সকল ট্রাম গাড়ীগুলি সবুজ বর্ণের এবং সুদৃশ্য। ড্রাইভার বা কণ্ডাক্টরদিগের পোষাক ও সভ্যভাব। এই সকল গাড়ীর ভাড়া

সর্ব্বত্রই /০ আনা। অবগত হইলাম, এ সহরে অলিগলি ট্রাম চলিতেছে সত্য, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কলিকাতার ন্যায় যখন তখন দুর্ঘটনা ঘটে বলিয়া শুনিতে পাইলাম না। বোম্বাই সহরে অবরোধ প্রথা নাই বলিয়া আবরণযুক্ত কোন গাড়ী নাই; তবে যাঁহাদের এইরূপ গাড়ীর একান্ত আবশ্যক হইবে, তাঁহাদিগকে ঢাকা বয়েল গাড়ীর আশ্রয় লইতে হইবে।

জব্বলপুরের ন্যায় এখানেও সকল দ্রব্য-সামগ্রী কাঁচি ওজনে বিক্রয় হইয়া থাকে।

বাইকুলা রেলষ্টেশনের ঠিক উত্তরদিকে বোম্বাই সহরের বিখ্যাত "এল্‌ফিনষ্টোন" গর্ব্বভরে আপন শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। উত্তর হইতে দক্ষিণ—এই ভূখণ্ডের পূর্ব্ব সীমানায় বোম্বাই হারবার। হার-বার ও সমুদ্রাংশের মধ্যে এলিফাণ্টা ও অপরাপর দ্বীপগুলি অবস্থিত। সহরের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সমুদ্রতীর—এই স্থানে যে প্রশস্ত রাস্তা আছে, সেই রাস্তার সাহায্যে স্থানীয় অধিবাসীরা স্ত্রী পুরুষ সকলে একত্রিত হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া থাকেন। সন্ধ্যাকালের দীপালোক শোভিত রাজপথগুলি এবং এই পথে সমুদ্রতীরে গমনপূর্ব্বক বায়ুসেবন-কালে আমাদের প্রাণে যে কি এক স্ফূর্ত্তি জন্মিল, উহা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা অসাধ্য।

বোম্বে হারবারের পশ্চিমে মালাবার ও খাম্বালা পর্ব্বত, আবার এই স্থানেই ব্যাকবের অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। এই খাম্বালা-হিলের উপরিভাগে যথায় সারি সারি নারিকেলকুঞ্জ শোভা পাইতেছে, সেই কুঞ্জ স্থানের মধ্যে মহালক্ষ্মীদেবীর মন্দির শোভা পাইতেছে, অর্থাৎ ষ্টেশনের সন্নিকটে প্রায় এক মাইল দূরে সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে এই বিখ্যাত পবিত্র মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরাভ্যন্তরে মহালক্ষ্মী, মহাকালী

ও মহাসরস্বতী এই ত্রিদেবীমূর্ত্তির দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করিলাম। তৎপরে এই দেবালয়ের সংলগ্ন যে মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানশ্রেণী সতত সাগর তরঙ্গে ধৌত হইতেছে, সেই মনোহর দৃশ্য নয়নগোচর করিয়া আনন্দে অধীর হইলাম। এখানকার এই মহালক্ষ্মী-দেবীর মন্দিরের অদূরে বোম্বাই সহরের বিখ্যাত ধনকুবের "ডাকোজী দাদাজীর" স্থাপিত মন্দিরটী আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে, তাহার পাশাপাশি আরও কয়েকটী সুন্দর মন্দিরের শোভা দর্শন পাওয়া যায়।

খাম্বালাহিলের দক্ষিণদিকে বিখ্যাত মালাবার হিল, নূতন যাত্রী-দিগকে তাহার শোভা দেখাইবার জন্য মস্তক উন্নত করিয়া আছে এই দুই হিলের উপরকার রাস্তা ঘাট অতি পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন, অধিকন্তু এই স্থানের পথের উভয় পার্শ্বে বিস্তর সুরম্য উদ্যান থাকাতে ইহার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছে। আমরা সদলে ঐ উদ্যান পথে ক্ষণেক বিচরণ করিয়া সকল পরিশ্রমের অবসান করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যে সকল উদ্যান বাটী এখানে শোভা পাইতেছে অনুসন্ধানে জানিলাম—বোম্বাই সহরের যাবতীয় ধনী ব্যক্তি [illegible] এই সকল বাগানবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া আপন আপন অর্থের সদ্ব্যবহার হইল মনে করিয়া থাকেন, সুতরাং সময় মত তাঁহাদের সহরের আবাস বাটী হইতে ঐ সকল উদ্যানে অবস্থান করিয়া শান্তিসুখ অনুভব করেন। এতদ্ভিন্ন এই মালাবার হিলের উপরিভাগে খাম্বালাহিলে মহা লক্ষ্মী ও অপরাপর দেবালয়ের ন্যায় ভগবান ভূতভাবন ও বালুকেশ্বরের মন্দির, পার্শী শবাগার ও বোম্বাই লাটের প্রাসাদ বিদ্যমান। এই স্থানেই তারাদেও, কামাতিপুরা, বাইকুলা, তার-বাড়ী প্রভৃতি নামে বহু বিধ পল্লী সকল স্থাপিত হওয়াতে এখানকার জাঁকজমক বেশী দেখিতে

পাওয়া যায়। তারাদেও পল্লীর দক্ষিণে গিরগাম পল্লী, এই পল্লীর মধ্যে পুলিস ষ্টেশন, বি-বি-সি আই রেল কোম্পানীর গ্র্যাণ্ড রোড নামে এক ষ্টেশন। প্রভাস যাইতে হইলে যাত্রীদিগকে এই গ্র্যাণ্ড রোড নামক ষ্টেশনে আসিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন এখানে বিস্তর হিন্দু ও জৈন্যদিগের দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। গিরগাম পল্লীর পূর্ব্বদিকে ক্ষেতবাড়ী, এল্‌ফিনষ্টোনাবাদ, ইহার দক্ষিণে ময়দান ও কেল্লা। যে স্থানে কেল্লা বর্ত্তমান আছে, ঐ স্থানের সন্নিকটেই টাউনহল, টাঁকশাল, ব্যারাক, পুলিসকোর্ট, হাইকোর্ট প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রষ্টব্য অট্টালিকাগুলি শোভা পাইতেছে। স্থানীয় ব্যারাকের পূর্ব্বদিকে হারবারের উপরি-ভাগে আপলো বন্দর, বোম্বে সহরের প্রসিদ্ধ তুলার হাট, এই তুলা হাটের দক্ষিণেই কোলাবা ষ্টেশন। সঙ্গী বন্ধুর নিকট উপদেশ পাই-লাম, পূর্ব্বে বাকুলা হইতে যেমন বোম্বাই সহরের আরম্ভ দেখিয়াছেন, এখানেও সেইরূপ এই যে সম্মুখে কোলবা ষ্টেশন দেখিতেছেন—ইহাই বোম্বাই সহরের শেষ সীমা বলিয়া জানিবেন।

এল্‌ফিনষ্টোনাবাদের পরই প্রিন্সেস ডক। এই ডকের অদূরে ব্যাক্‌বের উপকূলে মুসলমান এবং ইংরেজদিগের গোরস্থান,তাহার সন্নি-কটেই হিন্দুদিগের শ্মশানক্ষেত্র বর্ত্তমান থাকিয়া মোহান্ধ মানবদিগকে ধর্ম্মে মতি রাখিয়া সতত একমাত্র পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছে। এইরূপে সহর পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে মাড়োয়ারি নামক বাজারে উপস্থিত হইলাম। এই বাজারের সম্মুখে যে মন্দিরের চূড়া দৃষ্ট হয়, সেই চূড়াটী নির্দ্দেশ করিয়া বন্ধু বলিলেন, ঐ মন্দিরটী এখানকার জাগ্রত মুম্বাদেবীর মন্দির। ইতিপূর্ব্বে আপনারা দার্জ্জিলিংএ যেরূপ ভগবান দুর্জ্জয়লিঙ্গের নামানুসারে সহরের নাম দার্জ্জিলিং শুনিয়াছেন, এখানেও সেইরূপ ঐ মুম্বাদেবীর নামানুসারে এ

সহরের নাম আসল মুম্বা নাম হইতে পরিবর্ত্তন হইয়া ইংরেজ আমলে বোম্বে নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, জানিবেন।

মাড়োয়ারী বাজারের সম্মুখে যথায় কতকগুলি হালুইকরের দোকান আছে, ঐ সকল সুসজ্জিত দোকানগুলির মধ্যস্থলে একটী প্রকাণ্ড ফটক দেখিতে পাইলাম, এই ফটকের উভয়দিকে বিস্তর মালাকরের দোকান সজ্জিত। ভক্তগণ দলে দলে ঐ সকল দোকান হইতে সাধ্যমত পত্রপুষ্প এবং মালা সংগ্রহ করিয়া ভক্তিভরে মা-মা-রবে সেই ফটকের ভিতর প্রবেশ করিতেছেন, তদ্দর্শনে বন্ধু বলিলেন, যে মুম্বাদেবীর বিষয় আপনাদিগকে পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, এই ফটকই সেই দেবী দর্শনের প্রবেশ পথ। বোম্বে সহরের অধিষ্ঠাত্রী মুম্বাদেবীর দর্শন পথের পরিচয় পাইয়া আমরা সদলে ঐ ফটক পার্শ্বস্থিত মালাকরের দোকান হইতে পত্র পুষ্প ও মালা খরিদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

প্রথমেই একটী চারি ধার বাঁধান বিস্তৃত জলাশয় দেখিতে পাইলাম। এই জলাশয়ের চারিদিকে চারিটী বাঁধা ঘাট শোভা পাইতেছে, তাহার মধ্যস্থলে এক প্রকাণ্ড রক্ত বর্ণের ধ্বজ-পতাকা বায়ুভরে উড্ডীয়মান হইয়া ভক্তদিগকে দেবীচরণে ভক্তিদান করিতে উপদেশ দিতেছে। জলাশয়ের চতুর্দ্দিকে পরিশ্রান্ত যাত্রীদিগের শান্তিলাভের নিমিত্ত বিশ্রাম বেদী। এই সকল প্রস্তরময় বিশ্রামবেদীর এক পার্শ্বে একটী সমীবৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত আছে। তৎপরে আবার একটী প্রশস্ত দ্বার, ঐ দ্বার মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়াই দক্ষিণদিকে শ্বেতপ্রস্তরময় একটী চত্বর পাইলাম, সেই চত্বরের পশ্চাদ্ভাগে মুম্বাদেবীর পীঠস্থান।

এখানে দুইটী প্রকোষ্ঠ দর্শন পাওয়া যায়, ইহার একটীতে রৌপ্য সিংহাসনোপরি পীতবরণী প্রতিষ্ঠিত অষ্টভুজা মূর্ত্তি, অপরটীতে পাতালগর্ভে অঙ্গবিহীনা রক্তবরণী পাষাণময়ী মুম্বাদেবী দেদীপ্যমান। এই

স্থানে ভক্তগণের জনতা অধিক দৃষ্ট হয়। পুষ্পমাল্য হস্তে আমাদের ন্যায় কত ভক্ত কাতারে কাতারে এই স্থানে গললগ্নীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে মায়ের শ্রীচরণ উদ্দেশে মাথা নীচু করিতেছেন এবং মনের বাসনা মানতসহকারে ঐ সকল পুষ্পমাল্য প্রদান করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখানকার এই প্রেমময় ভক্তিরসপূর্ণ দৃশ্য দর্শন করিলে পাষাণ-প্রাণেও ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। বলাবাহুল্য, মায়ের চত্বর ও মন্দিরাভ্যন্তরটী বিচিত্র-কারুকার্য্যশোভিত থাকিয়া বোম্বে সহরের শিল্পী-দিগের নৈপুণ্যতা প্রকাশ করিতেছে। চত্বরের উপর দেবীর বাহন, (এক সিংহ মূর্ত্তি) তাহার সম্মুখেই হোম স্থান, হোম স্থানের সম্মুখে আবার একটী বিস্তৃত প্রাঙ্গন, সেই প্রাঙ্গণভূমির দরদালানের এক ধারে গণেশ, হনুমান, মহাদেব ও ইন্দ্রাণী, অপরধারে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীনারায়ণের পবিত্র মূর্ত্তির দর্শন পাওয়া যায়। এখানকার এই দরদালানযুক্ত প্রাঙ্গণটী পার হইবামাত্র দেবালয়ের মূল প্রবেশ পথ দেখিতে পাইয়া আমরা সকলে ঐ দ্বার দিয়াই প্রশস্ত রাজপথে বহির্গত হইলাম। এইরূপে বোম্বে সহরের দেবদেবী এবং দ্রষ্টব্য স্থানগুলির শোভা দর্শন করিয়া এখান হইতে প্রভাসক্ষেত্রে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

বোম্বাই সহরের শেষ সীমায় গ্র্যাণ্ড রোড নামক ষ্টেশন হইতে সদলে ট্রেণে আরোহণপূর্ব্বক ৬০৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া যথা-সময়ে আমরা ভেলোয়ার নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,এখান হইতে তীর্থতীর অন্যূন তিন মাইল দূরে অবস্থিত; মধ্যে দুইবার দুই স্থানে কেবল আমাদিগকে ট্রেণ বদল করিতে হইয়া-ছিল।

ভেলোর সহরে ট্রাম ও টাঙ্গা গাড়ী আছে। যাত্রীগণ আপন আপন সুবিধানুসারে ঐ সকল গাড়ী ভাড়া করিয়া থাকেন। এখানকার

ট্রামগুলি ছোট ছোট, সুতরাং যাত্রীদিগের মোট পুটলি কোন কিছুই বহন করিতে পারে না; আবার ষ্টেশন হইতে যে ট্রামগুলি সহরমধ্যে যাতায়াত করে, উহা প্রভাস পত্তনের নির্দ্দিষ্ট প্রাচীর ফটক পর্য্যন্ত যায়। এই দুই মাইল পথ অতিক্রম করিতে প্রত্যেক যাত্রীকে ৵১৫ ভাড়া দিতে হয়। ট্রামে যাইলে যাত্রীদিগকে তথা হইতে আবার এক মাইল হাঁটা পথ অতিক্রম করিয়া তীর্থতীরে পৌঁছিতে হয়। এই সকল নানাপ্রকার অসুবিধা দর্শনে আমরা ট্রামের পরিবর্ত্তে দুইখানি টাঙ্গা গাড়ী ষ্টেশন হইতে তীর্থতীরের ধর্ম্মশালায় যাইবার নিমিত্ত ৸০ আনা হিসাবে ভাড়া ধার্য্য করিলাম। জব্বলপুরের ন্যায় এখানেও একখানি টাঙ্গা গাড়ীতে তিনজন আরোহী বহন করিবার নিয়ম আছে। আমাদের দলে চারি-জন লোক এতদ্ভিন্ন বিছানা, তোরঙ্গ প্রভৃতি যে সমস্ত মোট পুটলী ছিল, ঐ সমস্ত দ্রব্যগুলি টাঙ্গা গাড়ীতে বোঝাই করিয়া নির্ব্বিঘ্নে এখানকার কত প্রাচীন হর্ম্মরাশিশোভিত অপ্রশস্ত রাজপথের শোভা দর্শন করিতে করিতে প্রভাস তীর্থতীরের ধর্ম্মশালার পাদপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম।

পূর্ব্বে এখানে যাত্রীদিগের বিশ্রামের নিমিত্ত কোনরূপ আশ্রয় স্থান না থাকায়, বোম্বাই সহরের প্রসিদ্ধ ভাটিয়া-বণিক সদা৹৹ "বসনজী মন্দজী" মহাশয় অকাতরে বহু অর্থ ব্যয়সহকারে এই পাকা ধর্ম্মশালাটী নির্ম্মাণ করাইয়া যাত্রীদিগের কত উপকার করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে কত পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কারণ এখানকার এই আশ্রয়হীন তীর্থ স্থানে বিনা ব্যয়ে একাধিক্রমে তিন-চারি রাত্রি এইরূপ সুন্দর ধর্ম্মশালাতে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তভাবে বাস করিতে পাইলে, কোন্ কৃতজ্ঞপ্রাণ না ভগবানের নিকট এই আশ্রয়দাতার মঙ্গল কামনা করিবেন? ভারতের যত দেশ-বিদেশ বিশেষতঃ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ

অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিবেন, গুজরাটী ও ভাটিয়া-বণিক্‌দিগের এইরূপ কীর্ত্তি স্তম্ভ সকল ততই সংস্থাপিত দেখিতে পাইবেন।

প্রভাস—প্রাচীরবেষ্টিত একটী পুরী। এই পুরীমধ্যে প্রবেশকালে একদিকে যেমন হর্ম্ম্যরাজিশোভিত রাজপথগুলি নয়নগোচর করিয়া সুখী হইলাম, অপরদিকে সেইরূপ চট্টগ্রামের ন্যায় চারিদিকেই মুসলমান অধিবাসীতে পরিপূর্ণ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। কারণ যে প্রভাস হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ বলিয়া কথিত, যথায় চারিযুগেই ভগবান্‌ সোমনাথ জ্বলন্ত সাক্ষীরূপে বিরাজিত, যে সোমনাথের নামে পুণ্যসঞ্চয় হয়, যে দেবের অতুল-ঐশ্বর্য্যের বিষয় আবালবৃদ্ধ সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, যে দেবের দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া কত দূর-দেশান্তর হইতে দলে দলে কাতারে কাতারে হিন্দু ভক্তগণ পুণ্যসঞ্চয়ের আশায় আসিয়া থাকেন, সেই পবিত্র স্থান মুসলমান বসতিতে পরিপূর্ণ দেখিলে কোন্‌ হিন্দু না বিচলিত হইবে।

ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইবামাত্র যে সকল পাণ্ডা এখানে আছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রাচীন ব্রাহ্মণকে আমাদের সঙ্গী বন্ধু তীর্থগুরু পাণ্ডা পদে মান্য করিলেন। এই পাণ্ডার নামটী যেমন লম্বা চওড়া "রঘুনাথজী পুরুষোত্তম পুছুওয়া", আকৃতি ও তাঁহার সেইরূপ সুন্দর আর্য্য লক্ষণযুক্ত, ঠিকানা—ভাটোয়াজ প্রভাস। তাঁহাকে দর্শনমাত্র ভক্তির উদ্রেক হইতে লাগিল, পরিচয়ে জানিলাম—তাঁহারা পুরুষানুক্রমে এখানে পাণ্ডাবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। তখন মনে মনে বুঝিলাম, পুরাকালের সেই পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রভাস যজ্ঞের ব্রতী—পবিত্রাত্মা ব্রাহ্মণের ইনিই একজন বংশধর, সুতরাং কোন্‌ পাষণ্ডের না তাঁহার দর্শনে ভক্তির উদয় হইবে?

যে দিবস আমরা তথায় উপস্থিত হইলাম, সে দিবস একে পথভ্রমণে

কাতর—তাহার উপর বেলা অতিরিক্ত হওয়াতে উক্ত পাণ্ডার উপদেশ মত বিশ্রাম করিতে মনস্থ করিলাম। প্রভাসক্ষেত্রে আহারীয় খাদ্য দ্রব্যের কোন অভাব নাই। পর দিবস প্রত্যুষে যথাসময় যথানিয়মে এথানকার তীর্থ কার্য্যগুলি সম্পন্ন করাইবার জন্য পাণ্ডা ঠাকুরকে অনুরোধ করিলে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রভাসের পবিত্র ত্রিবেণী গঙ্গায় স্নান, তর্পণাদি সম্পন্ন করাইতে যাত্রা করিলেন। এই সময় তিনি আমাদিগকে বলিলেন, আপনারা পঞ্চরত্ন বা তীর্থক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্ত যদ্যপি কোনরূপ দ্রব্যসম্ভার আনিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ সকল সামগ্রীগুলি বাহির করুন, তখন আমাদের সঙ্গী বন্ধুটী বলিলেন, "গুরুজি! আমাদের নিকট স্নানের নিমিত্ত গামছা, পঞ্চরত্ন আর দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে কেবল মূল্য ব্যতীত অপর কোন কিছুই নাই। এ তীর্থে যাহা কিছু আবশ্যক, আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের দেয় মূল্য হইতে সেই সকল সংগ্রহ করিলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব। তিনি একবার তখন মৃদু হাস্যসহকারে আমাদের মূল্য হইতে একে একে সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লইলেন।

ধর্ম্মশালা হইতে বহির্গত হইলে তিনি অগ্রগামী হইয়া ব[illegible]র এক প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে উপস্থিত হইলেন; যথায় শিবমন্দির স্থাপিত, যে মন্দিরাভ্যন্তরে তীর্থনাথ ভগবান মস্কেলেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি দেদীপ্যমান। পুরোহিত ঠাকুর এই স্থানে আমাদিগকে বলিলেন, এক্ষণে আপনাদিগকে এই বটবৃক্ষমূলের শীতল ছায়ায় তীর্থনাথের সম্মুখে বসিয়া প্রভাস স্নানার্থে পঞ্চরত্নাদিসহ সঙ্কল্প দ্বারা প্রত্যেককে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মস্কেলেশ্বরদেবকে সাক্ষ্য রাখিতে হইবে। তিনি যেরূপ আদেশ করিলেন, পুণ্যসঞ্চয়ের নিমিত্ত আমরা সকলে নতশিরে তাহাই পালন করিয়া

নেপালী-খাটোলীর দৃশ্য।

[১৯৫ পৃঃ
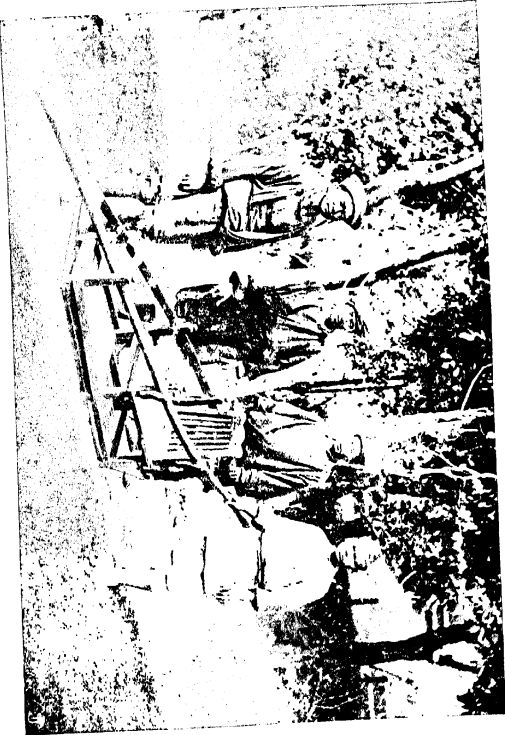
স্নান ক্রিয়া সম্পন্ন করিলাম। ইহার পর তাঁহার সহিত সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান, যাহা যাদবদিগের মহাশ্মশান নামে কথিত,সেই দশ কোটী তীর্থের সম্মিলন স্থান—যে স্থান "প্রভাস সঙ্গমতীর্থ" নামে প্রসিদ্ধ ; যে তীর্থে সতত ত্রিবেণীগঙ্গা বিরাজিতা,যে পুণ্যময় স্থানে এই ত্রিবেণীগঙ্গার সহিত মহা পাপক্ষয়কারিণী পঞ্চনদীর সহিত সাগরের সঙ্গম হইয়াছে, অর্থাৎ ত্রিবেণীগঙ্গায় পুণ্যতোয়া হিরণ্যা, ব্রজনি, লঙ্কোবতী, কপিলা ও সরস্বতী এই সকল পুণ্যতোয়া পঞ্চনদী যথায় একত্র হইয়া সাগরের সহিত মিলিতা হইয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই সকল নদীগুলি সমুদ্রতীরবর্ত্তী হইলেও স্থানমাহাত্ম্যগুণে ইহাতে তরঙ্গ ভঙ্গ কোন কিছুই দেখিতে পাইলাম না, যেন তাঁহারা পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অভাবে এক মনে স্থির ভাবে তাঁহারই বিষয় চিন্তা করিতেছেন। সে যাহা হউক, যথায় এক একটী স্রোতস্বিনী—তাহার মাঝে মাঝে এক-একটী চর ; ঐ সকল চরে যে সমস্ত পুণ্য নদীর দর্শন পাইলাম, তাঁহাদের গভীরতা সামান্য—অধিকন্তু সমুদ্র সংস্পর্শে এই সকল নদীর জল আস্বাদে লবণাক্তময় হইয়াছে। পাণ্ডাজীর উপদেশ মত আমরা সকলে একে একে এই সকল পুণ্যতোয়া নদীর জলে স্নান,কোনটীর বা জল স্পর্শ করিয়া এই শ্মশানক্ষেত্র হইতে পুনরায় মঙ্কেলেশ্বরের মন্দিরের নিকট, যথায় সর্ব্বপ্রথমে বসিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, সেই পবিত্র স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পুরোহিত ঠাকুর এই স্থানেই পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধের আয়োজন করিলেন। শ্রাদ্ধকালে সেই প্রাচীন আর্য্যলক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণের মুখে সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। এইরূপে এখানে পিতৃ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহী প্রভৃতি সমষ্টিতে বারটী পিণ্ডদান করিলাম, তৎপরে শান্তিবারি গ্রহণ করিয়া পবিত্রদেহে নিকটস্থ মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবান মঙ্কেলেশ্বর মহাদেবের পূজার্চ্চনাপূর্ব্বক মহাব্রত উদ্যা-

পন করিলাম। তৎপরে তথা হইতে বিশ্রামের নিমিত্ত ধর্ম্মশালাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

প্রভাস তীর্থে শ্রাদ্ধান্তে সাধ্যমত দান করিতে হয়, কারণ স্বয়ং ভগবান সদলে এই তীর্থে উপস্থিত হইয়া মানবদিগকে দান করিবার শিক্ষা দিবার নিমিত্তই স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর পরিমাণে দানে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য, এই অপার্থিব জীবনে যে স্থানের ধূলিরেণু কণামাত্র দর্শনও স্বপ্নাতীত বলিয়া মনে হয়, সেই তীর্থে উপস্থিত হইয়া কর্ত্তব্যবোধে সেবকগণ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে যেন কেহ কখনও কুণ্ঠিত না হন।

যে প্রভাসের পবিত্র তটে যুগে যুগে কত শত ঋষি ও তপস্বী তপ, জপ এবং হোমযজ্ঞ সমাধা করিয়া কঠিন ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, যথায় যদুনাথ মানবদিগের মঙ্গলের জন্য মদমত্ত ষট্‌পঞ্চাশৎ কোটি যদুকুল ধ্বংস করিয়াছিলেন, যে প্রভাস—সাধুদিগের একমাত্র পরিত্রাণ স্থল, যথায় মানবদেহধারী পরমেশ্বর স্বয়ং যোগে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন, যে তীর্থে শাপগ্রস্ত সোমদেব স্বয়ং ওষধিপতি হইয়া তপস্যাপূর্ব্বক রোগমুক্ত হইয়াছিলেন, মানবদেহ ধারণ করিয়া সেই তীর্থের সেবা করা কি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে হয় না?

প্রভাস মাহাত্ম্যে দেখিতে পাওয়া যায়—"প্রভাসে যাদবশ্রেষ্ঠ পঞ্চস্রোতাঃ সরস্বতী"। এখানকার এই নির্দ্দিষ্ট তীর্থ স্থান ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সপ্ত ক্রোশব্যাপী স্থান সমূহ যাদবস্থলী নামে প্রসিদ্ধ। সমুদ্র তীরবর্ত্তী যে শ্মশানক্ষেত্রে পূর্ব্বে আমরা গিয়াছিলাম, যথায় পঞ্চনদীর সহিত সাগরের সঙ্গম হইয়াছে—সেই সঙ্গমস্থলের সন্নিকটেই কর্ম্মসূত্রে মানবদেহধারী পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। এখানকার এই শ্মশানক্ষেত্রতেই কৃষ্ণসখা তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন নিহত

যাদবদিগের পিণ্ড জলাদি প্রদান করিয়া সখ্যভাবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এই শ্মশান স্থানেই শ্রীকৃষ্ণের, বলদেবের ও প্রদ্যুম্নের পত্নীগণ আপনাপন ভর্ত্তার মৃতদেহ আলিঙ্গনসহকারে চিতারোহণ করিয়াছিলেন, আবার এই স্থানেই সাধ্বীসতী রুক্মিণীদেবী জলন্ত চিতানলে প্রবেশ করিয়া জগতের সতীদিগকে সহমরণের শিক্ষাদান করিয়া তিনি বৈকুণ্ঠধামে প্রয়াণ করিয়াছিলেন; প্রভাসের এই স্থানের সমুদ্রতীর হইতেই জরাব্যাধ মৎস্য গর্ভস্থিত তরঙ্গ ধৌত মুষলাবশিষ্ট চূর্ণ সংগ্রহ করিয়া শাপগ্রস্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রাণঘাতী শর নির্ম্মাণ করিয়াছিল; সোমদেব এই পবিত্র স্থানের মাহাত্ম্য অবগত হইয়াই সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া এক মনে এক প্রাণে মুক্তি কামনাপূর্ব্বক, অযুত বৎসর মৌনভাবে উর্দ্ধমুখে এক পদে শঙ্করের তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই স্থানেই সেই সোমদেব শাপমুক্ত এবং কান্তিমান্ হইয়া প্রভান্বিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া এ ক্ষেত্র প্রভাস তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট এই পবিত্র স্থানের নাম ভিন্ন ভিন্নরূপে শুনিতে পাওয়া যায়, যথা;—দেবপত্তন, সোমনাথপত্তন, আবার কাহারও কাহারও নিকট ইহা প্রভাসপত্তন নামে পরিচিত হইয়াছে।

যাদবস্থলীর আদি বৃত্তান্ত

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধান্তে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজ্য প্রাপ্তির পর ষড়বিংশ বর্ষের প্রারম্ভে দ্বারকাপুরে নানাবিধ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল, তখন সাধ্বীসতী গান্ধারীর অভিশাপের পূর্ণকাল উপস্থিত বিবেচনা করিয়া দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হে যাদব

শ্রেষ্ঠগণ! সম্প্রতি এখানে যে সকল মহোৎপাত দৃষ্ট হইতেছে, ইহাতে কি তোমরা বুঝিতেছ না, যে এ সকল অমঙ্গলের চিহ্ন? আমার বিবেচনায় এ স্থানে মুহূর্ত্তকাল আর আমাদের অবস্থান করা উচিত হইতেছে না, তিনি আরও বলিলেন, দ্বারকায় যে সমস্ত বৃদ্ধ, বালক ও পুরমহিলাগণ অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা সকলে শঙ্খোদ্ধার তীর্থে গমন করুন। আর তোমরা সকলে আমার সহিত প্রভাস-তীর্থে আইস—ঐ পুণ্য স্থানে প্রভাস-স্বামী ভগবান সোমনাথের দর্শন করিয়া আমরা সকলে স্নান, দানাদি দ্বারা পবিত্র হইয়া বিবিধ উপচারে দেবগণের অর্চ্চনা করিব।"

বিশ্বচক্রি বাসুদেবের আন্তরিক ভাব কেহই জানিতে পারিলেন না, সুতরাং তাঁহার উপদেশ মত সকলেই প্রভাস তীর্থে যাত্রা করিলেন, এবং স্নান, দানাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া মায়াময়ের ইচ্ছায় সকলেই একত্রে মধুপানে মত্ত হইলেন। কালের গতি কে রোধ করিতে পারে? শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় তাঁহারা সকলেই মোহিত, অর্থাৎ আত্মপর বিবেচনাশূন্য, ফলতঃ যাদবপতির ইচ্ছায় যথাসময়ে তাঁহারা একযোগে মহান্ কলহে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাপন কুলক্ষয় করিতে আরম্ভ করিলেন, এইরূপে সেই প্রলয়ঙ্কর সংগ্রাম সময় ক্রমশঃ তাঁহাদের অস্ত্র-শস্ত্র [illegible] নিঃশেষ হইল, তখন সমুদ্রতীরজাত "এরকা" নামক তৃণ সকল উত্তোলনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন, যে সকল খ্যাতনামা বীরগণের ইতিপূর্ব্বে অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয় নাই, এক্ষণে এই এরকাঘাতে তাঁহাদিগকে ভূমিতলে পতিত হইতে হইল। এইরূপে যদুকুল নষ্টপ্রায় হইলে বলরাম শ্রীকৃষ্ণের মায়া বুঝিতে পারিলেন এবং যোগবলাশ্বনে অপ্রকট হইলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের নিত্যধামে প্রবেশ অবলোকন করিয়া, তিনিও তেজোময় চতুর্ভুজরূপ ধারণ করতঃ মৌন-

ভাবে এক অশ্বত্থ তরুতলে উপবেশনপূর্ব্বক মনে মনে বালিপত্নী "তারার" অভিশাপের বিষয় ভাবিতেছেন,ইত্যবসরে জরা নামক ব্যাধ ভগবানের চরণকে মৃগবদনভ্রমে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিল, পরে সে এই রহস্য ভেদ করিলে আত্মকৃত অপরাধ ক্ষালনার্থ ভীতচিত্তে তাঁহারই চরণতলে পতিত হইয়া কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিল। ভক্তবৎসল ভগবান তখন মধুর বচনে জরাকে অভয়দানে বলিতে লাগিলেন, "বৎস! তোমার পরিতাপের প্রয়োজন নাই, ত্রেতাযুগে আমি ধরায় রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া বানররাজ বালিকে বিনা দোষে বিনাশ করিয়াছিলাম, সেই কারণে বালিপত্নী তারা—রোষভরে তাঁহারই পুত্রের হস্তে আমার প্রাণান্ত হইবে বলিয়া অভিশম্পাৎ প্রদান করেন,এই হেতু তুমি আমারই ইচ্ছায় মৃগবদনভ্রমে আমার চরণ বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছ, আমার ইচ্ছা ব্যতীরেকে তুমি কখনও এ কার্য্য সিদ্ধ করিতে সক্ষম হইতে না। তুমিই সেই বালি পুত্র এক্ষণে ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক আমার প্রাণান্ত করিয়া সতীবাক্য পালন করিয়াছ। আমাদের উভয়েরই নিত্যধামে যাইবার সময় হইয়াছে, অতএব আমার আশীর্ব্বাদে তুমি স্বর্গারোহণ কর। এইরূপে তিনি সেই প্রাণহন্তা জরাব্যাধকে স্বর্গে পাঠাইয়া আপন মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন।

এদিকে দারুক ভগবানের অদর্শনে ভয় বিহ্বলচিত্তে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "প্রভো! এ আবার কি লীলা, দয়াময়! ভক্তবৎসল হরি! ক্ষণেক তোমার রাঙ্গাচরণ দু'খানি দর্শন না পাইয়া যে আমার দৃষ্টি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে।" তখন শ্রীকৃষ্ণ দারুক সারথীকে আশ্বাস প্রদানে তাহারই দ্বারা যদুকুল ধ্বংসের সংবাদ দ্বারকাপুরে প্রেরণ করিলেন, অধিকন্তু তাহাকে সবান্ধবে তাঁহারই পিতামাতার সহিত অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন

করিতে আদেশ করিলেন, কেন না শ্রীকৃষ্ণবিহীন যদুপুরী শীঘ্রই সাগরে প্লাবিত হইবে, এইরূপ উপদেশও প্রদান করিলেন।

বলাবাহুল্য, সারথী ভগবানের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে অস্থিরচিত্তে দ্বারকায় উপস্থিত হইয়াছিল। এদিকে দেখিতে দেখিতে গরুড়-ধ্বজরথ সমাগত হইল, যোগাচার্য্য অব্যয় ভগবান আত্মাতে আত্মা যোজনপূর্ব্বক কমল নয়ন মুদ্রিত করিলেন এবং আগ্নেয় যোগ ধারণা দ্বারা নিজ দেহকে দগ্ধ না করিয়াই গোলকধামে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন দ্বারকায় দারুক প্রমুখাৎ এই নিদারুণ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শোকে অধীর হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের আদেশমত যদুকুল-ললনা, বালক এবং বৃদ্ধদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রভাসক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া নিহত নষ্ট বংশ বন্ধু সকলের নামোল্লেখপূর্ব্বক যথানিয়মে পিণ্ড জলাদি প্রদান করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন।

এরকা বৃত্তান্ত

দ্বারকার নিকটবর্ত্তী পিণ্ডারক নামক তীর্থ স্থানে যদুগণ কৌতুক ছলে কৃষ্ণ পুত্র শাম্বদেবকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত ও তাঁহার কৃত্রিম [illegible] রচনা করিয়া সমাগত বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদাদি ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করি-লেন, মহর্ষিগণ! বভ্রুর এই পত্নী কি প্রসব করিবে, গণনা করিয়া বলুন, দেখি?"

ঋষিগণ যদুগণের আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এ তোদের কুল-নাশক মুষল প্রসব করিবে।"

পর দিবস প্রাতে শাম্ব যথার্থই মহর্ষিদিগের বাক্যানুসারে এক লৌহময় মুষল প্রসব করিলেন, তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ পিতামহ বৃদ্ধ উগ্রসেন

ঐ মুষলটী চূর্ণ করাইয়া সমুদ্র গর্ভে নিক্ষেপ করাইলেন, মায়াময়ের মায়াপ্রভাবে ঐ চূর্ণ মুষলগুলি তরঙ্গনিকর দ্বারা ইতস্ততঃ চালিত হওয়াতে বেলাভূমে সংলগ্ন হইয়া এরকাতৃণে পরিণত হইল, অবশিষ্ট চূর্ণ মুষল এক মৎস্য গ্রাস করিয়াছিল, লীলাময় আপন লীলা প্রকাশ করিবার জন্য ধীবর কর্ত্তৃক ঐ মৎস্যকে ধরাইয়া তাহার উদরগত লৌহ, জরা নামক এক ব্যাধের হস্তগত করাইলেন, ব্যাধ সেই লৌহ হইতে মৃগবধার্থে তীর প্রস্তুত করিল, কর্ম্মসূত্রের দ্বারা পরিচালিত হইয়া জরা ব্যাধ, সেই তীরের সাহায্যেই মৃগমুখ ভ্রমে ভগবানের চরণ বিদ্ধ করিয়া সতী বাক্য পালন করিয়াছিল, সুতরাং বলিতে হইবে—মহর্ষিগণের অভিশাপেই মুষলের সৃষ্টি, আর সেই চূর্ণ মুষল হইতেই এরকার উৎপত্তি।

পর দিবস প্রাতে যথাসময়ে গুরুজী আমাদিগকে লইয়া প্রভাসের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির শোভা দেখাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন, আজ্ঞা প্রাপ্তে আমরা সকলে প্রস্তুত হইয়া ধর্ম্মশালা হইতে বহির্গত হইয়া দুইখানি টাঙ্গা গাড়ী ভাড়া করিলাম, স্থানীয় নিয়মানুসারে প্রতি মাইল প্রতি যাত্রীর ৵১৫ হিসাবে টাঙ্গার ভাড়া ধার্য্য হইল। পাণ্ডার উপদেশ মত সর্ব্বপ্রথমেই আমরা প্রাচী সরস্বতী নামক তীর্থ স্থানে যাত্রা করিলাম, ধর্ম্মশালা হইতে এই স্থান সাত ক্রোশ দূরে অবস্থিত। টাঙ্গাচালকেরা তথায় পৌছিয়াই বলিল, বাবু! লিখিয়া রাখুন, প্রথম যাত্রায় আমাদের চৌদ্দ মাইলের ভাড়া পাওনা হইল। এখানে এক কুণ্ড মধ্যে ভগবান মাধবরাও ও লক্ষ্মীদেবীর পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। ইহার সন্নিকটে যে এক মহাদেব মূর্ত্তি স্থাপিত আছে, সেই মূর্ত্তির দর্শন ও পূজার্চ্চনা করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করিলাম, তৎপরে প্রথমোক্ত কুণ্ড হইতে কিছু জল লইয়া পাণ্ডার উপদেশ মত স্থানীয় অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে সিঞ্চন করতঃ এখনকার নিয়মগুলি পালন করিলাম।

তৎপরে এখান হইতে ভালকা কুণ্ডে যাত্রা করিবার জন্য পাণ্ডা ঠাকুর টাঙ্গা চালকদিগকে আদেশ করিলেন।

ভালকা কুণ্ড

প্রাচী সরস্বতী নামক স্থান হইতে ভালকা কুণ্ড অনূ্যন ১৭ মাইল দূরে প্রভাস-পত্তন ও ভেরোয়াল বন্দরের মাঝামাঝি পথে বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে বটবৃক্ষাদিবেষ্টিত একটী নির্জ্জন ও রমণীয় স্থান। ভালকা কুণ্ড নামক স্থানের চারিদিকে জনমানবশূন্য প্রান্তর, মধ্যে চিত্তরঞ্জন বটবন, ঠিক যেন সংসারমরুর ভিতর শান্তি-নিকেতন! ইহারই মধ্যভাগে মৃৎ-প্রাচীরবেষ্টিত এক প্রাচীন অশ্বত্থমূলের পাদদেশে বাঁধান বেদী! এখানকার স্থানমাহাত্ম্যগুণে মনে যেন এক নূতন ধরণের ভাব উদয় হইতে লাগিল। এই স্থানটীকে বনাশ্রমের সহিত তুলনা করিলে অত্যুক্তি হয় না। পাণ্ডাজী সেই বেদী স্থানে উপস্থিত হইয়াই আবেগ-ভরে অশ্রুপূর্ণনয়নে বেদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদিগকে বলিতে লাগিলেন, "ভক্তগণ! একবার এই স্থানটী দর্শন কর, ইহাই সেই মহা স্থান, অর্থাৎ এই মহা শ্মশানভূমিই পৃথিবীর স্বর্গধাম ভালকা কুণ্ড! মহাভারতে যে অশ্বত্থবৃক্ষের বিষয় পাঠ করিয়াছ, তোমাদের সম্মুখ-ভাগে এই সেই প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ দণ্ডায়মান থাকিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, এই নিমিত্তই ইহার মূল স্থানটী বেদী-রূপে বাঁধান হইয়াছে। এই তরুমূলেই যাদবপতি শ্রীকৃষ্ণ শায়িত হইলে জরাব্যাধ-শরে পদবিদ্ধ এবং সমাধিস্থ হইয়া তাঁহার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।" পাণ্ডা প্রমুখাৎ এই সকল বাক্য নিঃসরণ হইবামাত্র আমাদের হৃদয় যেন আবেগবশে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তখন মহা-

ভারতের সেই প্রাচীন পুণ্য কথা হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল,—সঙ্গী বন্ধুটী প্রেমভরে এই পুণ্য ক্ষেত্রে সেই সময় লুটাইয়া পড়িলেন, তাঁহার দেখাদেখি আমরাও সকলে লুটাইলাম। কৃষ্ণপ্রেমে নয়নে দরদরধারা বহিতে লাগিল—সকলেই নিস্তব্ধ, শান্ত, আবার সকলকার দৃষ্টি সেই প্রাচীন অশ্বত্থ তরুমূলের দিকে—পাণ্ডাজীকে একবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "গুরো! যদি এই সেই মহা স্থান, তাহা হইলে দেখান প্রভো! এখানে কোন্ স্থানে তাঁহার সেই পরিত্যক্ত পীত বসন, কোথায় সেই শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিশ্বরূপে বিশ্বেশ্বর! তাঁহার অঙ্গ চিহ্ন সকল কোথায় আছে, কোথায় সেই সুমঙ্গল সুন্দর সুনীল চিকুর পাশ! কোথায় তাঁহার মকর কুণ্ডল! কোথায় তাঁহার বনমালা! কোথায় তাঁহার কটিসূত্র! কোথায় তাঁহার ব্রহ্মসূত্র! কোথায় তাঁহার কিরীট! কোথায় তাঁহার নূপুর! কোথায়ই বা সেই একমাত্র ভবপারের কাণ্ডারীর মৃগমুখাকৃতি কোকনদ সদৃশ পদযুগল চিহ্ন! আর কোথায়ই বা তাঁহার সেই ক্ষতপদ কোকনদে রুধির ধারা। ব্রাহ্মণ! যদি আমরা পাপ চক্ষে এই পুণ্য স্থানেও সেই সকল চিহ্ন দর্শন না পাই, তাহা হইলে যে ভক্ত-বৎসল নামে তাঁহার কলঙ্ক হইবে প্রভু! গ্রহবশতঃ যদি আমরা একান্তই এ সকল কোন চিহ্নই দর্শন না পাই, তবে দেখাও প্রভো! কোথায় তাঁহার সারথী দারুক, কিম্বা কোথায় বা তাঁহার প্রাণহন্তা জরা ব্যাধ অবস্থান করিতেছে? তাঁহার ভক্তদিগের দর্শনেও যে সমান ফললাভ করিতে সমর্থ হইব গুরুজি!"

পাণ্ডাজী আমাদের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া আশ্বাস প্রদান করিয়া বলি-লেন, তোমাদের ন্যায় ভক্তিমান ও বুদ্ধিমান যজমানদিগকে তাঁহার সমস্ত লীলা চিহ্নই একে একে দর্শন করাইয়া আমি চরিতার্থ হইব, সন্দেহ নাই। আমার উপদেশ মত তোমরা কেবল এক মনে এক প্রাণে

সেই পরম পুরুষ সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ ধ্যান কর—ইহারই ফলে তোমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইবে। উপস্থিত এই পুণ্যক্ষেত্রের ধূলিকণা মস্তকে ধারণ করিয়া এখান হইতে আমার সহিত ধীরে ধীরে অগ্রসর হও।

পদম কুণ্ড

ভালকা কুণ্ডের সন্নিকটে এবার পদম কুণ্ডে উপস্থিত হইলাম। পাণ্ডাজী বলিলেন, এই স্থানেই সেই জরা ব্যাধ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ বিদ্ধ হইয়া রক্তাক্ত চরণ-কমল ধৌত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত এই কুণ্ডটী পদম কুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। এই পবিত্র কুণ্ডটার চারিদিকে সোপানশ্রেণী প্রস্তর দ্বারা বাঁধান, মধ্যে ভগবান ও লক্ষ্মীদেবীর বিগ্রহ মূর্ত্তি স্থাপিত থাকিয়া ভক্তদিগকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন। এই সেই পবিত্র মূর্ত্তি—যিনি জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত সাধ্বীসতী গান্ধারীর শাপে নটের ন্যায় যাদবগণের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যুবেশ ধারণ করিয়া লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। এইরূপে এখানকার এই সকল পবিত্র দর্শনীয় স্থান সকল দেখিয়া বেলা অপরাহ্ন হওয়াতে সেদিনকার মত বাসাবাটী (ধর্ম্মশালায়) প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

পর দিবস যথাসময়ে পাণ্ডার সহিত স্থানীয় দেবালয়গুলির দর্শন অভিলাষ করিলে তিনি বলিলেন, অদ্য অগ্রে আপনাদিগকে লইয়া প্রাচীন সোমনাথের ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরের শোভা দর্শন করাইব, তৎ-পরে নূতন সোমনাথের মন্দিরে যাইব; কেন না প্রাচীন মন্দিরটী সমুদ্রতীরবর্ত্তী সাগরসঙ্গমের উপরিভাগে অবস্থিত। পাণ্ডা ঠাকুর আরও বলিলেন, ইতিপূর্ব্বে আপনারা যেরূপ যাদবদিগের মহাশ্মশান দেখিয়া-

ছেন, এবার সেইরূপ সোমনাথের কঙ্কালাবিশিষ্ট ভগ্ন মন্দিরের শোভা দর্শন পাইবেন।

ধর্ম্মশালা হইতে বহির্গত হইয়া শ্মশানভূমির তীর দিয়া ক্রমান্বয় অতিক্রম করিতে করিতে প্রাচীন সোমনাথের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এ পথে বেলাভূমিতে কেবল নিবিড় বিন্যস্ত দূরবিস্তারী বালুকারাশি বর্ত্তমান থাকায় অতিক্রম করিবার সময় কোনরূপ কষ্ট-বোধ হয় না। এখানে সেই জগদ্বিখ্যাত মন্দিরের যে ধ্বংসাবশিষ্ট চিহ্ন গুলি দর্শন করিলাম, তাহারই কারুকার্য্য দর্শনে মোহিত হইলাম। মন্দির স্থানের পশ্চিমে অনন্ত সমুদ্র, অপর তিনদিক প্রাচীরবেষ্টিত। সে যাহা হউক, এখানে মন্দিরের পরিবর্ত্তে কেবল মন্দিরের নিম্নদেশ দর্শন পাইলাম, তাহারও কোন স্থানের প্রস্তর খসিয়াছে, কোন স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দির কঙ্কালের ভিত্তির উপর অদ্যাপি যে সকল অদ্ভুত অদ্ভুত কারুকার্য্য খোদিত দেখিলাম, উহাতেই সকল পরিশ্রমের সার্থক বিবেচনা করিলাম। কি সুন্দর লতা-পাতা, কি সুন্দর ফল-ফুল অঙ্কিত, পূর্ব্বে ইহাতে যে সমস্ত দেবদেবী মূর্ত্তি খোদিত ছিল,অদ্যাপি এই ধ্বংসাবস্থায়ও ইহাতে সেই সকল মূর্ত্তিগুলির কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল মূর্ত্তি-গুলির কারুকার্য্যই বা কিরূপ সুন্দর। এই প্রাচীন সুন্দর উচ্চ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ প্রস্তর খণ্ডগুলি অদ্যাপি সমুদ্রতীরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

মন্দির সম্মুখস্থ সমুদ্রতীরে বিচরণ করিবার সময় এক স্থানে একটী বালির উচ্চ স্তম্ভ দেখাইয়া পাণ্ডা ঠাকুর বলিলেন, নগরবাসীর মঙ্গলের জন্য এই সাগরতীরে প্রতি বৎসর মহা নবমীর রাত্রিতে যে মহা হোম

হয়, ঐ স্তম্ভ স্থানটীই সেই হোম স্থানের চিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখানে এই মাঙ্গলিক হোমের সময় প্রভাস সহরের যাবতীয় প্রজা কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, এমন কি মুসলমান স্ত্রী পুরুষগণ পর্য্যন্ত ইহার এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এই উৎসব—এ ক্ষেত্রে এক মহামারী ব্যাপার।

নূতন সোমনাথ মন্দির

প্রভাসের প্রাচীন মন্দিরটী ধ্বংস হইবার পর মহারাষ্ট্রীয়া মহারাণী প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যা বাই সোমনাথের এই নূতন মন্দিরটী নির্ম্মাণ করাইয়া এক লিঙ্গ মূর্ত্তি স্থাপনাপূর্ব্বক আপন কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরাভ্যন্তরে পাতাল গহ্বরে সোমনাথ নামক লিঙ্গ মূর্ত্তি স্থাপিত। মন্দিরের পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্ঠে গঙ্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, পার্ব্বতী ও নন্দী-কেশ্বরের মূর্ত্তি দর্শন পাওয়া যায়। এই সুন্দর নূতন মন্দিরটী প্রাচীন সোমনাথের মন্দিরের নিকট সমুদ্রতীর হইতে অল্প দূরে পল্লীর মধ্যে অবস্থিত। এইরূপে প্রাচীন ও নূতন সোমনাথের মন্দির শোভা দর্শন করিয়া পল্লীর ভিতর ধর্ম্মশালাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। পথি-মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে এক বাজারের ভিতর প্রবেশ করিয়া ক্রমে জুম্মামসজিদের পার্শ্বদেশ অতিক্রমপূর্ব্বক প্রভাসপত্তনের প্রাচীর দ্বারের মধ্যপথ ভেদ করিয়া রাজপথে উপস্থিত হইলাম, ইহারই মধ্যে অসংখ্য কবর স্থান বিরাজিত। পাণ্ডা ঠাকুর বলিলেন, পূর্ব্বে অর্থাৎ ১০২৪ খৃষ্টাব্দে যখন সুলতান মামুদ এই পুরী আক্রমণ করেন, তখন তাঁহার নিহত সৈন্যগণকে ঐ সকল স্থানে কবর দেওয়া হয়; সুতরাং বলিতে হইবে, ঐ সকল কবর স্থান অদ্যাপি এখানে বর্ত্তমান থাকিয়া সুলতান মামুদের জয় ঘোষণা করিতেছে।

সোমদেব

সোমদেব দক্ষ প্রজাপতির সপ্তবিংশতি কন্যাদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রোহিণী নামা ভার্য্যার অপরূপরূপলাবণ্য এবং যত্নে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহারই উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আসক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে তাঁহার অপরাপর পত্নীরা ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া পিতা দক্ষের আলয়ে আসিয়া আপনাপন দুর্ভাগ্যের বিষয় জ্ঞাপন করিলেন, তৎশ্রবণে প্রজাপতি ভাবিলেন, স্বামী বর্ত্তমান থাকাতে উপযুক্ত কন্যাদিগকে আপন আলয়ে স্থানদান বিধিসঙ্গত নয়, সুতরাং তিনি স্নেহসহকারে তাহাদিগকে নানারূপে সান্ত্বনাপূর্ব্বক সোম সকাশে প্রেরণ করিলেন, অধিকন্তু উপদেশ দিলেন যে, রোহিণী যেরূপ যত্নে স্বামীকে বশীভূত করিয়াছে, তোমরাও তাঁহাকে সেইরূপ যত্নে বশীভূত করিবার চেষ্টা কর। কন্যাগণ পিতৃ উপদেশ শিরোধার্য্যপূর্ব্বক অবনত মস্তকে স্বামী স্থানে গমন করতঃ প্রাণপণে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন, ভাগ্যক্রমে ইহাতেও তাহারা সোমদেবের কৃপার পাত্রী হইতে সমর্থ হইলেন না, ফলতঃ তাহারা মনোদুঃখে হতাশপ্রাণে পুনরায় সদলে পিত্রালয়ে আগমন করিলেন, বিজ্ঞ রাজা এবারও তাহাদিগকে নানাপ্রকার উপদেশদানে সান্ত্বনা করিয়া এক অনুরোধ পত্রসহ সোম সকাশে পাঠাইয়া দিলেন। সেই অনুরোধ পত্রের মর্ম্ম এইরূপ, "স্ত্রীজাতির একমাত্র সম্পদ, স্বামীর ভালবাসা—এই ভালবাসায় বঞ্চিত হইলে তাহাদের জীবন মরণ উভয়ই সমান। আরও লিখিলেন যে সকল পত্নীই স্বামীর কৃপার পাত্রী—অতএব পত্নীগণের প্রতি স্বামীর সমভাবে কৃপা বিতরণ করা উচিত।" সোমদেব পূজনীয় দক্ষের অনু-

রোধ পত্র প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে তাহারা নিরুপায় অবস্থায় আবার পিত্রালয়ে উপস্থিত হইয়া যথাযথ প্রকাশ করিল। তখন প্রজাপতি এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার অভিপ্রায়ে সোমদেবকে রোষভরে এক রূঢ় অভিশাপ প্রদান করিলেন, তাহাতেই সোমদেবকে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইতে হইল। ঔষধাপতি সোমদেব এই ক্ষয়রূপ পাপ মোচনার্থ প্রভাস তীর্থে উপস্থিত হইয়া উর্দ্ধপদে, হেটমুণ্ডে দেবাদিদেব মহাদেবের কঠোর তপস্যায় রত হইলেন। ভূতভাবন ভগবান্ তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া এই স্থানে সোমদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বরদানে তাঁহাকে ক্ষয়রোগ হইতে মুক্তিদান করিলেন। মহাদেবের কৃপায় তিনি শীঘ্র পূর্ণকলেবরে এই স্থানেই প্রভাবিত হইলেন বলিয়া এই তীর্থ প্রভাস নামে প্রসিদ্ধ হইল। তখন সোমদেব ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ এই স্থানে এক লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপন এবং তাহার উপর এক স্বুবর্ণ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহারই নামানুসারে ঐ বিগ্রহমূর্ত্তির নাম সোমনাথ নামে প্রসিদ্ধ করাইলেন। সত্যযুগে সোমদেব কর্ত্তৃক এই স্বুবর্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। সত্যযুগের অবসানে ঐ স্বুবর্ণ মন্দিরটীও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

ত্রেতাযুগে লঙ্কেশ্বর রাজা দশানন সেই প্রাচীন স্বর্ণ নির্ম্মিত মন্দিরটীর ধ্বংস অবস্থা দর্শনে ইহাকে স্বর্ণের পরিবর্ত্তে রৌপ্যের দ্বারা নির্ম্মাণ করাইয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। ত্রেতার অবসানে মন্দিরটীও হতশ্রী হয়।

দ্বাপরযুগে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ ঐ রৌপ্য নির্ম্মিত মন্দিরের দুরবস্থা অবলোকন করিয়া তিনি ইহাকে চন্দন কাষ্ঠে নবকলেবরে প্রতিষ্ঠা করেন। এই দ্বাপরযুগে যদুবংশ ধ্বংসের পর হইতে এখানে কত শত হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বের উত্থান ও পতন হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু

অদ্যাপি সেই প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরটী বর্ত্তমান থাকিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

প্রভাসের ইতিহাস

প্রভাসের ইতিহাস এক কৌতুহলোদ্দীপক—তাই প্রভাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থানে প্রদত্ত হইল।

প্রভাস চিরকালই হিন্দুদিগের অধীনে থাকে। কথিত আছে, এই প্রাচীন সোমনাথের অতুল সম্পত্তির বিষয় অবগত হইলে সুলতান মামুদ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ১০২৪ খৃষ্টাব্দে সসৈন্যে এই পুরী আক্রমণ করেন, ইহাতে যে হিন্দুরা নিশ্চেষ্ট ছিলেন, এমন নয়, তাঁহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও কোন রূপে সেই অজেয় যবন সৈন্যের আক্রমণ হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে না পারিয়া অনেকে সম্মুখ সমরে প্রাণ দিলেন, অবশিষ্ট যাঁহারা রহিলেন, তাঁহারা প্রাণ লইয়া নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিলেন। তখন উন্মত্ত মামুদ সৈন্যগণ অবসর পাইয়া সোমনাথের বিস্তর ধনরত্ন লুণ্ঠন করিল, অধিকন্তু সেই প্রাচীন মন্দিরটী ধ্বংস করিয়া দিল। এই দুর্ঘটনার কিছুকাল পরে পুনরায় হিন্দু রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। তাহার পর দিল্লীর বাদশাহ আলাউদ্দীন খিলজির প্রধান সেনাপতি ১৩০০ খৃষ্টাব্দে এখানে আপন প্রাধান্য স্থাপন করেন, কিন্তু হিন্দুগণের প্রাণপণ চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই প্রভাসে আবার হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল, এইরূপে প্রভাসক্ষেত্র ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের অধীনে থাকে। তৎপরে এখানে নানাজাতির আক্রমণ এবং জয় পরাজয়ে দেবতার ঐশ্বর্য্য ক্রমশঃ লুণ্ঠিত হইতে থাকে। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে আমেদাবাদ—গুজরাটের সুলতান "মহাম্মদ বেগারা" দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলে তিনি এই প্রভাসক্ষেত্রটী দখল করেন। ইহার কিছুকাল পরে মোগল সম্রাট

আকবরের প্রাদুর্ভাবকালে এই রাজ্য তাঁহারই অধীনস্থ হয়, তাহার পর সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁহার রাজত্বকালে আর একবার সোমনাথের ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। শেষ ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাজের ধ্বংসের দিনে গুজরাটের নবাব স্বাধীন হইলেন। তিনিই শেরখাঁ বাবি নামক এক-জন সেনাপতির বাহুবলে প্রভাস দখল করিলেন। তদবধি শের খাঁর বংশধরেরা প্রভাসের ভূস্বামীরূপে অবস্থান করিতেছেন; কথিত আছে, তাঁহারাই জুনাগড়ের নবাব। বর্ত্তমানকালে প্রভাসে অনূ্যন ৭০০০ লোকের বসতি, তন্মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক এই কারণে হিন্দু, অবশিষ্ট সকলেই মুসলমান।

শশিভূষণ মহাদেব

শশিভূষণ মহাদেব—এক প্রকাণ্ড পিত্তল নির্ম্মিত লিঙ্গমূর্ত্তি। একটী বৃহদাকার সর্প ঐ লিঙ্গের অঙ্গবেষ্টন করিয়া মস্তকের উপর ফণা বিস্তার করিয়া আছে। মন্দির মধ্যে এক স্থানে গণপতি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই সুন্দর মন্দির এবং বিগ্রহ মূর্ত্তিটী বরদারাজ গায়কবাড় মহারাজের স্থাপিত।

প্রভাসক্ষেত্রে প্রস্তরময় শ্রীকৃষ্ণের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ও লক্ষ্মীদেবীর মন্দির-টীর শোভা দর্শনীয়। এতদ্ভিন্ন এখানে আরও অনেকানেক দেব-দেবীরও মন্দির বর্ত্তমান আছে। এইরূপে এখানকার দ্রষ্টব্য স্থান এবং দেবালয়গুলির দর্শন করিয়া ত্রিরাত্রি যাপনপূর্ব্বক, পর দিন অর্থাৎ চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন, সুফল প্রভৃতি নিয়মগুলি পালনপূর্ব্বক পাণ্ডার পরামর্শ পাইয়া যথাসময়ে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

সমাপ্ত

সমালোচনা

(সারসংগ্রহ)

[স্থানাভাব বশতঃ সকল অভিমত দেওয়া হইল না।]

বর্ত্তমান সাহিত্যযুগের অদ্বিতীয় সমালোচক চুঁচুড়া নিবাসী দেশপূজ্য সুপ্রবীণ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয়, "সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" সম্বন্ধে বলেন ;—

"কতকটা সখের খাতিরে, কতকটা স্বাস্থ্যের জন্য যৌবনে অনেক তীর্থেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, আজ আবার বৃদ্ধ বয়সে ঘরে বসিয়া আগ্রহের সহিত "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" পড়িলাম। দেখিলাম, এই নূতন লেখক এক নূতন পন্থায় তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের খাঁটি হিন্দুত্ব সব প্রকাশ হইয়াছে। গ্রন্থের গুণপনা এই যে, ইহাতে সমাজের ছড়াছড়ি, অলঙ্কারের ছড়াছড়ি নাই, ভাষাটী বেশ সরল, স্নিগ্ধ ও শান্ত—যেন বাঙ্গালীরই ঘরের কথা, আর গ্রন্থকারের গুণপনা এই যে, পরের মুখে ঝাল না খাইয়া ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর পবিত্র চক্ষে তীর্থ সম্বন্ধে মাহাত্ম্য সকল খুঁটিনাটী কথা কহিয়া অজ্ঞেয় বহু তত্ত্বই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। এই গ্রন্থের এক খণ্ড সঙ্গে থাকিলে বিদেশ গিয়া সহচরের অভাবে কোন অসুবিধাই ভোগ করিতে হয় না ; কেন না, কোন্ তীর্থে কি দর্শনীয়, কি করণীয়, কোন্ পূজার কোন্ দ্রব্য প্রয়োজনীয়, কোন্ স্থানের অধিবাসীরা কোন্ জিনিষকে কি নামে অভিহিত করে, এ সকল কথা বেশ নিপুণতার সহিত বিশদভাবে বোঝান হইয়াছে।"

বসুধা, ১ম সংখ্যা—১২ বর্ষ, ১৩১৯ সাল।

বিখ্যাত "মেদিনীপুর" হিতৈষী সম্পাদক বলেন ;—

সচিত্র "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত। উত্তম কাপড়ে বাঁধান, প্রথম ভাগ মূল্য ১৲টাকা। তীর্থসমূহের পনের খানি উত্তম হাফ্‌টোন ছবি আছে। গ্রন্থকার বহুবার তীর্থ পর্য্যটন করিয়া যে সমুদয় জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাহাই গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে তীর্থ যাত্রীবৃন্দ বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তীর্থে কত প্রকার চোর, জুয়াচোর, বদমাস ও প্রতারক আছে, ইহা পাঠে তাহা জানিতে ও সাবধান হইতে পারিবেন। ইহাতে তীর্থসমূহের বিশেষ বিবরণ ও কোন্ কোন্ তীর্থে কোন্ কোন্ দ্রব্যের আবশ্যক ও দ্রষ্টব্য স্থান কি, তাহাদেরও বিশেষ উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান তীর্থ সমূহের বিবরণী সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন প্রাচীন পুরাণকাহিনী তীর্থের উৎপত্তিও বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকারের প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা লোকহিতৈষণাবৃত্তিই সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুটিত হইয়াছে, এজন্য তিনি অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র।

মেদিনীপুর-হিতৈষী—২৫শে আষাঢ়, ১৩১৮ সাল।

বৈশ্যজাতির মুখপত্র প্রসিদ্ধ "সুবর্ণবণিক" সম্পাদক বলেন ;—

"তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, ৩৫৬ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীবিপিনবিহারী ধর কর্ত্তৃক প্রকাশিত, প্রথম ভাগ মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। এই পুস্তকখানি বিলাতী বাঁধাই, ছাপানও অতি সুন্দর। অনেক তীর্থ চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" তীর্থ যাত্রীর একমাত্র সম্বলের বস্তু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তীর্থ-ভ্রমণকালে তীর্থ যাত্রীদিগকে ঠগের হাতে পড়িয়া

অনেক সময়ে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়, তন্নিবারণের জন্য গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। অনেক তীর্থের ইতিহাসও ইহাতে বেশ সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

সুবর্ণবণিক, ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ সাল।

সুবিখ্যাত "বসুমতী" সম্পাদক বলেন ;—

সচিত্র "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, ৩৫৬ নং আপার চিৎপুর রোড হইতে শ্রীবিপিনবিহারী ধর কর্তৃক প্রকাশিত। উত্তম কাপড়ে বাঁধা, প্রথম ভাগ মূল্য ১৲ টাকা। নানা তীর্থের বহু হাফ্‌টোন ছবি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তীর্থ যাত্রীগণ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন। ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ সমূহের বিবরণ প্রভৃতি ইহাতে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বসুমতী, ২রা অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ সাল।

বিখ্যাত "জন্মভূমি" সম্পাদক বলেন ;—

সচিত্র "তীর্থ ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, প্রথম ভাগ মূল্য ১৲ টাকা। কাশী, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা ও কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি অনেকগুলি পুণ্য তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া গোষ্ঠবিহারী বাবু এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে। যাঁহারা তীর্থ দর্শনে অভিলাষী, এতদ্দ্বারা কেবল তাঁহাদের বিশেষ উপকার হইবে, এমন নহে—যাঁহারা ঘরে বসিয়া পাঠ করিবেন, তাঁহারাও অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। তীর্থের অনেক স্থানের মাহাত্ম্য অনেকে অবগত নহেন. এই পুস্তকে বিশেষ বিশেষ

পুণ্য স্থানের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য সন্নিবেশিত থাকাতে ইহা ভক্তগণের পরম আদরণীয় হইয়াছে।

জন্মভূমি, ১৫ সংখ্যা, মাঘ, ১৩১৮ সাল।

একমাত্র দৈনিক সুপ্রসিদ্ধ "নায়ক" সম্পাদক বলেন ;—

সচিত্র "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, প্রথম ভাগ ১৲ টাকা। এই বইখানি খুলিলে প্রথমেই ইহার চিত্রগুলি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহাতে গ্রন্থকারের প্রতিকৃতিসহ ১৫।১৬ খানি পূর্ণ আকারের সুদৃশ্য হাফ্‌টোন চিত্র আছে। চিত্রগুলি সুন্দর! গ্রন্থের আকার ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, আড়াই শত পৃষ্ঠার অধিক। উত্তর ভারতের অনেকগুলি তীর্থক্ষেত্রের বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তীর্থক্ষেত্রে গমনের পথে প্রবঞ্চক ও সেতুয়া এবং তীর্থক্ষেত্রের পাণ্ডাগণের অত্যাচার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধান প্রধান তীর্থক্ষেত্রের উৎপত্তির বিবরণ, পূজা ও দেবদর্শনবিধি দেবতা ও পাণ্ডাগণের প্রণামী এবং অন্যান্য প্রাপ্য, তীর্থ যাত্রীদিগের যে সকল দ্রব্য যে পরিমাণে পাথেয় এবং নিজের ব্যবহারের জন্য যে সকল জিনিষ আবশ্যক তাহার তালিকা—এ সকল বিষয় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তীর্থক্ষেত্রের বিবরণের সঙ্গে অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানেরও বিবরণ ইহাতে লিখিত হইয়াছে, এমন কি নারী জাতির লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ও এ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা মন্দ নয়, মোটের উপর গ্রন্থখানি সুপাঠ্য হইয়াছে।

নায়ক—২৪শে বৈশাখ, ৫ম বর্ষ, ১৩১৯ সাল।

হিন্দুধর্ম্মের মুখপত্র "বঙ্গবাসী" সম্পাদক বলেন ;—

সচিত্র "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত। কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। গ্রন্থকার নানা তীর্থ স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন, সুতরাং তীর্থ তথ্য সম্বন্ধে ইনি যে অভিজ্ঞ, তাহা বলাই বাহুল্য। আলোচ্য গ্রন্থে তাহার পদে পদে প্রমাণ পাওয়া যায়, তীর্থ যাত্রীর ইহা উপকারী ও উপাদেয়। অনেক তীর্থের অনেক খুটিনাটি তথ্য পাওয়া যায়, কোথাও কোথাও পৌরাণিক তথ্য বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। পৌরাণিক তথ্যগুলি বেশ, এ গ্রন্থ সাহায্যে হিন্দুমাত্রেরই পাণ্ডা গোলকধাঁধাঁর বড় উপকার হইবে।

বঙ্গবাসী—৮ই আষাঢ়, ১৩১৯ সাল।

সর্ব্বজনপ্রিয় প্রবীণ সুচিকিৎসক ভাঁরত গভর্ণমেণ্ট হইতে উপাধি প্রাপ্ত বৈদ্যরত্ন শ্রীযুক্ত কালিদাস বিদ্যাভূষণ মহোদয় বলেন ;—

"বার্দ্ধক্যাবস্থায় তীর্থ ভ্রমণ অসম্ভব, কিন্তু তীর্থ দর্শন বাসনা নিরন্তর রহিয়াছে। সেই বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য শ্রীমান গোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত "সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" পাঠ করিয়া প্রীতি-প্রফুল্লিত হইলাম। কারণ গৃহে বসিয়া দূরস্থিত তীর্থগুলির বিবরণসহ প্রতিকৃতি দর্শন বিশেষ প্রীতিপ্রদ এবং যাঁহারা তীর্থগমনে সমুদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে পুস্তকখানি অতি যত্নের বস্তু। কোথায় কোন্ বস্তু পাওয়া যায় বা অপ্রাপ্য, তাহা বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। যদিও এক্ষণে রেলপথে সর্ব্বত্র যাতায়াতে সুবিধা হইয়াছে, তথাপি টাইম্‌টেবল্ ব্যতিরেকে যেরূপ রেলপথে আসা-যাওয়া চলে না, সেইরূপ এই পুস্তক-

খানিও যেন তীর্থ স্থানের দ্বিতীয় টাইম্‌টেবল্‌। গ্রন্থকারের এই কৃতিত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যায়, আমি তাহার হৃদয়ের সারল্য দেখিয়া বিশেষ আহ্লাদের সহিত এই পত্রখানি লিখিলাম। কিমধিক মিতি।"

কলিকাতা—২৩শে কার্ত্তিক, সন ১৩১৯ সাল। } বৈদ্যরত্ন শ্রীকালিদাস বিদ্যাভূষণ কবিরাজ। সাং ৮ নং রায় বাগান ষ্ট্রীট।

স্বনামখ্যাত পুলিসকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত মনোজমোহন বসু মহোদয় বলেন ;—

আমি শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী ধর মহাশয়ের "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" পাঠ করিয়া নিরতিশয় আনন্দলাভ করিলাম। পুস্তকখানি নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ এবং ইহাতে নানা স্থানের অতি মনোরম হাফ্‌-টোন চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। হিন্দু সাধারণ, বিশেষতঃ তীর্থ-ভ্রমণ অভিলাষীগণ ইহা পাঠে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন, বর্ণনার প্রণালীও প্রশংসনীয়।

কলিকাতা—১২ই অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৯ সাল। } শ্রীমনোজমোহন বসু, উকীল পুলিসকোর্ট

সুবিখ্যাত Indian Mirror সম্পাদক বলেন ;—

"*Sachitra Tirtha Bhraman Kahiny.*"—Babu Gosto Behary Dhur is much travelled-man. He has visited all the principal Hindu places of pilgrimage in India. What he has not is not perhaps worth visiting. But he has done more. He has jotted down an account of the numerous shrines at which he has worshipped, such account including the Pouranic or legendary stories that are associated with the sites.

The number of Hindus who have visited the magnificent shrines in southern India is less than those who have made pilgrimages in upper India, and still less is the number of those who have written on them. The two out of the three volumes of his travels, which Babu Gosto Behary Dhur has caused to be brought out, are therefore, of absorbing interest pilgrims and tourists alike. The volumes are liberally embellished with appetizing illustrations of important shrines and striking views. The writer has shown much care and industry in the compilation of the volumes and he will undoubtedly feel simply rewarded of intending pilgrims make use of these for their guide. To the house keeper too, they will not only furnish profitable reading, but will act as powerful incentivet to travel.

The Indian Mirror, 10th July, 1912.

HON'BLE KUMAR NOGENDRA NATH MULLICK BAHADUR SAYS ;—

Marble palace, Chore Bagan.

I have gone through " Sachitra Teertha-Bhraman-Kahiny " Part I and II Compiled by Baboo Gosto Behary Dhur. The Book contains detailed and descriptions with illustrations of almost all the important places of pilgrimage in India. It is the best guide to the pilgrims and to the tourists.

Calcutta, 16th July, 1912. Nogendra Mullick.

হাওড়ার প্রসিদ্ধ THE LOYAL-CITIZEN সম্পাদক বলেন ;—

Sachitra (illustrated) " Thirtha-Bhraman" (Pilgrimage)

We are glad to read the above named book by Baboo Gosto Behary Dhur. It is completed in Three volumes. But

we have received the vol II for review. There are good many pictures in this volume.

The volume in question is extremely interesting as much as it has given vivid description of a number of sacred places of the Hindus.

The author has a great command over the Bengali languages. The description of the places are given in such a charming way that one cannot lea e the Book if he has once began to read them.

The Loyal citizen Howrah, 31st July, 1912.

Hon'ble Rai Baikunta Nath Bose Bahadur. Honry Magistrate says :—

I have read with pleasure and profit the book of travel which Baboo Gosto Behary Dhur has brought out in two volumes under the designation of "Sachitra Tirtha Bhramana". The book is a record of the writer's personal experiences of the various places of pilgrimage in all ~~parts of India which~~ he visited and as such it should prove valuable practical help to would be pilgrims for whose guidance he has so very thoughtfully provided the requisite instructions.

The stag-at-homes might enjoy the pleasure of a visit which they cannot make by perusing the vivid descriptions of the places with the occasional of the neatly executted illustrations which accompany them.

Baikunta Nath Bose.

2nd January, 1913.
167, Manicktola Street, Calcutta.